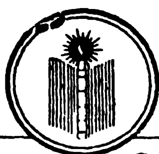
অন্তরাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

প্রথম-সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫২

সাড়ে চার টাকা মাত্র

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

অনুরাগ

১

প্রত্যুষে চা-পানের পর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার দ্বিজনাথ মিত্র জশিডির সুবৃহৎ অট্টালিকার দক্ষিণ বারান্দায় বসিয়া সদ্য-লব্ধ সংবাদপত্রে সবেমাত্র মনোনিবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে একটি বাঙালী যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি মিস্টার ডি. এন. মিটার?"

নাসিকা হইতে চশমা খুলিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমারই নাম দ্বিজনাথ মিত্র। বসুন।"

আগন্তুক দ্বিজনাথের ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর একখানা কার্ড এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে ছাপা একখণ্ড প্রশংসা-পরিচয়-লিপি রাখিয়া একখানা বেতের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

ছয় মাসের জন্য গৃহখানি ভাড়া লইয়া দ্বিজনাথ মাসাধিক কাল হইতে জশিডিতে বাস করিতেছেন। সহধর্মিণী বিমলা কিছুদিন হইতে একটা কোনো দুঃসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগ যে কি এবং তাহার উৎপত্তি যে কোথায়—ফুসফুসের গভীর গহ্বরে অথবা যকৃতের নিভৃত নিলয়ে, মস্তিষ্কের উৎকট উত্তেজনায় অথবা দেহ-যন্ত্রের অপর কোনো বিপর্যয়ে—কলিকাতার চিকিৎসকেরা যখন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন

না তখন স্থির হইল, এমন অবস্থায় একটা সাধারণ চিকিৎসাধারা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তন করাই কর্তব্য।

এই মীমাংসার পর কোথায় যাওয়া হইবে তাহা লইয়া একটা প্রখর আলোচনা উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষের ত্রিসীমার অন্তর্গত যতগুলি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস আছে, আলোচনা হইতে কোনটিই বাদ পড়িল না। কাশ্মীরের শ্রীনগর, নীলগিরির উটাকামণ্ড, হিমালয়ের মশৌরী, আসামের শিলং, ব্রহ্মদেশের বাসীন্, উড়িষ্যার পুরী, তৎপরে ওয়ালটেয়ার, এটাওয়া, আম্বালা, উদয়পুর হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর, মহীসুর, নাগপুর, মাণিকপুর পর্যন্ত একে একে সবগুলিই আলোচিত হইয়া গেল। কেহ বলিল, দেহের ভিতর যদি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকে রাজপুতানার মরুভূমির উষ্ণতা তাহা আরোগ্য করিবে; কেহ বলিল, মস্তিষ্কের দুর্বলতাই যদি প্রকৃত কারণ হয়, হিমালয়ের শীতলতায় তাহা নিরাময় হইবে। স্নায়ু, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, পাকস্থলী এবং দেহের অপরাপর যন্ত্রের সহিত বিভিন্ন স্থান-বিশেষের জলবায়ুর যে নির্বিকল্প যোগ আছে তাহা লইয়া নিরতিসূক্ষ্ম বিচার হইয়া গেল। সর্বশেষে দ্বিজনাথ যখন রোগিণীর নিজ অভিপ্রায়ের কথা জানিতে চাহিলেন, তখন নিঃসংশয় নিরুদ্বেগ মুখে বিমলা বলিলেন, "জশিডি।"

প্রজ্বলিত অঙ্গারে জল পড়িলে যে অবস্থা হয়, বিমলার কথা শুনিয়া আলোচনাকারীগণের মধ্যে সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। জশিডি! কলিকাতা হইতে সাত ঘণ্টার পথ, বৈদ্যনাথ-যাত্রিগণের গাড়ি বদলাইবার ক্ষুদ্র জংশন সেই বহু পুরাতন জশিডি! হিমালয় নয়, দাক্ষিণাত্য নয়, কাশ্মীর নয়, বর্মা নয়, এমন কি চুনার-মন্দার পর্যন্ত নয়—জশিডি!

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "জশিডিই তোমার ইচ্ছে হচ্ছে বিমলা? এত জায়গা ছেড়ে তুমি জশিডি কেন পছন্দ করছ বল তো?"

বিমলা বলিলেন, "তোমার মনে নেই, একবার জশিডি গিয়ে আমার কি রকম উপকার হয়েছিল? আমার বিশ্বাস এবারও জশিডিতে আমার উপকার হবে।"

তখন দ্বিজনাথ আর সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা। জশিডিতেই তোমার উপকার হবে।"

তাহার পর তিনি জনৈক কর্মচারীকে জশিডিতে পাঠাইয়া আপাতত ছয় মাসের জন্য একটি সুরম্য গৃহ ভাড়া লইলেন এবং সত্বর জশিডি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে নূতন এক সমস্যা উপস্থিত হইয়া নিরূপিত কার্য-সঙ্কল্পে পরিবর্তন ঘটাইল। কিছুদিন হইতে বিমলার মাতা কোস্ট-লাইন স্টীমারে দুই পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্র-পৌত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে সিংহল বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। সহসা এই সময়ে তাঁহাদের সিংহল যাত্রা স্থির হইয়া গেল।

দ্বিজনাথের শ্বশ্রূ দ্বিজনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, জশিডি তো তোমরা যাচ্ছ; কিন্তু এই হাতের কাছে জশিডিতে এমন কি চেঞ্জ হবে সত্যি-সত্যি আমিও তা বুঝতে পারছি নে। তার চেয়ে তোমরা তিনজনে যদি আমাদের সঙ্গে সীলোন চল, তা হ'লে যে বিশেষ উপকার হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, সমুদ্রের হাওয়াতেই বিমলার যা-কিছু রোগ সমস্ত সেরে যাবে।"

উৎফুল্ল হইয়া দ্বিজনাথ বলিল, "এ বেশ কথা মা! এ যোগাযোগ ভগবানের কৃপায় উপস্থিত হয়েছে। আপনি আপনার কন্যাকে আর কমলকে সঙ্গে নিয়ে যান, আমার কিন্তু যাওয়া হবে না। আপনি তো জানেন, সমুদ্রযাত্রা আমার ধাতে একেবারেই সয় না। ব্যারিস্টারী পাস করবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে একবার বিলেত যেতে হয়েছিল, তারপর শখ ক'রে

আর একবার গিয়েছিলাম। দুবারই যে ভীষণ নাকাল হয়েছি তাতে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সহজে আর সমুদ্রযাত্রা করছি নে।"

শ্বশ্রূ কহিলেন, "সবাই তো বলছে, এখন সমুদ্র ততটা কষ্টকর হবে না। তা ছাড়া তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে বিমলা কি রাজী হবে? তোমারও তো শরীর ভাল নয়; সেদিন কোর্টে বক্তৃতা করতে করতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।'

কথাটা যখন বিমলার কাছে উঠিল, বিমলা একেবারেই আমল দিলেন না; বলিলেন, "সমুদ্রের হাওয়া কি এতই অদ্ভুত জিনিস যে, সব দুঃখই তাতে উড়ে যাবে? দেহেরও,—মনেরও?"

দ্বিজনাথ তাঁহার বয়সে প্রৌঢ়া কিন্তু নিরুদ্ধ-যৌবনা সুন্দরী পত্নীর নাসিকাগ্রে তর্জনী দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া কহিলেন, "মনের দুঃখ উড়ে না গেলে তত ক্ষতি হবে না, কারণ মনের দুঃখ অনেক সময়ে দেহে সারের কাজ করে। কাব্যে বিরহ যত নিন্দিত হয়েছে, বাস্তব জীবনে তত নিন্দার যোগ্য নয়। এ কথা মুখ ফুটে বলতে মনে লাগে, কিন্তু কথাটা অপ্রিয় হ'লেও সত্য।"

বিমলা স্বামীর দক্ষিণ হস্তখানি দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "একটুও সত্যি নয়। স্বকার্যসাধনের জন্যে এজলাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাদের অনর্গত সত্যি-মিথ্যে বলবার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে, দরকার হ'লে তারা এ রকম কথা ব'লেই থাকে।"

বিমলার মন্তব্য শুনিয়া দ্বিজনাথ পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সহসা কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "স্বীকার না কর নজির দিচ্ছি; সাধারণ বিরহের নয়, একেবারে বৈধব্যের। তোমাদের রাণী-দিদির কথা মনে আছে তো? সধবা অবস্থায় কি চেহারা ছিল! তারপর যে দিন বিশ্বেশ্বর মারা গেল ঠিক সেই দিন থেকে শরীর ফুলতে

আরম্ভ ক'রে এখন কি হয়েছে একবার ভেবে দেখ! স্বামী বর্তমানে ছাগমাংস অথবা ছাগলাদ্য ঘৃত যা করতে পারে নি, বৈধব্য অবস্থায় আলো-চাল কাঁচকলা তার চতুর্গুণ করেছে, এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারি। কাব্যে এ কথা না মানো মেনো না; কিন্তু জীবনে বৈজ্ঞানিক তথ্য না মানলে চলবে কেন?"

বিমলা তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার বৈজ্ঞানিক তথ্য। যত সব গাঁজাখুরি কথা!"

স্মিতমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "কিন্তু এ গাঁজাখুরি কথা থেকে তুমিও পরিত্রাণ পাবে না। সীলোনে পৌঁছেই বুঝতে পারবে আমার কথা সত্যি কি-না!"

বিমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল; কুপিতস্বরে বলিলেন, "এ সব যা-তা কথা যদি বল তা হ'লে আমি ম'রে গেলেও সীলোন যাব না তা বলছি।"

বেগতিক দেখিয়া দ্বিজনাথ রহস্যের গতিরোধ করিলেন, এবং অমিশ্র পরিহাসকে সত্য বলিয়া ভুল করিয়া মাঝে মাঝে যে অকারণ অনর্থের সূত্রপাত হয় তদ্বিষয়ে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরিহাসের ধারা যে সত্য-সত্যই বন্ধ না হইয়া চতুরতরভাবে চলিতেছে, মনে-মনে তাহা বুঝিয়াও বিমলা বাহ্য সন্তোষের ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "নিজের শরীরের জন্যে তোমাকে ছেড়ে আমি একা সীলোন গেলে মা কি ভাববেন বল দেখি?"

"আমাকে ছেড়ে তুমি সীলোন না গেলে মা যা ভাববেন তাতেও তোমার কম লজ্জার কারণ হবে না।" বলিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন।

স্বামীর প্রতি একবার চকিত-মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া নিরুদ্ধ হাস্যের সহিত বিমলা বলিলেন, "তা হোক। জামাইয়ের প্রতি মেয়ের টান

দেখলে কোনো মা-ই মন্দ কিছু ভাবে না। বাবা যখন মকদ্দমা করতে মফঃস্বলে যেতেন মা যে কতবার সঙ্গে যেতেন, সে তো মা ভুলে যান নি।"

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে ধারা তুমিও একেবারে বাদ দাও নি বিমল। জানকী চৌধুরীর মানহানির কেসে আমার সঙ্গে ঢাকা গিয়েছিলে, সে কথা ভুলে গিয়েছ ?"

প্রভাত-সূর্যের উপর সহসা ঘন মেঘখণ্ড আসিয়া পড়িলে শরৎকালের প্রসন্ন শস্যক্ষেত্রের যে অবস্থা হয়, দ্বিজনাথের এই কথায় বিমলার মুখমণ্ডলে ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। বিমর্ষ-করুণমুখে দুঃখার্তস্বরে তিনি বলিলেন, "ভুলে গেছি ! জীবনে সে কি কোনোদিন ভুলব ! যে শাস্তি পেয়েছিলাম আর কখনো তোমার সঙ্গে মফঃস্বলে যাওয়ার কথা মুখে আনি নি।—আচ্ছা, সে কতদিনের কথা হ'ল ?"

এক মুহূর্ত মনে-মনে হিসাব করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "প্রায় বাইশ বৎসর হ'য়ে গেল।"

বিমলা আর কোনো কথা বলিলেন না, শুধু একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মর্মস্থল হইতে বাহির হইয়া বায়ুতে মিশাইয়া গেল।

ইহার পর ক্রমশ নানা দিক দিয়া কথাটা অগ্রসর হইয়া বিমলার সীলোন যাওয়াই স্থির হইল। বিদেশ-দর্শনের আনন্দ, সমুদ্র-যাত্রার আগ্রহ, আত্মীয়বর্গের সহিত সহ-যাত্রার প্রলোভন এবং সর্বোপরি স্বামীর সনির্বন্ধ উপরোধ বিমলা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। কিন্তু দুইটি বিষয়ে তিনি দ্বিজনাথকে স্বীকৃত করাইয়া লইলেন। প্রথমত, কন্যা কমলা সীলোন না গিয়া দ্বিজনাথের পরিচর্যায় সঙ্গে থাকিবে, এবং দ্বিতীয়ত, জাহাজে তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিয়া পরদিনই দ্বিজনাথ কমলাকে লইয়া জশিডি যাত্রা করিবেন। কিছুদিন হইতে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে দ্বিজনাথ বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন।

পূজার দীর্ঘ অবকাশও নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছিল. সুতরাং জশিডি যাইবার প্রস্তাবে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না; কিন্তু কমলা সীলোন-ভ্রমণে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার কাছে থাকিবে ইহা তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল।

স্বামীর এই কুণ্ঠা উপলব্ধি করিয়া বিমলা কহিলেন, "সে যখন তোমাকে একলা রেখে সীলোন যেতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না—তোমার কাছে থাকাই স্থির করেছে—তখন তুমি অনর্থক কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তা ছাড়া শুধু এক পক্ষেই দেখলেই তো চলে না; বেচারা সন্তোষের কথাও ভাবো। কমলা জশিডি যাবে শুনে যার মুখ শুকিয়েছে, কমলা লঙ্কা যাবে শুনলে তার কি অবস্থা হবে সেটাও তো ভাবা উচিত!" বলিয়া বিমলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

পত্নীর কথা শুনিয়া দ্বিজনাথের মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "তা বটে, জশিডি হ'লে মাঝে মাঝে শনি রবিবারে যাওয়া চলবে, সীলোন হ'লে একবারে নিরুপায়। কম্‌লিও সেই জন্যে সীলোন যেতে চায় না না-কি?"

সহাস্যমুখে বিমলা বলিলেন, "তা কি ক'রে বলব বল? তোমার মেয়ের পেটের মধ্যে কি আছে তা তো সহজে বোঝবার উপায় নেই। বাপ রে! কি ভীষণ চাপা মানুষ!"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমি কিন্তু যতটা বুঝতে পারি পেটের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। সন্তোষের জন্যে সে যে খুব বেশি ব্যস্ত তা মনে হয় না।"

বিমলাও মনে মনে কতকটা এইরূপ অনুমান এবং আশঙ্কা করিতেন। অপ্রসন্ন মুখে তিনি বলিলেন, "ব্যস্ত না হওয়াই অন্যায়। রূপে, গুণে, অর্থে, বিদ্যায় সন্তোষের মতো দ্বিতীয় একটি ছেলে পাওয়া শক্ত। এ যদি

ওঁর কপালে না থাকে তো কপালে বোধ হয় দুঃখই আছে। অথচ সন্তোষ তো কমলা বলতে অজ্ঞান! কমলের অসুখের সময়ে দু-দিন দিবারাত্র কি সেবাটাই সে করেছিল দেখেছিলে তো? মেয়ে তো বিকারে অচৈতন্য হ'য়েই রইলেন, তা বুঝবেন কি!"

পত্নীর আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা দেখিয়া দ্বিজনাথ সহাস্যমুখে বলিলেন, "বুঝবে, বুঝবে। অচেতন অবস্থায় যে ঘটনা ঘটেছে, সচেতন অবস্থাতেই তো তার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল।"

সন্তোষকুমার চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নূতন ব্যারিস্টার। অক্‌স্‌ফোর্ড হইতে বি. এ. এবং লণ্ডন হইতে ব্যারিস্টারী পাস করিয়া মাত্র এক বৎসর হইল সে দেশে ফিরিয়াছে। কলিকাতায় প্রত্যহ দুই বেলা সে নিয়মিতভাবে দ্বিজনাথের গৃহে হাজিরা দেয়। সকালে অবশ্য প্রধানত দ্বিজনাথের জুনিয়ারি করিতে, এবং সন্ধ্যায় যে-উদ্দেশ্যে, তাহা পূর্বোক্ত কমলার প্রসঙ্গেই বুঝা গিয়াছে।

কমলা দ্বিজনাথের একমাত্র সন্তান, সুতরাং ভবিষ্যতে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, বেথুন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী এবং দেখিতে পরমা সুন্দরী। প্রেম যখন প্রেমাস্পদার পিতার সোনা-রূপা-বাঁধানো প্রণালীর মধ্য দিয়া বহিবার সুযোগ পায়, তখন ঈষৎ অবলীলারই সহিত বয়। সন্তোষ কিন্তু তাহার আসক্তিকে দ্বিজনাথের সম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে সম্পদ কমলা তাহার দেহে-মনে বহন করিত তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ রাখিত। প্রণয়ের অনন্যমুখিতায় বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া অর্থ অনর্থ ঘটাইবে—কাব্য লোকের এ দুর্ঘটনাকে সে মনের মধ্যে এক মুহূর্তও স্থান দিত না। কমলা যে বড়লোকের মেয়ে, খনি হইতে সূর্যকান্ত মণির মতো দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে তাহাকে যে আহরণ করা যাইবে না—এই ছিল তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের দুঃখ।

দ্বিজনাথ যখন মনোযোগসহকারে পরিচয়-পত্র পড়িতেছিলেন, তখন নবাগত যুবক উৎসুক-বিমুগ্ধচিত্তে চতুর্দিকের দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। জিশিডি রেলস্টেশনের কিয়দ্দূর দক্ষিণ হইতে যে দীর্ঘ গিরিপৃষ্ঠ দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহারই উপর এই গৃহখানি অবস্থিত। গৃহসংলগ্ন ভূমিতে নানাবিধ ফলের ও ফুলের গাছ। প্রাচীরের বাহিরে গিরি-গাত্রে স্থানে স্থানে আতাগাছের এবং কয়েক প্রকার বনতরুর ঝোপ অনিচ্ছায় অনাদরে জন্মিয়া আছে। পথের ধারে গেটের উপর অর্ধ-বৃত্তাকার লৌহ-বেড় আশ্রয় করিয়া লতা উঠিয়াছে, তাহার দেহ কমলানেবু রঙের অজস্র ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। গেট হইতে গৃহ সোপান পর্যন্ত ঘুটিং-এর পথ—তাহার উভয় পার্শ্বে মর্মরিত তরুবীথি। গৃহ-প্রাচীরের ধারে ধারে সমান্তরালে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস্ গাছের শ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে,—তাহাদের গাত্র হইতে নির্গত স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গৃহের পশ্চিম দিকে নিম্নভূমিতে কলিকাতাগামী রেলপথ সরীসৃপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার পরপারে উপত্যকাভূমিতে দুই-তিনখানি পাহাড়ী গ্রাম দেখা যাইতেছে, এবং তৎপশ্চাতে ঘনতরুনিবদ্ধ ডিগরিয়া পাহাড় আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। পূর্বদিকে রাজপথের পার্শ্বেই বৈদ্যনাথ যাইবার রেলপথ; তাহার নীচে শাল-বৃক্ষ খচিত উপত্যকা। দূরে নন্দনপাহাড়ের পার্শ্বে বনান্তরাল দিয়া মাঝে মাঝে দেওঘরের সৌধরাজি দেখা যাইতেছে, এবং বহুদূরে ত্রিকূট পর্বতের অস্পষ্ট শিখরগুলি আকাশ-গাত্রে অঙ্কিত মনে হইতেছে। ভাদ্র মাসের শেষ, প্রত্যুষে বৃষ্টি হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। লঘু-বায়ু-হিল্লোলিত তরুশীর্ষে এবং লতাপল্লবে প্রভাত-রৌদ্র পড়িয়া ঝিলমিল করিতেছে।

আগন্তুক বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চতুর্দিকের এই অপরূপ শোভা দেখিতেছিল, এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে পুরু পর্দা ঠেলিয়া একটি তরুণী নির্গত হইয়া ডাকিল, "বাবা!"—তাহার পর সহসা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া পশ্চাতে ঈষৎ সরিয়া গিয়া পর্দার পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিজনাথ চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কমল, এদিকে এসো। এঁর পরিচয় পেলে তুমি নিশ্চয় খুশি হবে। ইনি আর্টিস্ট্ বিনয়ভূষণ রায়।"

উৎফুল্লনেত্রে কমলা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিস্ময়োৎসুক স্বরে বলিল, "ইনিই?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিয়া বিনয় সকৌতূহলে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম আপনারা শুনেছেন না-কি?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের একটি বন্ধু আপনার কথা আমাদের কাছে বলেছেন। তিনিও একজন আর্টিস্ট্।" তাহার পর এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি তো পোর্ট্রেট্ আঁকেন—আমার এই মেয়েটির একটি ছবি আঁকুন না?"

ততক্ষণে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া কমলা সলজ্জমুখে মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছিল। বিনয় চাহিয়া দেখিল, এ প্রতিমা শিল্পীর কল্পলোকেই সম্ভব—বাস্তব-জগতের রক্তমাংসের দেহে এ সৌভাগ্য কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে জোটে। সপ্তবর্ণের অধীর ব্যঞ্জনা বিনয়ের চকিত-বিমুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে ইন্দ্রধনু রচনা করিয়া বসিল। উৎফুল্লমুখে সে বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে আদেশ করলেই আরম্ভ করব।"

২

দ্বিপ্রহরে দ্বিজনাথের আহারের সময় কমলা আপত্তি তুলিল। বলিল, "বাবা, তখন তুমি ফস্ ক'রে ছবি আঁকানোর কথা স্থির ক'রে ফেললে, আমি বিনয়বাবুর সামনে বিশেষ কিছু আপত্তি করতে পারলাম না, কিন্তু এ ঠিক হ'ল না বাবা।"

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ঔৎসুক্যের সহিত দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?—ঠিক হ'ল না কেন? কি তোমার আপত্তি?"

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কমলা বলিল, "না বাবা। বড্ড হাঙ্গামের ব্যাপার! চোদ্দ-পনের দিন ধ'রে রোজ দু ঘণ্টা কাঠের পুতুলের মতো ব'সে থাকতে হবে—আর একজন দেখে দেখে ছবি আঁকবে! উঃ, এ কিছুতেই পারব না! ফোটো তোলাতে পাঁচ মিনিটে প্রাণান্ত হয়—আর এ দু ঘণ্টা!"

কমলার কথা শুনিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ফোটো তোলানোর সামান্য ব্যাপারে পাঁচ মিনিটে যে শাস্তি ভোগ করতে হয় এতে তোমার দু ঘণ্টাতেও তা হবে না। ছোট জিনিসের শাসনের যন্ত্রণাই আলাদা—তা সে মানুষই হোক আর যন্ত্রই হোক। এক্কায় দু ঘণ্টা চড়লে যা কষ্ট হয়, এরোপ্লেনে দু দিনে বোধ হয় তা হয় না। ফোটো তোলানোর মতো তোমাকে তো নিশ্বাস রোধ ক'রে ব'সে থাকতে হবে না। সামান্য নড়া-চড়ায় কোনো ক্ষতি হবে না, তা তো তুমি নিজেই তখন শুনলে।"

"কিন্তু দু ঘণ্টা এক জায়গায় ব'সে থাকতে হবে তো চুপ ক'রে?"

দ্বিজনাথ কহিলেন, "তাতে ক্ষতি কি? সে তো বরং একটা ছোট-

খাটো যোগাভ্যাসেরই মতো হবে। ছেলেবেলায় পড়বার ঘরে আমি দশ মিনিট একসঙ্গে বসতে পারতাম না—বই ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়তাম। তারপর ধরা পড়লে অভিভাবকদের শাসনে আবার গিয়ে বসতে হ'ত। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? একটু ফাঁক পেলেই আবার বেরিয়ে পড়তাম। আমার পায়ে যেন এমন কোনো কল লাগানো ছিল যা দশ-পনেরো মিনিটের বেশি ব্রেক মানত না। তারপর একদিন গাছ থেকে প'ড়ে পা ভাঙলাম। তার ফলে কি হ'ল জান?—তিন মাস স্প্লিণ্ট্ দিয়ে আমার পা বাঁধা ছিল—নড়বার উপায় ছিল না। সকালে আমাকে পড়বার ঘরে টেবিল-চেয়ারের সামনে বসিয়ে দিত; বাধ্য হ'য়ে দু-তিন ঘণ্টা বই-খাতাপত্র নিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকত হ'ত—বার ক'রে না আনলে আর বেরোবার উপায় ছিল না। দিনের পর দিন এই অভ্যাসের ফলে তিন মাস পরে যখন আমার পা সচল হ'ল তখন দেখা গেল, মন আর আগের মতো চঞ্চল নেই; তখন থেকে পড়বার ঘরে আমার পা মনের অধীনতায় স্থির হ'য়ে অপেক্ষা করত।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সহাস্যমুখে কমলা বলিল, "কিন্তু বাবা, পড়বার ঘরের বাইরে যদি আমাকে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকবার যোগাভ্যাস করতে হয় তা হ'লে হয়তো তার ফলে পড়বার ঘরে ঢোকবার ইচ্ছেটাই ক'মে যাবে।"

দ্বিজনাথ কহিলেন, "সে ইচ্ছে তোমার এত বেশি পরিমাণে আছে যে, একটু ক'মে গেলেই বোধ হয় ভাল হয়। তা ছাড়া এর উপস্থিত ফল এই হবে যে, তোমার একখানি ছবি পাওয়া যাবে, আর আর্টিস্ট কিছু টাকা পাবেন।"

কমলা বলিল, "বেশ তো; তোমার কিংবা পদ্ম-ঠাকুমার ছবি হোক না—আর্টিস্ট ও টাকা পান।"

নিকটে দাঁড়াইয়া একটি প্রৌঢ়া বিধবা দ্বিজনাথের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন; ইঁহারই নাম পদ্মমুখী। সম্পর্কে ইনি দ্বিজনাথের দূর-সম্পর্কীয়া পিসি—নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার পর দ্বিজনাথের সংসারে আশ্রয় পান। নিষ্ফল নিরবলম্ব জড় জীবনকে কর্মস্রোতে ফেলিয়া যথাসম্ভব সচল করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিজনাথের মাতা পদ্মমুখীর উপর সংসার পরিচালনার ভারার্পণ করেন। তদবধি পদ্মমুখী সংসারের কর্ত্রীস্বরূপ আছেন। কমলার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "রক্ষে কর্ ভাই। পদ্ম-ঠাকুমার আর ছবিতে কাজ নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এখন তোদের আশ্রয় ছেড়ে কোনো রকমে মা-গঙ্গার আশ্রয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।"

শেষোক্ত কামনাটি পদ্মমুখী কথায়-বার্তায় সুবিধা পাইলেই ব্যক্ত করিতেন, সুতরাং নির্বিচারে বহু ব্যবহারের ফলে কথাটি সকলের কাছে এমন সহজ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা লইয়া কৌতুক-পরিহাস করিতেও কাহারও বাধিত না—বিশেষত কমলার।

কমলা হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে তো তোমারই ছবি আঁকানো সকলের চেয়ে বেশি দরকার পদ্ম-ঠাকুমা।"

পদ্মমুখী কহিলেন, "কিছু দরকার নেই ভাই। যম যে দিন নিতে আসবে সে দিন আমাকে একেবারেই ছুটি দিস। তার পরও আমাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করিস নে।"

কমলা বলিল, "কিন্তু ছবি আঁকা না হ'লেও তো তোমার সে ফাঁড়া কাটছে না পদ্ম-ঠাকুমা? ফোটো তো তোমার অনেকগুলিই আছে, তা থেকে এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়ে অনায়াসেই দেওয়ালে টাঙানো যেতে পারবে।"

এ কথায় অবশ্য পদ্মমুখীর মুখে বেদনা অথবা বিহ্বলতার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মৃত্যুর পরেই এই বাসনা-কামনা-মোহ-মমতাময়

জীবনের সমস্ত স্মৃতি নিঃশেষে বিলুপ্ত না হইয়া কোনো একটা উপায় অবলম্বনে কিছুকাল দেওয়ালে ঝুলিয়া থাকিবে, এ লোভ হইতে পদ্মমুখীর মতো মানুষও মুক্ত নয়। জীবন যে নশ্বর, এই মহাদুঃখের এইটুকু সান্ত্বনার জন্য সাধারণ মানবচিত্ত লুব্ধ।

কথায় কথায় কথাটা এমন গতি লইল যে, মিনিট পাঁচেক পরে কাহারও মনে রহিল না, কথাটার উৎপত্তি কেমন করিয়া কোথায় হইয়াছিল।

৩

পরদিন প্রাতঃকালে যথাসময়ে আর্টিস্ট্ বিনয়ভূষণ দ্বিজনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিত্রাঙ্কণের সমস্ত সরঞ্জাম সে লইয়া আসিয়াছিল।

দ্বিজনাথ তখন গৃহ-সম্মুখে পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। বিনয় নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আমি কি একটু আগেই এসেছি?"

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আগে আসেন নি, ঠিকই এসেছেন। আর যদিই বা একটু আগে এসে থাকেন তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। চলুন, বসবেন চলুন। কমলারও তৈরী হ'তে বোধ হয় একটু দেরি আছে।"

ব্যস্ত হইয়া বিনয় বলিল, "তা থাক্, তার জন্যে তাড়াতাড়ি করবার কোনো দরকার নেই। জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতেও তো আমার সময় লাগবে। তা ছাড়া কোথায় ব'সে ছবি আঁকা সুবিধা হবে, তাও ঠিক করতে হবে।"

"বেশ, প্রথমে তা হ'লে সেইটেই ঠিক করুন।"—বলিয়া দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া বারান্দায় উপস্থিত হইলেন এবং গৃহের তিন দিকের বারান্দা, ড্রয়িং-রুম এবং অপরাপর স্থান দেখাইলেন। সমস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বিনয় পূর্বদিন দক্ষিণের বারান্দায় যেখানটায় আসিয়া বসিয়াছিল সেইখানটাই পছন্দ করিল। আলো-ছায়ার সমন্বয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টন—এ সব সুবিধা সেখানে তো ছিলই, তাহা ছাড়া

আর যে সেখানে এমন-কি জিনিস ছিল যাহার জন্য অপর কোনো জায়গাই তাহার পছন্দ হইল না, সে হিসাব সে একেবারেই করিল না। মনে করিল, এই রকম অকারণ পক্ষপাত মানবচিত্তের একটা সাধারণ ধর্ম,—এবং মনের এই স্বাভাবিক গতিকে নির্বিবাদে অনুসরণ করিলে সফলতার পথ সুগম হয়।

দ্বিজনাথকে সে বলিল, "এই জায়গাটাই আমি পছন্দ করছি, অবশ্য যদি না আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা হয়।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমাদের আবার অসুবিধা কি হবে? আপনি দরকার মতো আপনার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নিন।"

দ্বিজনাথের আহ্বানে একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বিজনাথ তাহাকে বলিলেন, "বাবু যেমন-যেমন বলবেন সব ঠিক ক'রে দে। আর বাবুর কাছে তুই বরাবর থাকবি।"

আলো-ছায়ার সুবিধা-অসুবিধা হিসাব করিয়া বিনয় তাহার ইজেল এবং কমলার বসিবার জন্য একটি চেয়ার স্থাপন করাইল। তাহার পর ইজেলের সম্মুখে নিজের বসিবার চেয়ার রাখিয়া পাশে একটা ছোট টেবিলে ছবি আঁকিবার সমস্ত সরঞ্জামগুলি সাজাইয়া লইল।

একজন ভৃত্য কিছুপূর্বে বিনয়ের জন্য খাবার ও এক পেয়ালা চা রাখিয়া গিয়াছিল। দ্বিজনাথ বলিলেন, "চা-টা খেয়ে নিন বিনয়বাবু; কমলার আসতে এখনও পাঁচ-সাত মিনিট দেরি আছে।"

বিনয় বলিল, "তা থাক্; কিন্তু অনর্থক এ-সব হাঙ্গামা কেন করলেন? —আমি তো বাসা থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।"

দ্বিজনাথ বললেন, "সে তো অনেকক্ষণ হ'ল। কাজ করতে বসবার আগে এক পেয়ালা গরম চা মন্দ লাগবে না। তা ছাড়া খাবারই বা এমন কি দিয়েছে!—নিন, ও-টুকু খেয়ে ফেলুন।"

আর আপত্তি না করিয়া বিনয় চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইল, এবং সেই অবসরে দ্বিজনাথ বিনয়ের পরিচয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিনয়ের মুখে তাহার পরিচয়ের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া দ্বিজনাথের সহানুভূতি এবং করুণার পরিসীমা রহিল না। অতি শৈশবে বিনয়ের পিতামাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যু-সময়ে তাহার বয়ঃক্রম মাত্র পাঁচ বৎসর। জননীর স্নেহোদ্ভাসিত সুন্দর মুখখানি তাহার বেশ মনে পড়ে। মৃত্যুকালে সে মুখে বিনয় যে নিদারুণ বেদনার চিহ্ন দেখিয়াছিল, জীবনে কখনো সে তাহা ভুলিবে না। মাতার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পিতার দুরারোগ্য পীড়া জন্মে। পীড়িত অবস্থায় মৃত্যুর কিছুপূর্বে পিতা তাহার সহায়হীন ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিয়া সামান্য কিছু অর্থের সহিত তাহাকে ইংরেজ মিশনরিদের এক অনাথ-আশ্রমে স্থাপন করেন। মিশনরিদের অভিভাবকতায় বিনয় স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করে। বাল্যকাল হইতে চিত্রবিদ্যায় তাহার অনুরাগ এবং নৈপুণ্যের জন্য মিশনরি কর্তৃপক্ষ চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্য তাহাকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। পাঁচ বৎসর তথায় বিভিন্ন দেশে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সে দেশে ফিরিয়া আসে। পিতৃদত্ত অর্থ বহুপূর্বে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এখন সে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিতেছে। পিতার নাম ছিল প্রিয়কান্ত রায়। তাহাদের বাড়ি কোন্ জেলার কোন্ গ্রামে ছিল তাহা সে কিছুই জানে না।

আসন্ন শরতের নির্মল আকাশ দিয়া মাল্যের মতো সুসম্বদ্ধ বৃহৎ একদল বনহাঁস উড়িয়া যাইতেছিল—তাহাদের ক্রমবিলীয়মান ঐকতানিক কণ্ঠস্বর বায়ুমণ্ডলে একটা যেন অনৈসর্গিক হতাশার কাকুক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। দূরে ডিগ্রিয়া পাহাড়ের তলদেশে গোচরভূমিতে গো-মহিষের দল

চরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহাদের কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার বিচিত্র ঢং ঢং ধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে একটা অসাধারণ পরিণতি অপেক্ষা করছে বিনয়বাবু। সহজ মানুষের সাধারণ জীবন আপনার হবে না।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "তার কোনো লক্ষণ তো এ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি নে।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "লক্ষণ সে-ই দেখতে পায়, যে দূর থেকে হঠাৎ এক সময়ে দেখে। খুব কাছে থেকে সব সময়ে লক্ষণ দেখা যায় না।"

পর্দা ঠেলিয়া কমলা প্রবেশ করিল,—সুসজ্জিতা সুন্দরী কমলা। গণ্ডে বালার্কের আভা, মুখে সকুণ্ঠ মধুর হাস্য।

যুক্তকরে বিনয়কে নমস্কার করিয়া সে অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "ক্ষমা করবেন বিনয়বাবু, আজ আপনার অনেকখানি সময় আমি নষ্ট করেছি। কাল থেকে আর তা হবে না। কাল থেকে আমি আপনি আসবার অনেক আগে তৈরী হয়ে থাকব।"

নম্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "না, আপনি তা কখনো করবেন না। সহজভাবে প্রস্তুত হ'তে আপনার যতখানি সময় লাগে তা লাগাবেন। আপনাকে বিব্রত বিরক্ত ক'রে রাখলে আমার কোনো লাভ হবে না। যে-সময়ে আপনি স্বেচ্ছায় সহজভাবে প্রস্তুত হবেন, জানবেন আমার পক্ষে সেইটেই সু-সময়।"

নিঃশব্দ মৃদুহাস্যে এ-কথার উত্তর দিয়া কমলা বলিল, "ঐ চেয়ারটায় বসব কি?"

"বসুন, চেয়ারটা আগে একটু ঠিক ক'রে দিই।" বলিয়া চেয়ারটা একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিনয় বলিল, "এবার বসুন।"

কমলা চেয়ারে উপবেশন করিলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "বসবার ভঙ্গী আপনি কিছু ঠিক ক'রে দেবেন ?—না, এই ঠিক হয়েছে ?"

বিনয় বলিল, "কিছু ঠিক করবার দরকার নেই—এই ঠিক হয়েছে। দেখুন, আমি তো শুধু ওঁর আকৃতি আঁকব না—ওঁর প্রকৃতিও আঁকব; কাজেই ওঁর ভঙ্গীর মধ্যে আমার অভিরুচি খাটালে চলবে কেন ?"

অনেক শিল্পীকে পোর্ট্রেট আঁকিতে দ্বিজনাথ দেখিয়াছেন, কিন্তু কাহারো মুখে এ ধরনের কথা তিনি কখনো শুনেন নাই। বিনয়ের কথায় মনে মনে প্রসন্ন হইয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছেন বিনয়বাবু,—আপনি দেখছি একজন প্রকৃত আর্টিস্ট্।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "আর্টিস্ট্ এত কম যে, প্রকৃত আর্টিস্ট্ নেই বললেই চলে।" তাহার পর কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি বলছিলেন, আমার সময় আপনি নষ্ট করেছেন। তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমি আপনার সে ঋণ পরিশোধ করিয়ে নোব আপনারও সময় একটু নষ্ট ক'রে। আজ আঁকার চেয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্তায় আমি একটু বেশী সময় দিতে চাই। আপনার তাতে আপত্তি হবে না তো ?"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "আপত্তি ? আমি বরং তাতে খুশি হব। কথাবার্তার চেয়ে আঁকাতেই আমার বেশী আপত্তি।"

দ্বিজনাথ কহিলেন, "দেখুন বিনয়বাবু, আমাদের বারে বি. এ. এক্‌জামিনের ফিজিক্সের পেপারে প্রশ্নের আগে একটা মন্তব্য লেখা ছিল—'*Spend more time in thinking than in writing*'। আপনারও দেখছি সেই প্রণালী।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক সেই প্রণালী।"

৪

কমলার সম্মুখে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বিনয় নিজের বসিবার আসন স্থির করিয়া লইয়া বসিল; তাহার পর ক্ষণকাল ধরিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত সে কমলাকে দেখিতে লাগিল। বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত আলোক-রেখার মধ্যে পড়িয়া কোনো জিনিসের যে অবস্থা হয়, বিনয়ের একাগ্র স্থির দৃষ্টির সম্মুখে কমলার কতকটা সেই অবস্থা হইল। লজ্জা-দ্বিধা-সঙ্কোচের বিচিত্র প্রভায় বারম্বার উদ্ভাসিত হইয়া অবশেষে যখন তাহার আকৃতি সহজ ভাব ধারণ করিল, তখন বিনয় এক খণ্ড চারকোল্ লইয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত সম্মুখস্থ ক্যান্‌ভাসের উপরে রেখা টানিতে আরম্ভ করিল।

অদূরে একটা ঈজি-চেয়ারে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়া অলস-মন্থর চিত্তে একটা সুবৃহৎ সিগার টানিতে টানিতে দ্বিজনাথ কমলার দিকে চাহিয়া ছিলেন। সহসা তন্দ্রামুক্ত হইয়া একান্ত ঔৎসুক্যের সহিত তিনি কমলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে হইল, কমলার এমন সুপরিস্ফুট মূর্তি কোনো দিনই যেন দেখেন নাই। ধ্যানাবিষ্ট কন্যার প্রশান্ত মুখমণ্ডলের রেখাগুলি যেন যাদুকরের মন্ত্র প্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিবুক প্রান্তের বক্রতা, ওষ্ঠাধরের আকুঞ্চন, কর্ণমূলের রেখা-পাত—সমস্তই যেন স্বেচ্ছায়-সহজে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়াছে। সিন্ধুপারবাসিনী বিমলাকে দ্বিজনাথের মনে পড়িল। পত্নীর নাসিকা-গঠনের সহিত কন্যার নাসিকা-গঠনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন; ততোধিক বিস্মিত হইলেন এই কথা ভাবিয়া যে, এ-পর্যন্ত একদিনও এ সাদৃশ্য তাঁহার চোখে পড়ে নাই!

চারকোল্ রাখিয়া বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, আশা করি আপনার খুব অসুবিধা বোধ হচ্ছে না?"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "না।"

"বিরক্তি বোধ হ'লেই আমাকে জানাবেন, আমি তখনি আঁকা বন্ধ করব।"

কমলা বলিল, "আচ্ছা।" তাহার পর ঈষৎ ব্যগ্রভাবে বলিল, "তাই ব'লে আপনি যেন কেবল আমার বিরক্তি-অবিরক্তির উপরই নির্ভর করবেন না। আপনার নিজের বিরক্তি অথবা সময় হ'লেও বন্ধ করবেন।"

কমলার কথা শুনিয়া বিনয় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সে ভয় করবেন না। বিরক্ত হবার আগেই আমারও বন্ধ করবার সময় হবে।" বলিয়া চারকোল্ তুলিয়া লইয়া পুনরায় আঁকিতে উদ্যত হইল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমাদের ফিজিক্সের পেপারে যে নির্দেশ ছিল আপনি কিন্তু ঠিক তা অনুসরণ করছেন না বিনয়বাবু। কথা ছিল, আঁকার চেয়ে কথায় আপনি অনেক বেশী সময় নেবেন।"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "নিশ্চয়ই নিতাম, যদি-না সদুত্তর এত সহজে এসে উপস্থিত হ'ত।"

আগ্রহভরে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সদুত্তর যে এসে উপস্থিত হয়েছে তা আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকও বুঝতে পারছে। কমলাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার চারকোল্ আর ক্যান্‌ভাস্‌টা পেলে আমিও বোধ হয় তার একটা ছবি এঁকে দিতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, আপনি যেন কোনো যোগশক্তিবলে তাকে ছবি আঁকার উপযোগী ক'রে নিয়েছেন।"

চারকোল্‌টা তুলিয়া লইয়া বিনয় আঁকিতে যাইতেছিল, কমলার আরক্তস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া সে পাশের তিপাইয়ের উপর পুনরায়

চারকোল্‌টা স্থাপন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "যোগশক্তি অত্যন্ত বড় কথা। তবে মনের মধ্যে একান্ত আগ্রহ উপস্থিত হ'লে অপর পক্ষ থেকে সহানুভূতি পাওয়া যায়—এ আমি বিশ্বাস করি।"

দগ্ধাবশিষ্ট চুরুটটা অ্যাশ-ট্রের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "সেই একান্ত আগ্রহ—যার দ্বারা অপর পক্ষের মনে সহানুভূতি উৎপন্ন হয়—যোগশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অপর বাহ্য-বিষয় থেকে মনকে সম্পূর্ণভাবে তুলে নিয়ে একটি মাত্র বিষয়ে একান্তভাবে প্রয়োগ করাকে যোগ-সাধনের মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা যেতে পারে।"

বিনয় বলিল, "কিন্তু বাহ্য-বিষয় থেকে মনকে সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া তো সহজ কথা নয় মিস্টার মিটার! তার জন্যে বহুকালব্যাপী নিরলস সাধনা চাই। সে ক'জন পারে বলুন?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সহজ কথা নিশ্চয়ই নয়,—সেই জন্যে বেশী লোকে পারে না। কিন্তু যাঁরা বড়দরের কবি কিংবা শিল্পী, তাঁরা পারেন। বড় আর্টিস্টদের আমি যোগী বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নে।" কথাটা বলিবার সময়ে, আঁকিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে কমলাকে দেখিয়া লইবার জন্য বিনয়ের একাগ্র দৃষ্টির কথা দ্বিজনাথের বারম্বার মনে পড়িতেছিল।

বনতরু-নিবদ্ধ দিগন্ত-প্রসারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর দৃষ্টি আরোপিত করিয়া বিনয় ক্ষণকাল কি ভাবিল; তাহার পর ধীরে ধীরে কতকটা নিজ মনে বলিল, "তেমন কোনো আর্টিস্টের এ পর্যন্ত তো দর্শন পেলাম না!"

কতকটা স্বগতোক্তি হইলেও দ্বিজনাথ এ-কথার উত্তরে বলিলেন, "আমি আশা করি বিনয়বাবু, আপনার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ হবে তাদের

এ ক্ষোভ করবার কোনো কারণ থাকবে না। তারা অন্তত তেমন একজন আর্টিস্টের দর্শন পাবে।"

বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে ক্ষণকাল দ্বিজনাথের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে বিনয় বলিল, "না না মিস্টার মিটার, এ কথা আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি মাথায় পেতে নেব; কিন্তু এত বড় কথা দাবি করবার কোনো কারণ নেই। ক্ষমতার তুলনায় আমার অক্ষমতার পরিমাণ আপনি জানেন না, তাই এ-কথা বলছেন।"

দ্বিজনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমি সে জন্যে বলছি নে। ক্ষমতার তুলনায় অক্ষমতার বিপুলতা সে-ই দেখতে পায় যার ক্ষমতার পরিমাণ অল্প নয়। বসুন্ধরাকে লোকে রত্নগর্ভা বলে, কিন্তু অন্য জিনিসের তুলনায় বসুন্ধরার গর্ভে রত্ন কতটুকু থাকে তা তো জানেন?"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া কমলা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে তাহার পিতার স্বভাব বিলক্ষণ চিনিত। প্রথম পরিচয়েই বিনয়ের প্রতি তাঁহার যে উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে, যাহা সহজে অপনেয় নহে, বিশেষত বিনয়ের নিজের দ্বারা, তাহা উপলব্ধি করিয়া এবং তদ্বিষয়ে এই নিরর্থক বাদানুবাদ শুনিয়া সে মনে মনে প্রচুর কৌতুক উপভোগ করিতেছিল।

দ্বিজনাথের কথার আর কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তিপাই হইতে সহসা চারকোল্ তুলিয়া লইয়া নিরতিব্যগ্রতার সহিত বিনয় ছবি আঁকিতে ব্যাপৃত হইল। দেখিতে দেখিতে রেখায় রেখায় ক্যান্‌ভাস ভরিয়া আসিল, এবং সেই একান্ত নিঃশব্দ কার্যতৎপরতাকে অবলম্বন করিয়া এমন একটা নিবিড় ভাব জমিয়া উঠিল যে, তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া দ্বিজনাথের মুখে একটি বাক্য সরিল না এবং কমলা সুনিপুণ ভাস্কর্যের অনবদ্য মর্মর প্রতিমার মতো স্তব্ধ অভিভূতিতে বসিয়া রহিল।

মনে হইতেছিল, যেন খানিকটা স্থান জুড়িয়া একটা মন্ত্রশক্তির বায়ু-মণ্ডল উৎপন্ন হইয়া সকলকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে।

প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল এইরূপে আঁকিবার পর চারকোল্ পরিত্যাগ করিয়া বিনয় বলিল, "আচ্ছা মিস্ মিত্র, অশেষ ধন্যবাদ। আজ আর আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি নে।"

যতটা সময় লাগিবে মনে করিয়াছিল তাহার বহু পূর্বে অব্যাহতি পাইয়া কমলা সবিস্ময়ে বলিল, "আজকের মতো শেষ না কি?"

সহাস্য-মুখে বিনয় বলিল, "আজকের মতো শেষ।"

আসন পরিত্যাগ করিয়া কমলা বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু কালকের সময়ে আজকের বাকি সময়টা যোগ হবে না তো?"

"না, তা হবে না।"

"কালও এই রকম অল্প সময় নেবেন?"

"খুব সম্ভব।"

"কিন্তু প্রত্যহ সময় অল্প নেওয়ার জন্যে ও-দিকে দিনে বেড়ে যাবে না তো?"

কমলার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিনয় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সময় অল্প নেওয়ার দরকার হ'লে, দিনও কম হ'য়ে যায়। তুলি যখন আপনি চলে তখন অল্প সময়ে বেশী কাজ হয়,—আর তুলিকে যখন জোর ক'রে চালাবার দরকার হয় তখন বেশী সময়ে অল্প কাজ হয়। আমার মনে হয় চোদ্দ-পনেরো দিনের জায়গায় ন-দশ দিনেই আপনার ছবি শেষ হ'য়ে যাবে।"

এ-কথার পর আর জানিবার প্রয়োজন রহিল না যে, তাহার ক্ষেত্রে তুলি আপনি চলিতেছে, না, জোর করিয়া চালাইতে হইতেছে! ঈষৎ আরক্ত-মুখে ইজেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিকৃতি

দেখিয়া বিস্ময়ে ও কৌতুকে কমলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল। অদূরে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া দ্বিজনাথ কমলার রেখা-চিত্র দেখিতেছিলেন।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কমলা বলিল, "এই কি আমার কঙ্কাল?"

"এই আপনার কাঠামো।"

কোনো কথা না বলিয়া একবার নিমেষের জন্য কমলা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

৫

তৃতীয় দিনে ছবিতে রঙ ও তুলির লীলা আরম্ভ হইল। ঘনকুঞ্চিত কেশদাম সুসম্বদ্ধ হইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িল—তাহার মধ্যস্থলে একটি উজ্জ্বল নীল বর্ণের অর্ধবিকশিত পুষ্প-কলি। সুগঠিত ললাটের উপর ঈষৎ পীতাভ শুভ্র রঙ পড়িল, তাহার উপরে সামান্য একটু চূর্ণ কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পর প্যালেটে আইভরি ব্ল্যাক্ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রঙ প্রস্তুত করিয়া বিনয় কমলার চক্ষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

"মিস্ মিত্র!"

কমলা বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "বলুন।"

"আপনি কাব্যকে উচ্চ স্থান দেন, না, চিত্রকে?"

একটু ভাবিয়া কমলা বলিল, "নিকৃষ্ট কাব্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট চিত্রকে উচ্চ স্থান দিই, আর উৎকৃষ্ট কাব্যের চেয়ে নিকৃষ্ট চিত্রকে নিম্ন স্থান দিই।"

অ্যাশ-ট্রের উপর চুরুট রাখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "এ সেই রকম হ'ল না তো?—হয় তুমি ঠাকুর-পূজো কর আমি নেমন্তন্নে যাই, নয়, আমি নেমন্তন্নে যাই তুমি ঠাকুর-পূজো কর?"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া বিনয় ও কমলা উভয়ে হাসিয়া উঠিল। সকৌতূহলে কমলা বলিল, "তা-ই বলেছি না-কি আমি?"

বিনয় বলিল, "না, আপনি তা বলেন নি; কিন্তু যা বলেছেন আমার প্রশ্নের তা যথার্থ উত্তর হয় নি। আমার প্রশ্নকে অতিশয় সহজ ক'রে নিয়ে আপনি নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন।"

সহাস্যমুখে কমলা বলিল, "কিন্তু আপনার প্রশ্নকে সহজ ক'রে না নিলে তা যে অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে ওঠে!"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, সহজে উত্তর পাবার একটা প্রণালী আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা কোনো কবিতা, যা আপনার অত্যন্ত ভাল লাগে, মনে করুন।"

একটু চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "করেছি।"

"আচ্ছা, এবার এমন একটা ছবি, যা আপনার খুব পছন্দ হয়, মনে করুন।"

পুনরায় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "করেছি।"

"এবার বলুন, এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটাকে যদি একেবারে চিরদিনের জন্য বর্জন করতে হয়,—এমন কি তার স্মৃতি পর্যন্ত, তা হ'লে আপনি কোন্‌টাকে বর্জন করবেন?—ছবিকে, না, কবিতাকে?"

চিন্তিত-স্মিত মুখে নতনেত্রে কমলা ভাবিতে লাগিল, এবং তদবসরে বিনয় ধীরে ধীরে চিত্রের দক্ষিণ নেত্রের ভ্রূর স্থানে দুই-একবার তুলি চালাইয়া লইল।

মুখ হইতে চুরুট বিমুক্ত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "যদি আপনার কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে তা হ'লে আমি একটা কথা বলি বিনয়বাবু।"

ব্যগ্র কণ্ঠে বিনয় বলিল, "নিশ্চয়ই বলুন। আমি তো বলেছি কথাবার্তা করবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা নেই। কথাবার্তা করবার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ছবি আঁকার জন্যে মিস্ মিত্রের যেটুকু কষ্ট হবার সম্ভাবনা, তা যথাসম্ভব লাঘব করা।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "একটি ছোট ছেলেকে তার অঙ্কের শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেখ বাপু, তোমার ডান হাতে পাঁচটা সন্দেশ আর বাঁ হাতে চারটে সন্দেশ দিয়ে যদি ডান হাত থেকে দুটো সন্দেশ

নিয়ে নিই তা হ'লে সব সুদ্ধ তোমার কাছে ক'টা সন্দেশ থাকে?' উত্তরে ছেলেটি বলেছিল, 'আমি একটাও দোব না—আমার সব থাকবে।' সন্দেশের বিষয়ে ছোট ছেলের এ-উত্তর যদি নির্ভুল হয়, তা হ'লে কবিতা আর ছবির বিষয়ে কমলার এই রকম একটা কোনো উত্তর বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে না।"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া বিনয় ও কমলা হাসিতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "আচ্ছা মিস্ মিত্র, আপনি সেই রকম একটা কিছু উত্তর দেবেন মনে ক'রে আমি নিরস্ত হলাম; ছবি আর কবিতা—দুই-ই আপনার থাকল। এবার তা হ'লে আমি একটু নিজের কাজ করি।" বলিয়া তুলি লইয়া আঁকিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট দুই-তিন আঁকিয়া সে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?"

চকিত-নেত্রে কমলা বলিল, "কখনো না।"

"ভূত বিশ্বাস করেন?"

একটু ভাবিয়া কমলা বলিল, "ঠিক করি নে।"

"ভূতের ভয় করেন?"

"খুব করি।"

দ্বিজনাথ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এ-বিষয়ে ভূতের সঙ্গে ভগবানের সমান অবস্থা। লোকে ভগবানকে ভক্তি করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না।"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল "সে-কথা ঠিক। প্রেতাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এ-ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই।" তাহার পর কমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি বাঘকে নিশ্চয়ই ভয় করেন?"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "করি; তবে চিড়িয়াখানার বাঘকে নয়।"

দ্বিজনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, সে কথাটা মনে ছিল না বটে। আমি অবশ্য বলছি জঙ্গলের ছাড়া বাঘের কথা।"

"তা করি।"

"আচ্ছা, আপনাকে যদি বলা যায় যে, গভীর রাত্রে হয় এমন কোনো শ্মশানে, যেখানকার বিষয়ে খুব ভয়াবহ ভূতের কাহিনী বহু লোকের জানা আছে, নয় এমন কোনো জঙ্গলে, যেখানে বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—এই দুই জায়গার মধ্যে এক জায়গায় নিশ্চয় যেতে হবে আপনি কোথায় যান ?—শ্মশানে, না, জঙ্গলে ?"

এক মুহূর্ত ভাবিয়া কমলা বলিল, "আমি শ্মশানে যাই।"

বিনয় বলিল, "আমিও শ্মশানে যাই।"

শূন্যে চুরুটের ধূমে কুণ্ডলী রচনা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমিও শ্মশানে যাই।"

এই সর্ববাদী সম্মতির কৌতুকে একটা উচ্ছ্বসিত হাস্যধ্বনি উঠিল। তৎপরে পুনরায় কিছুক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে ছবি আঁকা চলিল।

দূরে রেল-স্টেশনে পশ্চিম-যাত্রী এক্সপ্রেস্ গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার বৃহৎ সবল এঞ্জিনের নিশ্বাসধ্বনি এত দূর হইতেও শুনা যাইতেছে। কিছু পরে ঘণ্টা পড়িল, বাঁশী বাজিল, তিন চারবার সজোরে ভস্ ভস্ শব্দে উৎসাহোচ্ছ্বাস করিয়া গাড়ি ছুটিয়া চলিল। অবশেষে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ির ঘণ্টা পড়িল। গাড়ি ছাড়িয়া গৃহসম্মুখস্থ পথের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। কক্ষে কক্ষে বাতায়নে বাতায়নে কৌতূহলী যাত্রীর দল মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। স্ত্রী-কামরায় ফুটন্ত ফুলের মতো দুই-তিনটি সুন্দর মুখ নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"মিস্ মিত্র, দয়া ক'রে একটুখানি মুখ ফেরাবেন কি ;"

চাহিয়া দেখিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে ?"

"ডান দিকে সামান্য একটু ;—গেটের পাশে ওই যে স্থলপদ্মের গাছ—ওই ফুলগুলোই দেখুন না।"

কমলা স্থলপদ্ম দেখিতে লাগিল।

"আচ্ছা, আপনার লাল স্থলপদ্ম বেশী ভাল লাগে, না, সাদা ?"

কমলার অধর-প্রান্তে ক্ষীণ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "লাল।"

"সত্যি, কি চমৎকার রঙ! আর কত ফুলই না গাছটায় ফুটেছে! বাগানের ও-দিকটা যেন আলো ক'রে রেখেছে! আমারও লাল স্থলপদ্ম ভাল লাগে।"

কমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সাগ্রহে তুলি ধরিয়া দুই-তিন টান দিয়া বিনয় বলিল, "ধন্যবাদ মিস্ মিত্র। আজ এই পর্যন্ত।"

নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া কমলা ছবির সম্মুখে দাঁড়াইল। ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। কমলার কাঠামো অবলম্বন করিয়া এ কি দেবী-প্রতিমা গড়িয়া উঠিতেছে! এ কি তাহার নিজের প্রতিকৃতি ?—সে কি সত্যই এমন সুন্দর ?—না, ইহার মধ্যে শিল্পীর মানস-প্রতিমার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে ? কতটুকুই বা আঁকা হইয়াছে!—কেশ, ললাট আর চক্ষু।—অথচ ঠিক যেন মনে হইতেছে রাহুর আবরণ ভেদ করিয়া গ্রহণের চাঁদ অল্প একটু দেখা দিয়াছে।

নিমেষের জন্য কমলা অপাঙ্গে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, বিনয় নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বিনয় বলিল, "এখন দেখে কিন্তু হতাশ হবেন না। এখনো অনেক বাকি আছে।"

কমলা মুখে কিছু বলিল না ; মনে মনে বলিল, 'তা হ'লে দেখছি পরে এর মধ্যে আমার কোনো কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!'

৬

দেওঘরের কাস্‌টেয়ার্স টাউনে সুকুমার বসুর গৃহ। সুকুমারের গৃহ প্রশস্ত, কিন্তু সে হিসাবে পরিজনবর্গ অল্প। বিধবা জননী, সে নিজে, তাহার স্ত্রী, দুইটি শিশুপুত্র এবং অনূঢ়া ভগিনী শোভা—এই লইয়া তাহার সংসার।

ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে ই. আই. রেলওয়ের কোনো ইংরাজ উচ্চ কর্মচারীকে মধুপুর রেল-স্টেশনের তিন-চার মাইল দূরে লাইনের ধারে সর্প দংশন করে। উক্ত কর্মচারীর সঙ্গে ছিলেন সুকুমারের পিতামহ মহেশচন্দ্র। তিনি রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে সামান্য বেতনের চাকরি করিতেন। যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে সাহেব অভিভূত হইয়া পড়িলে প্রত্যুৎপন্নমতি মহেশচন্দ্র সাহেবের আহত স্থলের ঊর্ধ্বে দৃঢ়রূপে রজ্জু বাঁধিয়া, আহত স্থল ছুরি দিয়া কাটিয়া, তথায় মুখ দিয়া কতকটা রক্ত শোষণ করিয়া ফেলিয়া ট্রলি করিয়া সাহেবকে মধুপুরে লইয়া আসেন। প্রাণ রক্ষা পাইয়া সাহেব মহেশচন্দ্রের উপকারের কথা ভুলিলেন না। সৎসাহস ও কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কারস্বরূপ মহেশচন্দ্র কোম্পানি হইতে পারিতোষিক লাভ তো করিলেনই, অধিকন্তু সামান্য বেতনের চাকরি হইতে মুক্তি পাইয়া রেলওয়ের অধীনে ঠিকাদারিতে প্রবেশ করিলেন। উপরওয়ালার কৃপাদৃষ্টির সহিত লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি মিলিত হইল; অল্পকালের মধ্যে মহেশচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া দেওঘরে বাড়ি করিলেন। একমাত্র পুত্রের মতি-গতি উপলব্ধি করিয়া মহেশচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় ঠিকাদারি বন্ধ করিলেন এবং উপার্জিত বিষয়-সম্পত্তির এরূপ পাকা ব্যবস্থা করিলেন, যাহার ফলে পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল ব্যয় এবং অপচয় সহ

করিয়াও পৌত্র সুকুমারের হস্তে এমন অর্থাবশেষ পৌঁছিয়াছে, যদ্দ্বারা -সাড়ম্বরে না হইলেও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা চলিয়া যাইতে পারে।

মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুত্র বিহারীলাল সুকুমারের অধ্যয়নের অছিলায় কলিকাতায় মানিকতলা স্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া করিয়া অসঙ্গত জীবনযাপনের সুবিধা করিলেন। এবং আট-দশ বৎসর বিনা অগ্নিতে পত্নী গিরিবালাকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে একদিন যখন উৎকট মদ্যপানের ফলে ইহলীলা শেষ করিলেন, ততদিনে সুকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি লাভের প্রবেশ-দ্বারে উপর্যুপরি তিনবার মাথা ঠুকিয়াছিল। স্বামীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত এবং পুত্রের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া গিরিবালা কলিকাতার বাস তুলিয়া দিয়া দেওঘরের বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। এ ঘটনায় ক্ষতি হইল একমাত্র শোভার; কারণ তাহার যাহা বন্ধ হইল, বাস্তবিকই তাহা লেখা-পড়া,—তাহার দাদার মতো লেখা-পড়ার অভিনয় নহে।

কলেজে অধ্যয়নকালে সহপাঠী বিনয়ভূষণের সহিত সুকুমারের পরিচয় ক্রমশ বন্ধুত্ব হইতে সৌহৃদ্যে এবং সৌহৃদ্য হইতে সখ্যে পরিণত হইয়া অবশেষে এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, বহুকালব্যাপী নানাবিধ বিচ্ছেদ ব্যতিক্রমেও তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সুকুমারের নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া বিনয় প্রায় মাসাবধি সুকুমারের গৃহে অতিথি হইয়া যাপন করিতেছে। দেওঘরে আসিয়া দুই-তিন দিন পরেই সে স্বতন্ত্র বাসস্থানের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, কিন্তু সুকুমারের পরিবারে সে কথা একেবারেই আমল পায় নাই। গিরিবালা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সুকুমার আমার একমাত্র ছেলে। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্মে তার দোসর হ'তে তা হ'লে কি আমি সুখী হতাম না? তোমাকে যে আমি পেটে ধরি নি, এইটুকুই তো শুধু তফাত।" সুকুমারের স্ত্রী শৈলজা

বলিয়াছিল, "ঠাকুরপো, আপনি এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন যে, আপনি আমাদের আত্মীয় নন?" সুকুমার হাসিয়া বলিয়াছিল "আলাদা বাসা যদি নিতান্তই নাও বিনু, তা হ'লে এমন বড় দেখে নিয়ো যাতে আমরাও সকলে গিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। তাতে আশা করি, তোমার আপত্তি হবে না?" অগত্যা বিনয়ভূষণকে স্বতন্ত্র বাসার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। গৃহসম্মুখের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ চামেলী-লতার ঝাড়ের পাশে মধ্যে একটা বেতের টেবিল লইয়া বিনয় ও সুকুমার চায়ের প্রত্যাশায় মুখোমুখী বসিয়া গল্প করিতেছিল। পাশে একটা উঁচু চার-কোণা কাঠের টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। দুই হাতে দুই প্লেট্ খাবার লইয়া আসিয়া বেতের টেবিলের উপর রাখিয়া শোভা টি-পটের ঢাক্না খুলিয়া চামচ দিয়া চায়ের জল নাড়িয়া দেখিল, জল প্রস্তুত হইয়াছে। তখন সে চা তৈয়ারী করিতে ব্যাপৃত হইল।

অদূরে একটা ইজেলের উপর ক্যান্‌ভাসে শোভার ছবি খানিকটা অঙ্কিত রহিয়াছে,—যতটা কমলার আঁকা হইয়াছে প্রায় ততটাই। যেদিন সকালে কমলার ছবি আঁকা শুরু হয়, সেই দিন বৈকাল হইতেই বিনয় শোভার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করে। শোভার ছবি আঁকিলে বিনয়ের নিতান্ত অকারণ পরিশ্রম ও অনাবশ্যক ব্যয় হইবে বলিয়া সকলে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু বিনয় কাহারও কথা শুনে নাই। সুকুমার যখন বলিয়াছিল, "অনর্থক শোভার ছবি এঁকে কি লাভ হবে বিনু?" তখন সে সহাস্যমুখে উত্তর দিয়াছিল, "আর কিছু লাভ হোক আর না-হোক, দুটো ছবির মধ্যে কোন্‌টা

ভাল হয় তা তো বোঝা যাবে—যেটা অনর্থক আঁকব সেটা, না, যেটা অর্থের জন্য আঁকব সেটা!"

এইরূপে বিনয়ের দুইটি ক্যান্‌ভাসে সকালে বিকালে ধীরে ধীরে দুইটি ফুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটিকে যদি রজনীগন্ধা বলিতে হয় তাহা হইলে অপরটি নিশ্চয়ই অপরাজিত;—কারণ, শোভার দেহের বর্ণ ঘনপল্লবাশ্রিত ছায়ার মত শ্যামল। কিন্তু পুষ্পোদ্যানে অপরাজিতার যে স্থান, সৌন্দর্যের স্তর-মালায় শোভার স্থান ঠিক তত্টাই উচ্চে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়,—একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ",—মনে হয়, গঠনের সৌষ্ঠব দেহের বর্ণকে এতখানিও পরাজিত করিতে পারে!

"বিনুদা! আর এক পেয়ালা চা দেব?"

শূন্য পেয়ালাটা শোভার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বিনয় বলিল, "নিশ্চয় দেবে। এত ভাল চা ক'রে মাত্র এক পেয়ালা দিলে পাপ হয়।"

শোভার মুখে সলজ্জ মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। টি-পট্ হইতে বিনয়ের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সে বলিল, "কোনো দিনই তো আপনি বলেন না যে, খারাপ হয়েছে।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তার একমাত্র কারণ কোনো দিনই খারাপ হয় না। একদিন একটু খারাপ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ আমাকে দাও।"

শোভা বলিল, "খারাপ হ'লেও আপনি সুখ্যাতি করবেন।"

অত্যধিক বিস্ময়ের ভাব মুখে আনিয়া বিনয় বলিল, "খারাপ হ'লেও সুখ্যাত করব? কেন, বল তো শোভা?—আমাকে এতটা কপট ব'লে কেন তোমার মনে হ'ল!"

আবার শোভার মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "এর মধ্যে

কয়েকদিন খারাপ চা হয়েছিল, কিন্তু সে-সব দিনেও আপনি সুখ্যাতি করেছিলেন।"

শোভার উত্তর শুনিয়া সুকুমার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এর আর জবাব নেই।"

বিনয় বলিল, "জবাব আছে ভাই।" তাহার পর শোভাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শোভা!"

সুকুমারের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে শোভা বলিল, "বলুন।"

"একটা কথা আছে জান তো?"

"কি কথা?"

"আপ্‌ রুচি খানা?"

"জানি; আপনিই একদিন বলেছিলেন।"

"তা হ'লে তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি মিলবে, এর কি মানে আছে বল? তোমার যেদিন খারাপ লেগেছিল আমার হয়তো সে দিন ভালই লেগেছিল।"

শোভা বলিল, "আমার রুচির সঙ্গে আপনার রুচি যদি না মেলে তা হ'লে আমার যেদিন ভাল লাগে সেদিন তো আপনার খারাপ লাগা উচিত। কিন্তু সেদিনও আপনার ভাল লাগে কেন?"

হাসিয়া উঠিয়া সুকুমার সোল্লাসে বলিল, "চমৎকার! এর সত্যিই কোনো জবাব নেই।"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "সেদিন আমার ভাল লাগে চা ভাল হয় ব'লে—আর অন্যদিন আমার ভাল লাগে তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি না মিলতে পারে ব'লে।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শোভা বলিল, "তা হ'লে আপনার খারাপ লাগবে কোন্ দিন শুনি?"

"বোধ হয় এমন কোনো দিন, যেদিন তোমার না লাগবে ভাল, না লাগবে খারাপ।" বলিয়া বিনয় উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুকুমার বলিল, "হারলে চলবে না শোভা! এর একটা ভাল রকম উত্তর দেওয়া চাই।"

কিন্তু উত্তর দিবার অবসর পাওয়া গেল না, বাহিরে রাজপথে গেটের সম্মুখে একটা বৃহৎ মোটরকার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দৃষ্টি পড়িল প্রথমে শোভার। সে বলিল, "দাদা, দেখ কারা এসেছেন!"

সুকুমার ও বিনয় যখন চাহিয়া দেখিল, তখন দ্বিজনাথ মিত্র গাড়ির দ্বার খুলিয়া অবতরণোদ্যত হইয়াছেন এবং কমলা গাড়িতে বসিয়া আছে।

"সুকু, দ্বিজবাবুরা এসেছেন, তুমি ডেকে আনবে চল।" বলিয়া বিনয় ত্বরিতপদে গেটের দিকে অগ্রসর হইল।

গাড়ির নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় ও সুকুমার সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিজনাথ ও কমলাকে লইয়া আসিল।

দ্বিজনাথকে প্রণাম করিয়া শোভা কমলার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আসাতে কত যে খুশি হয়েছি তা আর কি বলব! চল ভাই, বাড়ির ভেতর চল।"

সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া কমলা বলিল, "আমি তো তোমার কথা ঠিক জানতাম না ভাই। আমিও তোমাকে হঠাৎ দেখে ভারি খুশি হয়েছি।" তাহার পর অদূরবর্তী ইজেলের উপর ক্যান্‌ভাসে দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "ও-ছবি বিনয়বাবু আঁকছেন বুঝি?—চল তো দেখে আসি।"

ছবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, "তোমার ছবি?"

"হ্যাঁ।"

একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে ক্ষণকাল দেখিয়া কমলা বলিল, "চমৎকার হচ্ছে!"

মৃদু হাসিয়া শোভা বলিল, "চমৎকার হচ্ছে? তা কি ক'রে হবে ভাই? আসলই যে চমৎকার নয়।"

একবার নিমেষের জন্য শোভাকে নিরীক্ষণ করিয়া কমলা বলিল, "আসলটি তো চমৎকার!"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "সে কি কমলা? কালো তোমার ভাল লাগে?"

কমলা হাসিয়া বলিল, "তোমার মত কালো ভাল লাগে।"

শোভা বলিল, "তোমার মত সুন্দরের মুখ থেকে এ কথা শুনলে একটু ভরসা হয়।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মৃদু হাসিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

"যে জিনিস আমার নিজের মধ্যে নেই আমার বাপ মা স্নেহ ক'রে আমার নামের মধ্যে সেই জিনিস দিয়েছেন।—আমার নাম শোভা।" বলিয়া শোভা হাসিতে লাগিল।

কমলা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, তোমার বাপ-মা বুঝেই তোমার নাম দিয়েছেন। তোমাকে দেখলে মনে হয় ওই জিনিসটাই তোমার মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে আছে।" তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শোভা, তোমার ছবিটা বিনয়বাবু কবে আরম্ভ করেছেন?

শোভা বলিল, "যেদিন সকালে তোমার ছবি আরম্ভ করেছেন, ঠিক সেই দিন বিকেলে।"

একটু বিস্মিত স্বরে কমলা বলিল, "ঠিক একই দিনে? কেন, বল তো?"

শোভা বলিল, "তাঁর খেয়াল! বললেন, দুটো ছবি একসঙ্গে আরম্ভ ক'রে দেখা যাক, কোন্‌টা ভাল হয়! এ-ও কি দেখতে হবে ভাই? ভাল কোন্‌টা তা তো বোঝাই যাচ্ছে।"

কমলা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। আর কিছুক্ষণ শোভার ছবি দেখিয়া বলিল, "চল ভাই, বাড়ির ভেতর যাবে বলছিলে—চল।"

যাইতে যাইতে শোভা বলিল, "তুমি আমার কথা আজ জানলে; আমি কিন্তু এ কয়েক দিন ধ'রে তোমার কত কথাই শুনেছি।"

সবিস্ময়ে কমলা বলিল, "আমার কথা? কার কাছে? বিনয়বাবুর কাছে?"

"হ্যাঁ, বিনুদার কাছে।"

"কিন্তু তিনি— তিনি আমার কথা বিশেষ কিছু জানেন না তো!"

"সে কি আর তেমন কোনো কথা?—এমনি সব।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "ও।"

বারান্দায় উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহারা দুইজনে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন বিশ্বনাথ সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের বাড়ির নাম 'কোব্রা হাউস্' হ'ল কেন? নামটি একটু অ-সাধারণ ব'লে বাড়ি খুঁজে বার করতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি।"

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে কাহিনী বলা হইয়াছিল, সুকুমার তখন সেই কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

ড্রয়িং-রুম এবং তৎপরে আর একটি কক্ষ পার হইয়া ভিতরের বারান্দায় পৌঁছিয়া অন্তঃপুরের মূর্তি দেখিয়া কমলা যতখানি বিস্মিত হইল, খুশি হইল ততখানি। হ্যাট্‌কোটধারী স্বামী-সাহেবের পশ্চাতে শাড়ি-পরিহিতা শান্ত স্ত্রীটির মতো, হালফ্যাশনের বহির্বাটির পশ্চাতে সেকেলে প্রথার অন্তঃপুরটি নির্বিবাদ নিশ্চিন্ততায় অবস্থান করিতেছিল। উভয়ের বহিরাবরণে যতখানিই বৈলক্ষণ্য থাকুক না কেন, অন্তরের যোগ-প্রবাহে তাহাতে কিছুমাত্র বাধা পড়ে নাই। বহির্বাটি হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মনে হয়, রেল হইতে নামিয়া স্টীমারে না চড়িয়া নৌকায় চড়িলাম। একটি চলে কলে, অপরটি পালে; কিন্তু গতিবিধির যোগসূত্রে পরস্পরে আবদ্ধ।

নিত্য-লিপ্ত পরিচ্ছন্ন সুবৃহৎ অঙ্গন; চতুর্দিকে চক-বাঁধানো বারান্দা; তাহার কোলে কোলে কক্ষ-শ্রেণী। উঠানের একদিকে শস্যপূর্ণ তিনটি মরাই, তাহার পাশে একটি সান-বাঁধানো চাতাল, উপরে খোলার ছাউনি। চাতালের উপর গুরুভার পাথরের জাঁতা; দুইটি স্থানীয় রমণী মৃদু গীতগুঞ্জনের সহিত গম পিষিতেছে। অপর দিকে মর্মরমণ্ডিত তুলসীমঞ্চে তুলসীগাছ। তাহার ঘন-পল্লবিত শাখায় শাখায় নিষ্ঠাবতী অন্তঃপুরচারিণীগণের সেবা-যত্নের চিহ্ন অঙ্কিত। চতুর্দিক মার্জিত, লিপ্ত,—কোথাও মালিন্যের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ নাই। মনে হয়, লক্ষ্মী যেন গৃহ-পদ্মাসনটি আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন।

বিস্ময়ে-পুলকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, "কি চমৎকার!"

মৃদু হাসিয়া শোভা বলিল, "কি চমৎকার ?"

"তোমাদের বাড়ির ভেতরটি।"

"ভাল লাগছে তোমার ?"

"খুব।"

চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া শোভা বলিল, "খুব ?—কি এমন দেখলে কমলা যে, খুব ভাল লাগল !"

শোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে কমলা বলিল, "তা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না শোভা। যে যেখানে প্রতিদিন বাস করে, সেখানকার সৌন্দর্য তার চোখে ঢাকা প'ড়ে যায়। ওগুলো কি বল তো ?" বলিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া কমলা অঙ্গনের একদিকে দেখাইল।

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "ওগুলো মরাই। মরাই তুমি কখনো দেখ নি না-কি ?"

লজ্জিত মুখে কমলা বলিল, "এই মরাই ? না, এর আগে আমি মরাই কখনও দেখি নি।"

"মরাইয়ে কি হয় তা জান তো ?"

শোভার এ প্রশ্নে কমলা হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, "ধান-টান থাকে—বইয়ে পড়েছি।"

পাশের একটি কক্ষে গিরিবালা গৃহকর্মে রত ছিলেন, শোভার সহিত অপরিচিত কণ্ঠের কথাবার্তা শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া বাহিরে আসিয়া কমলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এটি কে শোভা ?"

স্মিতমুখে শোভা বলিল, "আন্দাজ কর তো মা, কে ? আন্দাজ ক'রে তোমার বলা উচিত।"

গিরিবালা কোনো কথা বলিবার পূর্বে কমলা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গিরিবালার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল,

"আন্দাজ আর কি ক'রে করবেন মা? আন্দাজ করবারও একটা উপায় থাকা চাই তো!"

কমলার চিবুক স্পর্শপূর্বক চুম্বন করিয়া গিরিবালা সহাস্যমুখে কহিলেন, "সে উপায় আছে বইকি মা। লক্ষ্মীর মতো এমন শ্রী কমলার ভিন্ন আর কার হবে? তুমি কমলা। বিনুর মুখে তোমার এত সুখ্যাতি শুনেছি যে, তোমার মতো এমন সুন্দরী আর-একটি মেয়ে অল্পদিনের মধ্যে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, এ আন্দাজ করা খুব সহজ।"

যে কথার মধ্যে এই অপরিমিত রূপ-প্রশংসা নিহিত রহিয়াছে, সে কথার একটা-কোনো উত্তর দিতে পারিলে বোধ হয় ভাল ছিল,—সুরুচিসঙ্গত মৃদু প্রতিবাদের মতো যা-হয় একটা কিছু; কিন্তু মুখমণ্ডলে শুধু একটা ফিকা রক্তোচ্ছ্বাস ভিন্ন কমলার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না।

জননীর কথায় প্রীত হইয়া শোভা বলিল, "তাই তো আমি বলেছিলাম মা, তুমি ঠিক আন্দাজ করতে পারবে।"

এবার কমলা কথা কহিল; বলিল, "মার আন্দাজ ঠিক হয়েছে, কিন্তু ভুল প্রণালীতে।"

সকৌতূহলে গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা? ভুল প্রণালীতে কেন?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারছ না মা?—কমলা বলতে চায়, সে এমন কিছু সুন্দরী নয় যে, তাকে দেখে তোমার আন্দাজ করা উচিত হয়েছে যার বিষয়ে বিনুদা অত সুখ্যাতি করেন ও সেই কমলা।" তাহার পর কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "যে যে জিনিস প্রতিদিন দেখে সে জিনিসের সৌন্দর্য তার চোখে ঢাকা প'ড়ে যায়। তুমি যদি তোমাকে নিত্য না দেখতে, তা হ'লে—।

বাকিটুকু বুঝেছ তো কমলা?" বলিয়া শোভা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

কমলা সহাস্যমুখে বলিল, "বুঝেছি, আমারই অস্ত্রে আমাকে মারতে চাও!"

শোভা হাসিয়া বলিল, "দেখছ তো? নিজের অস্ত্র কেমন সময়ে সময়ে নিজেরই গলা কাটে?"

কমলা বলিল, "দেখছি বইকি!"

কমলার আত্মীয়-পরিজন এবং অপরাপর বিষয়ে সমস্ত সংবাদ লইয়া দ্বিজনাথ ও কমলার জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে গিরিবালা প্রস্থান করিলেন। কমলাকে লইয়া শোভা তাহার নিজ কক্ষে উপস্থিত হইল।

"এইটি তোমার ঘর?"

"এইটি।"

"এ ঘরে তুমি একলা শোও?"

"আমি আর বিশু দুজনে শুই। পাশের ঘরে মা থাকেন।"

"বিশু কে?"

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে শোভা বলিল, "বিশুকে জান না? বিশু আমার দাদার বড় ছেলে।"

"তোমার দাদার বড় ছেলে? তা হ'লে তোমার বউদিদি কই?"

শোভা বলিল, "বউদি আজ সকালে ছেলে দুটিকে নিয়ে তাঁর মামীর বাড়ি গেছেন। এখনি আসবেন। দেখো, তোমাকে দেখে কত খুশি হবেন।"

ঘরের একদিকে একটা আলমারীর ভিতর বাংলা ইংরাজী বহুসংখ্যক পুস্তক সাজানো রহিয়াছে দেখিয়া কমলা আলমারির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "তুমি এত বই পড় শোভা?"

শোভা বলিল, "এত বই পড়লে তো তোমার মত পণ্ডিত হতাম কমলা। পড়ি আর কই ?"

শোভার কথা শুনিয়া কমলা মৃদুহাস্য করিল, কিছু বলিল না। তাহার পর কথায় কথায় পুনরায় ছবি আঁকার কথা উঠিল।

"শোভা!"

"কি ভাই ?"

"তোমার ছবি আঁকতে বিনয়বাবু প্রত্যহ কত সময় নেন ?"

"তার কি কোনো ঠিক আছে ? কোনো দিন পনেরো-কুড়ি মিনিট —কোনো দিন বা তিন ঘণ্টা।"

"কেন,—এ রকম কেন ?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "কেনর কোনো উত্তর আছে ? খেয়াল। শিল্পীমানুষ, যেদিন যেমন মেজাজ থাকে।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কমলা বলিল, "ছবি আঁকবার সময়ে তোমার সঙ্গে গল্প করেন ?"

"অনবরত।"

"কি সব গল্প করেন ?"

"তারই কি ঠিক আছে। যা-তা। বেশীর ভাগ তোমার কথা বলেন।"

শুনিয়া কমলা মনে মনে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে বলিল, "বেশীর ভাগ আমার কথা ? কি বিপদ! আমার কথা এমন উনি কি জানেন যে, আমার কথা এত বলেন ?"

শোভা বলিল, "এই ধর, আজই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, লাল স্থলপদ্ম আর সাদা স্থলপদ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে আমার কোন্‌টা ভাল লাগে। আমি বললাম, সাদা। তাতে উনি বললেন, 'কমলার ভাল লাগে লাল'।"

"ওঁর কোন্‌টা ভাল লাগে তা কিছু বললেন ?"

"বললেন, লাল।"

শুনিয়া কমলার মুখ অনেকটা লাল স্থলপদ্মেরই মত লাল হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা ভাই কমলা, তোমার কি সাদা স্থলপদ্ম একেবারেই ভাল লাগে না ? আমাদের বাড়ির পেছন দিকে লাল আর সাদা দু রকমই আছে ; তুমি যদি দেখতে চাও তোমাকে দেখাতে পারি শ্বেত স্থলপদ্ম, গাছ আলো ক'রে না হোক, গাছ কালো ক'রেও দাঁড়িয়ে নেই।" বলিয়া শোভা হাসিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "আমাদেরও বাড়ির পিছন দিকে শ্বেত স্থলপদ্মের গাছ আছে—আজ দুপুরবেলা দু রকম স্থলপদ্ম মিলিয়ে দেখছিলাম। কি জানি কেন তখন বলেছিলাম লাল, আমারও শ্বেত স্থলপদ্মই ভাল লাগে।"

কমলার কথা শুনিয়া শোভা উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমারও শ্বেত স্থলপদ্ম ভাল লাগে ?—বলতে হবে এ কথা বিনুদাদাকে। দেখি এবার তিনি কি বলেন !"

ব্যস্ত হইয়া কমলা বলিল, "ছি ! শোভা ! এ কথা কখনো বিনয়বাবুকে ব'লো না !"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "কেন ? বললে কি ক্ষতি হবে ?"

"মনে মনে তিনি কি ভাববেন বল দেখি ?—সকালে লাল, বিকেলে সাদা ! আরো একটা রঙ থাকলে কাল সকালে হয়তো সেইটেই হ'ত !"

শোভা বলিল, "তাতে কোনো দোষ হয় না। সাদা যদি সত্যিই ভাল লেগে থাকে তা হ'লে সকালে লাল ভাল বলেছ ব'লে

বিকেলেও যে লাল ভাল বলতে হবে তার কোনো মানে নেই।”

কথাটার শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বাহিরে ঠক্ ঠক্ করিয়া জুতার শব্দ শুনা গেল, এবং পর-মুহূর্তেই ‘পিচিমা এচেচি’ বলিয়া তিন বৎসরের ছেলে বিশ্বপতি প্রশান্ত মনে ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া অপরিচিতাকে দেখিয়াই মুহূর্তের মধ্যে তাহার মুখে চক্ষে একটা কঠিন ভাব ফুটিয়া উঠিল। ত্বরিতপদে শোভার নিকট উপস্থিত হইয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার অঞ্চলপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দ ঔৎসুক্যের সহিত সে কমলার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিশুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্মিতমুখে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, “বিচু, ইতি কে বল দেখি?”

কোনো কথা না বলিয়া কমলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিশু বার দুই তিন সজোরে মাথা নাড়িল,—অর্থাৎ এ সকল অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গে লিপ্ত হইতে আদৌ স্বীকৃত নহে।

শোভা বলিল, “ইনি তোর কমলাপিচি হন।”

ঠিক পূর্বের মতো নিঃশব্দে শিরঃসঞ্চালিত করিয়া বিশু তাহার পরিপূর্ণ অনাশক্তি ব্যক্ত করিল। কিন্তু কমলা সহসা সকলের অতর্কিতে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল; দুই বাহু দিয়া হঠাৎ বিশ্বপতিকে একেবারে তুলিয়া লইয়া বক্ষের উপর স্থাপন করিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য বিশু একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া কমলার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ সে নিজের আলম্বিত পদদ্বয় কমলার দেহ হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া নিঃশব্দে নাড়িতে লাগিল। মস্তক কমলার মুখের অত্যন্ত নিকটে থাকায় এবার সে শিরঃসঞ্চালন সমীচীন মনে করিল না।

বাম বাহু দ্বারা বিশুর পৃষ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া সহাস্যমুখে কমলা বলিল, "সত্যি বিচু, আমি তোমার কম্‌লাপিচি।"

অবশেষে সুন্দর মুখের জয় হইল; বিশ্বপতি পদসঞ্চালন বন্ধ করিয়া কমলার স্কন্ধে তাহার পরাজিত মস্তক ন্যস্ত করিল।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল শৈলজা। বিশুকে কমলার ক্রোড়ে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এরই মধ্যে এসে কাঁধে চড়েছে?

কমলা হাসিয়া বলিল, "এরই মধ্যে নয়, অনেক পরে আর অনেক কষ্টে।"

শৈলজা হাসিমুখে বলিল, "তুমি ওকে চেন না ভাই। এমন পেয়ে বসবে তখন যাবার সময়ে কাঁধ থেকে নামাতে পারবে না।"

কমলা বলিল, "বেশ তো, না নামে বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই আদরের উক্তির মধ্যে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া বিশু আবার পদসঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং উক্ত প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তুলিয়া অবশেষে ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল।

তখন শৈলজা ঔৎসুক্য ভরে কমলার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। নানা কথাবার্তার পর অবশেষে ছবি আঁকার কথা উঠিল। শৈলজা বলিল, "তোমার ছবি আঁকার বিষয়ে বিনয়ঠাকুরপোর আগ্রহের শেষ নেই। কাল এঁদের কাছে দুঃখ করছিলেন যে, তোমার মুখ আঁকবার মতো ভাল রঙেই ঠিক করতে পারছেন না। এত বড় আঁকিয়ে, রঙের খেলা উনি সবই জানেন; সে সবই কথা কিছু নয়। আসলে তোমার ছবি কি ক'রে ভাল হবে সে বিষয়ে ভাবনার অন্ত নেই।"

শোভা বলিল, "আমার মুখ আঁকবার সময়ে সে-সব বালাই কিছুই

নেই। রঙ পছন্দ না হ'লে আইভরি ব্ল্যাকের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিলেই আর কোনো গোল থাকে না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

শৈলজা তাহার এই সরলহৃদয় ননদটিকে চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে ভালবাসিত। কমলার সম্মুখে শোভার এই আত্ম-নিন্দা সে সহ্য করিতে পারিল না; ঈষৎ ঝঙ্কারের সহিত বলিল, "তা মনে ক'রো না। বরং কমলার রঙ ফলানো সহজ, তোমার রঙ ফলানো মোটেই সহজ নয়। তুমি তো কালো নও।"

শৈলজার কথায় শোভার হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, "সাদাও নই, কালোও নই, তবে আমি কি বউদি?—নীল?"

কমলা বলিল, "বোধ হয়। নীলপদ্মের কথা শুনেছি, চোখে কখনও দেখি নি; কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় শোভা, নীলপদ্ম বোধ হয় তোমারই মতো কিছু হবে।"

কমলার এই কথায় শৈলজা মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইল। তুলনায় শোভার বর্ণ খর্ব হইতেছিল বলিয়া তাহার চিত্তে কমলার প্রতি অলক্ষিতে সামান্য একটু যে বিদ্বেষ আসিয়াছিল তাহা নিমেষে অপসৃত হইয়া গেল। প্রসন্নমুখে সে বলিল, "ঠিক বলেছ। তোমাদের দুজনকে দেখলে মনে হয় একটি লালপদ্ম আর একটি নীলপদ্ম।"

পদ্ম দুটির পক্ষ হইতে এ বিষয়ে হয়তো কিছু প্রতিবাদ হইত, কিন্তু তাহার অবসর হইল না। গিরিবালা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বউমা, ঠাকুর ব'লে গেল—খাবার তৈরি হয়েছে, তুমি গিয়ে দ্বিজনাথবাবুর ঠাঁই কর।"

তখন শৈলজা গৃহিণীর আদেশ পালন করিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রত্যুষে চা-পানের সময়ে কমলার মুখমণ্ডলে একটা বিরসতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজনাথ উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, অসুখ করেছে না-কি ?"

মৃদুভাবে মাথা নাড়িয়া কমলা বলিল, "না।"

"তবে মুখ অমন শুকনো কেন ?"

"কই, শুকনো না তো ?"

"সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি পাচ্ছি।"

এবার কমলার মুখে হাসি দেখা দিল ; বলিল, "না বাবা, অসুখ কিছু করে নি,—ভাল আছি।"

দ্বিজনাথ মুখে আর কিছু বলিলেন না, মনে মনে মাথা নাড়িলেন ; মুখের কষ্টি-পাথরে হাসির পরীক্ষা হইয়া গেল ; হাসি দিয়া কমলা যে জিনিস চাপিতে চেষ্টা করিল, হাসির পৃষ্ঠপটেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বিজনাথ স্থির করিলেন, অসুখ বটে,—তবে দেহের নয়, মনের। কিন্তু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক ও ঔষধ সু-প্রাপ্য নহে বলিয়া অতঃপর এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনা ফলপ্রদ হইবে না বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতার নিঃশেষিত পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে কমলা বলিল, "বাবা, তোমার কিন্তু দু পেয়ালা ক'রে চা খাওয়া উচিত হচ্ছে না।"

"কেন ? ডাক্তাররা মানা করেছে ব'লে ?"

"হ্যাঁ।"

পূর্ণীভূত পেয়ালাটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া দ্বিজনাথ উপেক্ষার

স্বরে বলিলেন, "হ্যাঃ, ডাক্তাররা তো সবই বোঝে! চিরটা কাল দু পেয়ালা ক'রে চা খেয়ে খেয়ে স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, এখন সেটাকে উল্টে দিয়ে প্রাণে মারতে চায়!"

"না বাবা, তাঁরা যখন মানা করেছেন তখন একটু কম ক'রে খাওয়াই উচিত"

এক চুমুক চা খাইয়া পেয়ালা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তাঁরা তো এমন অনেক জিনিসই কম ক'রে খেতে বলেছেন; কিন্তু দিনে ভাত আর রাত্রে লুচি খাবার সময় তোমাদের সে কথা মনে থাকে না কেন? ডাক্তারের উপদেশ কি শুধু চা'র বেলাই খাটাতে হবে?"

কমলা বলিল, "ভাত আর লুচি তুমি যত কম খাও এত কম খেতে তাঁরা বলেন নি। কম খেয়ে খেয়ে তোমার শরীর রোগা হ'য়ে যাচ্ছে।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "রোগা হওয়াই তো ভাল। যত রোগা হব তত ব্লড্ প্রেসার কমবে। একটা যে কথা আছে না, খেয়ে যত লোক মরে তার চেয়ে খেয়ে অনেক বেশী মরে, সেটা আমাদের বাংলা দেশের পক্ষে যেমন খাটে এমন আর কোনো দেশের পক্ষে নয়। আমরা কত জিনিস খাই তা জান? আমরা গাল খাই, চড় খাই, কিল খাই, চাপড় খাই, ভূত দেখে ভয় খাই, ধার দিয়ে সুদ খাই, খাবার আটকে বিষম খাই, চৌকাঠ আটকে হোঁচট খাই, দোলায় উঠে দোল খাই, নদীতে নেমে ঢেউ খাই, মনিবের কাছে তাড়া খাই, শালীর কাছে কানমলা খাই, বিদেশে গিয়ে হাওয়া খাই। এই রকম হরেক রকম জিনিস খেতে খেতে অবশেষে মরবার সময়ে খাবি খাই।"

বাঙালীর আহার্যের এই সুদীর্ঘ কৌতুকপ্রদ তালিকা শুনিয়া কমলা

পুলকিত হইয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "সত্যি বাবা, এত জিনিস যে নিঃশব্দে আমরা খাই এতদিন তা খেয়াল হয় নি।"

গম্ভীর মুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা হ'লে আমাদের ডাল ভাত একটু কম ক'রে খাওয়া উচিত কি-না?"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে উচিত বইকি।"

জশিডি হইতে মাইল তিনেক দূরে রোহিণী গ্রামে আজ হাটবার; অতি প্রত্যূষ হইতে ক্রেতার স্রোত রোহিণীর দিকে চলিয়াছে। এখন ইহাদের বস্ত্রমধ্যে তহবিল, মুখে উৎসাহ, পদক্ষেপে লঘুগতি; কিছুকাল পরে ইহারাই বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া অলস মন্থর গতিতে গৃহাভিমুখে ফিরিবে। দূরে পাহাড়তলীর পাকদণ্ডী পথ দিয়াও বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে লোক ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হাটের দিকে চলিয়াছে। চতুর্দিকে একটা গতির চিত্র জাগিয়া উঠিয়াছে।

কমলা বলিল, "বাবা, একদিন রোহিণীর হাট দেখতে গেলে হয়।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বেশ তো, এর পরের হাটবারেই গেলে হবে। জীবন এলে জিজ্ঞাসা ক'রো, এর পর হাটবার কবে?"

জীবন গৃহাধিপতির বেতনভুক গৃহরক্ষক।

সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হইলে তাহার পর চিকিৎসক যেমন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে, কন্যার মুখমণ্ডল হইতে মালিন্য অপসৃত হইয়াছে দেখিয়া দ্বিজনাথ তেমনি কমলার ব্যাধি নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

"এর মধ্যে সন্তোষের কোনো চিঠি-পত্র পেয়েছ কমলা?"

কমলার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

'এর মধ্যে' যে কিসের মধ্যে—সে বিষয়ে প্রশ্ন যেমন অনির্ণীত, উত্তরও

তেমনি অনভিব্যক্ত। এ প্রশ্ন যে উপক্রান্ত প্রশ্ন—মূল প্রশ্ন নহে, তাহা প্রশ্নকারক এবং উত্তরকারিকা উভয়েরই জানা ছিল।

"সে কবে এখানে আসবে—সে বিষয়ে শেষ চিঠিতে তোমাকে কিছু লিখেছিল ?"

নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া কমলা জানাইল, লিখে নাই।

রোগের মূল কতকটা ধরিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "অনেক দিন সে আসে নি, একবার আসতে লিখে দিলে হয়।"

এবার কমলার দিক হইতে, কথা তো দূরের কথা, কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া গেল না; সে নিঃশব্দে পথের লোক-চলাচলের দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজই না হয় তাকে একখানা চিঠি লিখে দেব।"

ইহাতেও কমলা কোনো কথা কহিল না, তেমনি নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

যে-কথা মনে-মনে সন্দেহ করিতেছিলেন সে বিষয়ে কোনো প্রকারে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া দ্বিজনাথ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটু ঝোঁক দিয়া তিনি বলিলেন, "তুমিই না হয় একটা চিঠি লিখে দাও না কমল।"

এবার কমলা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আমি লিখব না বাবা, লিখতে হয় তুমিই লেখো। কিন্তু—" কথা অসমাপ্ত রাখিয়া কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অধীরভাবে দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি ?"

মুখ না ফিরাইয়া কমলা বলিল, "আসতে লেখবার দরকার কি বাবা ?

সময় পেলে তিনি নিজেই তো আসবেন। কোর্ট বন্ধ হবার সময় হ'য়ে আসছে—এখন হয়তো তিনি কাজে কর্মে ব্যস্ত আছেন।"

একটু চিন্তা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা বটে। আচ্ছা, তা হ'লে না হয় থাক্।"

টেবিলের একদিকে একটা দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িয়া ছিল, সেটা টানিয়া লইয়া দ্বিজনাথ পকেট হাতড়াইয়া দেখিলেন, চশমা নাই।

"কমল, আমার চশমাটা এনে দাও তো মা। আমার ঘরের ভিতর টেবিলের ওপর আছে।"

ক্ষিপ্রপদে কমলা প্রস্থান করিল, তাহার পর চশমা আনিয়া পিতাকে দিয়া জীবনের নিকট উপস্থিত হইল। জীবন তখন নিজ গৃহ হইতে দুধ দুহিয়া আনিয়া পদ্মমুখীর জিম্মা লাগাইয়া নানা প্রকার ছকে-কাটা ভূমিতে সীজন ফ্লাওয়ার লাগাইবার জন্য জমি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

পিছন দিক হইতে কমলা আসিয়া ডাকিল, "জীবন!"

খুরপি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জীবন বলিল, "দিদিমনি!"

"এত লোক কোথায় যাচ্ছে?—হাটে?"

"হ্যাঁ দিদিমণি।"

"এত সকালে কেন? অন্যদিন তো এত সকাল-সকাল যায় না।"

"আজ সকালে হাট দিদিমণি। আগের হাটে জমিদারের ইস্তিহার জারি হয়েছিল।"

"হাটের কাছ পর্যন্ত আমাদের মোটর যেতে পারবে?"

"একেবারে হাট পর্যন্ত যাবে। যাবেন না-কি দিদিমণি?"

"দেখি, যেতেও পারি।"

দ্বিজনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া কমলা বলিল, "বাবা, আজই তো

রোহিণী গেলে হয়? জীবন বলছিল, মোটার একেবারে হাট পর্যন্ত যাবে।"

সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া কমলার দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ দেখিলেন, যে-আকাশ নির্মল হইয়া আসিয়াছিল তাহাতে পুনরায় মেঘের সঞ্চার হইয়াছে; বলিলেন, "তা বেশ তো, চল না।" তাহার পর সহসা ছবি আঁকার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, "কিন্তু বিনয় যে একটু পরে আসবে কমল?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কমল বলিল, "একদিন না হয় ছবি আঁকা না-ই হ'ল। একটা চিঠি লিখে রেখে গেলেই হবে।"

কমলার এ ব্যবস্থা দ্বিজনাথের মনঃপূত হইল না; ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "না, না, সে ঠিক হবে না। বিনয় কোনো দিন দেরি ক'রে আসে না—আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে। তারপর তাকে সুদ্ধ ধ'রে নিয়ে গেলেই হবে।"

সবিস্ময়ে কমলা বলিল, "বিনয়বাবুকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে? সে কি ক'রে হবে বাবা? না,—সে ভাল হবে না।"

কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ সকৌতূহলে বলিলেন, "কেন কমল, তাতে দোষ কি? এখন তো বিনয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেছে, এখন আর আপত্তির কারণ কি আছে?"

কমলা কোনো কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মৌনের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, তাহার ইচ্ছা নহে—বিনয় তাহাদের সঙ্গে যায়।

সদানন্দ দ্বিজনাথের প্রশস্ত ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল - ক্ষণকাল মনে-মনে কত-কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "কেন মা?—বিনয়ের আচরণে কখনো কিছু পেয়েছ কি?"

দ্বিজনাথের কথায় কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "না বাবা, কখনো না। আমি বলছি অন্য কথা—আমি বলছি সুবিধে অসুবিধের কথা।"

দ্বিজনাথের মুখ আবার প্রসন্ন হইল; উৎসাহভরে তিনি বলিলেন, "কোনো অসুবিধে হবে না মা, বরং সুবিধেই হবে। বিনয়ের মতো একজন উঁচুদরের শিল্পীর সঙ্গ অবহেলার জিনিস নয়।"

পিতার আগ্রহাতিশয্যে কমলা পুলকিত হইয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বেশ তো বাবা, তুমি যদি খুশি হও তো তাই হবে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, রোহিণী একদিন না-হয় বিকেলবেলা গেলেই হবে—আজ ছবি আঁকাই চলুক।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আচ্ছা বিনয় আসুক, তার পর যা হয় স্থির করলেই হবে।"

৯

বিনয় যখন আসিল, তখন দ্বিজনাথ কমলাকে লইয়া উদ্যানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

বারান্দায় আসিয়া তিনজনে উপবেশন করিলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয় বিনয়বাবু, তা হ'লে আজ আমাদের একটা প্রস্তাব আছে।"

উৎসুক হইয়া বিনয় বলিল, "কি প্রস্তাব বলুন ?"

রোহিণী বেড়াইতে যাইবার কথা বলিয়া দ্বিজনাথ বিনয়কে তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন ; পরিশেষে পুনরায় বলিলেন, "অবশ্য যদি-না আপনার কোনো রকম অসুবিধে হয়।"

বিনয় বলিল, "আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না, ছবি-আঁকা কালকেই হবে। কিন্তু আমি ফিরে যাই মিস্টার মিটর—সেজন্য আপনারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না।"

হাসিতে হাসিতে দ্বিজনাথ বলিলেন, "কি বিপদ! কুণ্ঠিত না হই, দুঃখিতও তো হ'তে পারি। তা ছাড়া আপনিই বা কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন ?"

কথাটার একটা কোনো মীমাংসা হইবার পূর্বে একটি ভদ্রলোক গেটে প্রবেশ করিলেন, এবং দূর হইতেই দ্বিজনাথকে দেখিয়া 'হ্যালো মিস্টার মিটার' বলিয়া হাঁক দিলেন।

"তাই তো! মৃগেন দত্ত হঠাৎ কোথা থেকে!" বলিয়া দ্বিজনাথ উঠিয়া পড়িলেন এবং পিছন ফিরিয়া কমলা ও বিনয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা এইখানেই ব'স, আমি মৃগেনকে নিয়ে পশ্চিমের বারান্দায় বসছি। রোহিণী আজ আর হয় ব'লে মনে হচ্ছে না। আজ দেখছি, মৃগশিরার পালা।"

মৃগেন দত্ত কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী পাটের ব্যবসায়ী। দ্বিজনাথের বহুকালের বাঁধা মক্কেল।

দ্বিজনাথ প্রস্থান করিলে কমলা বলিল, "আজ আপনার সকালবেলাটা নষ্ট হ'ল বিনয়বাবু।"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "কেন, বলুন তো?"

"সময় নষ্ট হ'ল ব'লে। আজ সকালের কাজটা আপনার বাদ পড়ল।"

বিনয় একটু হাসিয়া বলিল, "বাদ পড়ল কই? কাল সকালে তো হবে।"

কমলা বলিল, "কিন্তু আজ সকালের সময়টা আপনার নষ্ট হ'ল তো?"

বিনয় বলিল, "নষ্ট হ'ল এই অর্থে কি আপনি বলছেন যে, এই সময়টা আমার হাতে থাকলে ভবিষ্যতে সেই সময়টা কাজে লাগিয়ে কিছু অর্থোপার্জন হ'তে পারত?"

কমলার প্রশ্নকে বিনয় ভাঙিয়া চুরিয়া এমন প্রকট মূর্তিতে গঠিত করিয়া বলিল—সময় এবং অর্থকে এমন সুস্পষ্টভাবে সে একার্থবোধক করিয়া তুলিল যে, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে উত্তরের মধ্যে কিছু রূঢ়তা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে বুঝিতে পারিয়া কমলা বিপন্ন বোধ করিল। কিন্তু উত্তর না দিয়াও অব্যাহতি ছিল না, তাই সে সলজ্জমুখে দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন বিনয়বাবু, আমি সেই অর্থেই বলছি। আপনাদের মতো বড় আর্টিস্টদের পরিশ্রম করলেই তো অর্থ।"

কমলার কথা শুনিয়া বিনয়ের প্রসন্ন মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। মনের কোনো একটা গুপ্ত স্থলে কেমন করিয়া আঘাত পাইয়া সে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমি যদি বড় আর্টিস্ট্ হই তা হ'লে জানবেন আমার মধ্যে ব্যবসাদারের চেয়ে শিল্পীই বড় হ'য়ে আছে। বড় আর্টিস্টরা টাকাই যদি শুধু চাইত তা হ'লে টাকাই তারা কম পেত।

এই যে আমি আপনার ছবি আঁকছি—এর একটা পারিশ্রমিক আপনার বাবা দিতে রাজী হয়েছেন আর আমি নিতে রাজী হয়েছি—যার এক পয়সা কম নিতে আমি রাজী হব না, বেশী দিলেও নোব না। আপনার বাবার সঙ্গে আমার ফুরোন হয়েছে, কিন্তু আমার মনের সঙ্গে আমার তো' ফুরোন হয় নি! সেখানে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন,—এমন কি, ছবি আঁকা যেদিন শেষ হবে সেদিন ছবি যদি আমার পছন্দমতো না হয় তা হ'লে বিল আর লেখা হব না, ছবিটাকেই ছিঁড়ে দিয়ে চ'লে যাব। এই যে আজ আপনার ছবি আঁকা হ'ল না—এই যে এসে দেখলাম আজ আপনি ছবি আঁকার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হ'তে পারেন নি, মনটা বিষয়ান্তরে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে,—তার জন্যে এই যে ছবি আঁকা আজ বন্ধ রইল—সেই আজ সকালের সময়টাকে—আপনি যেটা বলছেন নষ্ট হ'ল, আমি নষ্ট হ'ল ব'লে মনে করি নে। আমার মনের হিসেবে আমি আজ সকালের এই সময়টাকে ছবি আঁকার বাবদেই ফেলছি, তা আপনি যাই বলুন না কেন!"

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল ; ইউক্যালিপ্‌টস্ তরু-শ্রেণীর শাখা-প্রশাখায় মৃদুমন্দ হিল্লোল এবং অনুচ্চ মর্মরধ্বনি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল ; মনে হইতেছিল কোথায় যেন একটা আঘাত বাজিয়াছে—কোথায় যেন অনুভূতির সাড়া পড়িয়াছে।

বিনয়ের সুদীর্ঘ প্রতিবাদ শুনিয়া কমলা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, মুখে তো কথাই ছিল না—চোখের কোণে যে একবিন্দু অশ্রু আসিয়া জুটিয়াছিল তাহার একটা যা-হয়-কোনো ব্যবস্থা করিবার মতো বাহুতেও যেন শক্তি ছিল না।

বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, আমার কথায় যদি রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে থাকে, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

কম্পিত কণ্ঠে কমলা বলিল, “আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন বিনয়বাবু, আমি ঠিক ক’রে কথাটা বলতে পারি নি ব’লে আপনার মনে আঘাত দিয়েছি। অর্থের জন্যে আপনি আমার ছবি আঁকছেন—সেইটেই আমার দুঃখ। শোভার মতো বিনা পণে আপনি যদি আমারও ছবি আঁকতেন—”

কমলা চমকিয়া চুপ করিল। অন্যমনস্কতার বশবর্তী হইয়া এ সে কেমন করিয়া কি বলিয়া ফেলিতেছিল!

এদিকে আঘাতের পর আঘাতে বিনয়ের মনেও বেহিসাবের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বলিল, “কমলা! সত্যি কি তা হ’লে তুমি সুখী হ’তে?”

অকস্মাৎ-সঞ্জাত অসংযমের পালার এইখানেই যবনিকা হইল। দেখা গেল, অদূরে প্রসন্নমুখে দ্বিজনাথ আসিতেছেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া হাসিমুখে বলিলেন, ‘মৃগশিরার পালা আজ সংক্ষেপে সারা গেল। অতএব রোহিণী যাত্রাই স্থির।”

অপ্রত্যাশিত বিপাক যে কেবল মাত্র বহির্জগতে পথে ঘাটে, কলে কারখানায়, রেলে জাহাজেই ঘটে তাহা নহে; বাহির্জগতের মতো মানুষের মনোজগতেও তাহার একই মাত্রায় স্থান আছে। অপরিমিত সতর্কতা সত্ত্বেও সামান্য একটা পয়েন্টের গোলযোগে যেমন এঞ্জিনে এঞ্জিনে অকস্মাৎ প্রচণ্ড সংঘাত ঘটে, ঠিক তেমনি সামান্য কোনো কারণে দুইটি মনের মধ্যে হঠাৎ একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যাহার বিন্দুমাত্র অভিসূচনা পূর্বাহ্ণে দৃষ্টিগোচর ছিল না। বহির্জগতের বিপাক মানুষের সাধারণ বিচার বুদ্ধি বিবেচনা আত্মরক্ষাপরায়ণতার অনায়ত্ত মনে হয় বলিয়া মানুষ ইহার নাম দৈবদুর্বিপাক রাখিয়া একটা সান্ত্বনার ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু মনোজগতের ব্যাপারে দেবতার প্রভাব আরোপিত করিবার সুযোগ না পাইয়া সমস্ত দুঃখটা সে নিজের অবিবেচনার ফল বলিয়া ভোগ করে।

তাই মোটরকারে কমলার পাশে বসিয়া রোহিণী যাইতে যাইতে বিনয়ের মন পরিতাপের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। আঁকিবার তুলি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের প্রতিদিবসের সকল খুঁটিনাটির মধ্যে যে সংযমের ঐকান্তিক সাধনা সে করিয়াছে, কিছু পূর্বে কমলার সহিত কথোপকথন কালে কেমন করিয়া অকস্মাৎ অত সহজে সে-সংযম সে হারাইয়া বসিল তাহা ভাবিয়া তাহার মনে বিস্ময় এবং বিরক্তি—দুই-ই উত্তরোত্তর একই মাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছিল। চিত্তের নিভৃততম প্রদেশে চিন্তারও পরপারে যাহা অস্পষ্ট ছিল, এমন কি কারণ অবলম্বন করিয়া তাহা সহসা শব্দের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিল তাহা সে

ভাবিয়া পাইল না। এই যে মোটরকারখানা অপ্রশস্ত পার্বত্য পথ অবলম্বন করিয়া নির্বিঘ্নে দুরন্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহা যেমন অপরিজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ যে-কোনো মুহূর্তে পদচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে, জীবন-পথেও মানুষের পক্ষে তেমন বিপদ অসম্ভব নয়—এ কথা বিনয়ের একবারও মনে হইতেছিল না।

"এ দিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনার কেমন লাগে বিনয়বাবু?"

চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া চমকিয়া বিনয় বলিল, "বেশ ভালই লাগে মিস্টার মিটার।"

"আমার তো ভারি ভাল লাগে।"

গাড়ির আসনে মাঝখানে বসিয়া ছিলেন দ্বিজনাথ, এবং তাঁহার ডান পাশে কমলা ও বাঁ পাশে বিনয় বসিয়া ছিল। শেষরাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ সুনির্মল ঘন নীল, বায়ু সুশীতল, রৌদ্র-কিরণের মধ্যে অব্যাহত প্রসন্নতা পল্-কাটা হীরার ভিতর বিচ্ছুরিত জ্যোতির মতো ঝিলমিল করিতেছে; বাহিরের এই উদ্দীপনার প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া দ্বিজনাথ উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, ক্ষণকাল পূর্বে কমলার সহিত কথোপকথনকালে যে নিরুৎসাহে হৃদয় একটু দমিয়া গিয়াছিল তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া দৃঢ়নিবদ্ধ আশ্বাসে চিত্ত ঈষৎ আলগা হইয়া পড়িয়াছিল। মোটরের ক্রমবৃদ্ধিশীল গতির সহিত মনটাও এমন বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল বাসনার পথেও ঠিক এমনি নির্বিঘ্নে দ্রুতবেগে ছুটিয়া যাওয়া চলে।

দুই-একবার মনের মধ্যে ইতস্তত করিয়া, একবার কমলার মুখের ভাবটা বক্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা দেখিয়া, দ্বিজনাথ বলিলেন,

"তোমাকে একটা কথা বলব মনে করছি বিনয়। কিন্তু সে কথা বলবার আগে আর একটা কথা বলবার আছে।"

আগ্রহভরে বিনয় বলিল, "কি কথা বলুন?"

অপর পার্শ্বে বসিয়া কমলা তাহার পিতার এককালে এক জোড়া কথা বলিবার প্রস্তাব শুনিয়া শুধু উৎসুক নয়, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ব্যারিস্টারী পেশার সওয়াল-জবাব-জেরা-জুলুমের কঠোরতার মধ্যেও পিতার প্রকৃতিগত ভাবপ্রবণতা লুপ্ত হয় নাই, এমন কি স্নায়বিক-দৌর্বল্যে আক্রান্ত হইবার পর হইতে তাহা পূর্বাপেক্ষা বরং বাড়িয়াছে, ইহা কমলা ভালরূপেই জানিত। সুতরাং চলন্ত মোটরকারে বসিয়া যে দুইটি কথা বলিবার জন্য উপক্রমণিকারও আবশ্যক হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত সাধারণ ধরনের হইবে না তাহা আশঙ্কা করিয়া কমলার মনে অস্বস্তির পরিসীমা রহিল না।

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমার প্রথম কথা, হঠাৎ তোমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করলাম ব'লে কিছু মনে কর নি তো?"

প্রশান্তস্বরে বিনয় বলিল, "করেছি বইকি। মনে করেছি, এ কয়েকদিন আপনার দিক থেকে যে স্নেহের ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম, আজ তার প্রমাণ পেয়ে ধন্য হলাম।"

"তাই যদি মনে ক'রে থাক তা হ'লে অবশ্য এ বিষয়ে আমার আর-কিছু বলবার নেই। আমার দ্বিতীয় কথা, যে স্নেহের ইঙ্গিত তুমি পেয়েছ বলছ, সে স্নেহের পরিমাণও বড় অল্প নয়। সেই স্নেহের দিক থেকে—" একবার একটু কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া, একবার অপাঙ্গে কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "সেই স্নেহের দিক থেকে তোমার প্রতি আমার একটা অনুরোধ আছে।"

আরক্তমুখে কমলা পথের দিকে মুখ ফিরাইয়া উৎকর্ণ হইল।

বিনয় বলিল, "আদেশ করুন।"

কিন্তু আদেশ অথবা অনুরোধ করিবার অবসর পাওয়া গেল না; অকস্মাৎ মানুষের হৃদয়ের ভিতরকার যন্ত্র বন্ধ হইয়া মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া যায়, সহসা তেমনি একটা কোনো বিপত্তি ঘটিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া মোটরকারখানা ধীরে ধীরে থামিয়া গেল।

উপর হইতে যখন কোনো উপায় হইল না, তখন শোফার রাস্তায় নামিয়া পড়িল, বনেট খুলিয়া কল-কব্জা পরীক্ষা করিল; অনেক ঠোকাঠুকি, অনেক মাজা-ঘষা, অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিল; কিন্তু কোনো ফল হইল না,—পুনর্জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। পথিকের দল চতুর্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহাদের কৌতুক এবং কৌতূহলের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু গাড়িখানাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্য যখন পাঁচ-ছয় জন লোকের সন্ধান করা হইল, তখন তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গন্তব্য-পথে পা চালাইয়া দিল—কৌতুক দেখিবার সময়টুকু ছাড়া তাহাদের অবসরের অভাব।

এমনিভাবে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল।

রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিতেছিল; গতিশীল মোটরকারে হাওয়া যত শীতল মনে হইতেছিল এখন আর তত মনে হইতেছে না; রোহিণী যাইবার উপায়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, অথচ গৃহ দুই মাইলেরও কিছু বেশী দূর হইবে। সমস্যা কঠিন বলিয়া মনে হইল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বাড়ি গিয়ে পাঁজিতে দেখতে হবে, মৃগশিরা নক্ষত্র যাত্রার পক্ষে অশুভ কি-না! কিন্তু বাড়ি এখন যাওয়া যায় কেমন ক'রে?"

উৎসাহের সহিত বিনয় বলিল, "আপনারা গাছতলায় ছায়ায় একটু অপেক্ষা করুন, আমি জশিডি গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসছি।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে কার্য তুমিই বা করবে কেন? অপেক্ষা আমরা তিনজনেই করতে পারি, মহবুব গিয়ে গাড়ি আনতে পারে। কিন্তু ট্রেনের সময় ভিন্ন জশিডিতে সব সময়ে গাড়ি পাওয়া যায় না।"

কমলা বলিল, "দু মাইল পথ আমরা তো অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি, কিন্তু তুমি তো তা পারবে না বাবা। কয়েকদিন থেকে আবার তোমার ডান পায়ে বাতের ব্যথাটা বেড়েছে।"

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "না, ও-কাজটি আমার দ্বারা নিশ্চয়ই হবে না। কার-খানি যেমন অচল হয়েছে, তোমার বাবাটিও ঠিক তেমনি অচল। বেগতিক দেখলে গাড়ির মধ্যেই আশ্রয় নোব, সে যখন সচল হবে আমিও চলতে আরম্ভ করব।"

জল্পনা-কল্পনা এইরূপ অনিশ্চিতভাবে চলিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল অদূরে শোফার মহবুব একটা খাটুলি ধরিয়া তাহার আরোহীকে প্রায় বলপূর্বক হাত ধরিয়া নামাইতেছে। আরোহীর বয়স বছর ত্রিশ, পরিধানে উজ্জ্বল লাল বর্ণের চেলীর ধুতি, সাদা চকচকে সাটিনের আচকান, পায়ে জরির-কাজ-করা নাগরা জুতা, গলা ঘিরিয়া কাছির মত পাক দেওয়া চাদর এবং মাথায় সাদা রঙের মৈথিলী পাগড়ি। রাস্তায় নামিয়া আরোহী যথেষ্ট আপত্তি এবং অসন্তোষ দেখাইতে লাগিল, কিন্তু মহবুব যখন তাহার গ্রীবাবেষ্টন করিয়া ধরিয়া কানে-কানে কি বলিল, তখন মুহূর্তের মধ্যে তাহার মূর্তি পরিবর্তিত হইল। ব্যস্তভাবে দ্বিজনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া সে জানাইল যে, তাহার খাটুলি হুজুরের সেবায় অর্পিত করিতে পারিলে সে ধন্য হইবে, পাঁচ মাইল দূরবর্তী ননকুরিয়া গ্রামে তাহার নিবাস, তাহার নাম বিভীখন ঝা, পিতার নাম বৃষভুখন ঝা, পেশা জমিদারী এবং গৃহস্থী। মাস দুই হইল তিন মাইল দূরবর্তী মাঝিয়া গ্রামের হর্ষনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যাকে

সে বিবাহ করিয়াছে, আজ শ্বশুরালয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ, তাই তথায় চলিয়াছে—যথাসময়ে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেজন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই, হুজুরের সওয়ারী যখন বিগড়িয়াছে তখন হুজুরকে গৃহে পৌঁছাইয়া তবে অন্য কথা।

কমলা বলিল, "বাবা, তুমি খাটুলিতে ওঠো। আমরা তোমার পাশে পাশে হেঁটে যাব।"

"এই এতখানি পথ?"

"অনায়াসে।"

বিনয়ের দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "কি বল বিনয়?"

বিনয় বলিল, "স্বচ্ছন্দে।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে 'আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ'। আমি যখন আতুর এবং বৃদ্ধ—দুই-ই তখন ভদ্রতার নিয়ম লঙ্ঘন করলে অন্তত শাস্ত্রমতে আমার দোষ হবে না।" তাহার পর বিভীষণ ঝাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই শুনিতে পাইলেন, দ্বিজনাথ আউয়ল্ হাকিম না দোয়েম্ হাকিম জানিবার জন্য অদূরে বিভীষণ মহবুবকে পীড়াপীড়ি করিতেছে; বিপন্ন মহবুব অবান্তর কথা দিয়া বিভীষণের পক্ষে সেই অতিপ্রয়োজনীয় কথাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিভীষণের হিতৈষণার আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ দ্বিজনাথ এখন বুঝিলেন; একবার মনে হইল, এ জনের কারবারে বৃথা ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কি হইবে,—তথাপি সামান্য মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া খাটুলিতে উঠিয়া বসিলেন।

খাটুলি উঠিলে বিভীষণ ঝা নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মনে করাইয়া দিল যে, তাহার নাম বিভীষণ ঝা, ওলদ্ ভুবনভূষণ ঝা, সাকিন মৌজে ননকুরিয়া।

দ্বিজনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মনে থাকবে।"

কিছুদূর তিনজনে একত্রে যাওয়ার পর দেখা গেল, খাটুলির সহিত দ্রুতবেগে চলিতে বিনয় এবং কমলার যেমন কষ্ট হইতেছে, বিনয় এবং কমলার সহিত মন্থরগতিতে চলিতে খাটুলি-বাহকদেরও তেমনি অসুবিধা হইতেছে। ভার লইয়া ছুটিয়া চলা যাহাদের অভ্যাস, নিষেধ সত্ত্বেও প্রায়ই তাহারা আগাইয়া যাইতে লাগিল; তাহার ফলে, হয় তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য গতিরোধ করিতে হয়, নয় কমলা এবং বিনয়কে অতি দ্রুতগতিতে চলিয়া তাহাদের সহিত একত্র হইতে হয়। বুঝা গেল, উভয় পক্ষের গতির এই অসমতা এই দীর্ঘ দুই মাইল পথ উভয় পক্ষকে শুধু পীড়ন করিবে; এক পক্ষের সময় এবং অপর পক্ষের সুবিধা নষ্ট হইবে।

খাটুলি থামাইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "অনর্থক এ বিড়ম্বনায় কোনো লাভ নেই। তোমাদের হেঁটেও চলতে হবে, আবার যে খাটুলির উপর চলেছে তার সঙ্গে সমান গতি রাখতে হবে—এ দোতরফা অবিচারের পাপ থেকে আমাকে পরিত্রাণ দাও। আমি এগিয়ে চলি তোমরা সুবিধামতো ধীরে ধীরে পিছনে এস।"

অবস্থা হিসাবে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে এমন প্রবল যুক্তি ছিল যে, ইহার বিরুদ্ধে বলিবার মতো কোনো কথাই কমলা অথবা বিনয় খুঁজিয়া পাইল না। অথচ এই দীর্ঘ দুই মাইল পথ পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে একটা সুতীব্র উদ্দীপনা অবরুদ্ধ রাখিয়া পাশাপাশি বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতে হইবে তাহার উদ্বেগও কম নয়। কিন্তু সে কথা বলিয়া তো আপত্তি করা চলে না। এমন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি থাকিবে না যাহাকে অবলম্বন করিয়া সহজ হওয়া যাইতে পারিবে;—মহবুব থাকিলেও চলিত, কিন্তু সে রহিল গাড়ি আগলাইয়া। যে দীর্ঘকাল উভয়কে একসঙ্গে কাটাইতে হইবে সে সময় উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হওয়া কঠিন, চুপ করিয়া থাকা কঠিনতর;

অথচ উপায় নাই। অগত্যা বিনয় এবং কমলা উভয়েই দ্বিজনাথের প্রস্তাব মৌনের দ্বারা অনুমোদিত করিল। দ্বিজনাথের ইঙ্গিতে বাহকেরা খাটুলি লইয়া দৌড় দিল। দেখিতে দেখিতে খাটুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

পাশাপাশি চলিতে চলিতে বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনার কষ্ট হ'লেই বলবেন, সামান্য জিরিয়ে নেওয়া যাবে।"

কমলা কোনো কথা বলিল না, শুধু তাহার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল।

১১

সহজ কথোপকথনের পক্ষে যেখানে কোনো কারণে কোনো বাধা থাকে সেখানে কথা কওয়ার অপেক্ষা কথা না কওয়াই বোধ হয় বেশি সঙ্কোচজনক হইয়া উঠে। কথাবার্তার মধ্যে যে জিনিসটাকে চাপা দেওয়া কঠিন, নীরবতার মধ্যে তাহাকে অননুভবনীয় করিয়া রাখা কঠিনতর। মনের উপর সে যদি একবার চাপিয়া বসিল তো বসিয়াই রহিল। বিশেষত যে-সকল জিনিস কতকটা অনির্বচনীয়, অর্থাৎ বচনের তেমন অপেক্ষা যাহারা রাখে না,—তাহাদের তো কথাই নাই।—বচনের কঠিন ভূমিই তাহাদের পক্ষে বাধা,—জলের মধ্যে মাছের মতো নিঃশব্দতার মধ্যে তাহারা অবলীলার সহিত সাঁতার দিয়া বেড়ায়। তাই, ধীরে ধীরে অতিক্রম করিবার ফলে ক্রমশ কমিয়া আসিলেও, দীর্ঘ পথ এই নীরবতার উৎপীড়নে যেন দীর্ঘতরই হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বিনয় ও কমলার মনে হইতেছিল।

অলস মন্থরগতিতে পাশাপাশি থাকিয়া তাহারা নিঃশব্দে চলিয়াছে। শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুতে উভয়ের ললাট ঈষৎ সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যত্নাবরুদ্ধ নিশ্বাসের শব্দ ক্রমশ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, এবং কঙ্কর-নির্মিত পথে উভয়ের জুতার মচমচ শব্দ বার বার এক ছন্দে মিলিত হইতেছে। বাহিরের অবস্থা এই। ভিতরে উভয়ের মনের মধ্যে যে জিনিস ক্রমশ বর্ধিত হইতেছিল তাহার প্রবলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

"মিস্ মিত্র!"

সুনিরুদ্ধ মৌন ভেদ করিয়া সহসা-নিঃসৃত এই কণ্ঠস্বরে শুধু কমলাই নহে, বিনয়ও চমকিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনো কথা কহিয়া উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখিল না, পথ চলিতে চলিতেই শুধু দেহটা ঋজু করিয়া এমন একটা ভঙ্গী করিল যাহাতে বুঝা গেল, বিনয়ের বক্তব্যের প্রতি সে মনোযোগী হইয়াছে।

বিনয় বলিল, "দেখুন মিস্ মিত্র, আজকালকার এই উদ্দামতার যুগে সংযমের কথা আমরা একেবারে ভুলে গেছি। এ আমাদের মনেই থাকে না যে, যে সংযম উদ্দামতাকে বেঁধে রাখে তার শক্তি সেই উদ্দামতার শক্তির চেয়ে কম নয়, বরং বেশিই। বন্যার চেয়ে বাঁধের শক্তি ততক্ষণ নিশ্চয় বেশি, যতক্ষণ বন্যাকে বাঁধ বেঁধে রাখতে পারে।"

এ কথারও কমলা কোনো উত্তর দিল না; ঈষৎ আরক্তমুখে নিঃশব্দে নতনেত্রে সে বিনয়ের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। পথপার্শ্বে তরু-শ্রেণীর বায়ু-হিল্লোলিত পত্রজালে মৃদু মর্মরধ্বনি উঠিয়াছিল। দূরে মুক্ত প্রান্তরে রাখাল-বালকেরা গো-মহিষ চরাইতেছিল, তাঁহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত গানের করুণ স্বর হেমন্তের শুব্ধ আকাশকে বিদীর্ণ করিতেছিল। কমলার মন চকিত হইয়া উঠিল।

বিনয় বলিল, "এঞ্জিনে ঘণ্টায় ষাট মাইল গতির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টায় আশী মাইল গতি রোধ করবার মতো ব্রেক বসানো দরকার হয়। আমাদের মনেও যে তেমনি শক্তিশালী ব্রেক বসানো দরকার—এ আমরা মনে করি নে। তাই স্টীমের ঝোঁকে মন যখন একদিকে ছুটতে আরম্ভ করে তখন তার গতি একটা কোনো বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়ে না।"

সহসা সংযমের এ মাহমা কীর্তন যে কেন এবং ব্রেক ও বাঁধের উদাহরণ প্রয়োগই বা কিসের জন্য, তাহা বুঝিতে কমলার ক্ষণমাত্র বিলম্ব

ঘটিল না; কিছু পূর্বে গৃহ হইতে বাহির হইবার আগে যে-মন সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, এ সমস্তই যে তাহারই উপর ব্রেক কষিবার আয়োজন তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল। মানুষের যে অবচেতন মন বিচার-বিতর্ক না করিয়া সহজ-বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করে কমলার মধ্যে সেই মন বিনয়ের অনুশোচনার দুঃখ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উদ্যত হইল। একটু ইতস্তত করিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "তা সত্যি,—কিন্তু ব্রেক ক'ষে সর্বদা মনকে অচল ক'রে রাখাও তো ঠিক নয় বিনয়বাবু। মাঝে মাঝে তাকে আলগা ক'রে একটু গতি দেওয়াও উচিত।"

বিনয় বলিল, "গতি দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। সর্বদা ব্রেক ক'ষে মনকে পঙ্গু ক'রে রাখতে হবে—সে কথা আমি বলছি নে। আমার বলবার উদ্দেশ্য, গতি যে দেবে গতি রোধ করবার ক্ষমতাও তার থাকা উচিত।"

মৃদু হাসিয়া কমলা কহিল, "বাবা বলেন—বেশি গতির উপর হঠাৎ ব্রেক কষলে যন্ত্রের তাতে ক্ষতি হয়। তিনি বলেন—যত কম ব্রেক ক'ষে গাড়ি চালানো যায় গাড়ি তত ভাল থাকে। আমার মনে হয়, মানুষের মন সম্বন্ধেও এ কথা একই রকম খাটে।"

উত্তেজিত হইয়া বিনয় বলিল, "তা হ'লে আমি যে কথা বলছিলাম এ কথা প্রকারান্তরে ঠিক সেই কথাই হ'ল না-কি? আমি বলছি, গতির চেয়ে ব্রেক শক্ত হওয়া উচিত; আর আপনি বলছেন, ব্রেকের চেয়ে গতি সহজ হওয়া উচিত। এ দুয়ে তফাত কই?"

এতক্ষণে কমলা তাহার চিত্তকে অনেকটা সহজ ধারার মধ্যে লইয়া আসিয়াছিল; স্মিতমুখে বলিল, "তফাত এই, আপনি বলছেন—ব্রেকের সাধনা করতে, আর আমি বলছি—গতির সাধনা করতে।"

এই প্রতিভাশালিনী কলেজের মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় বিনয় এ

কয়েকদিন ধরিয়া তাহার সহিত কথায়-বার্তায়, আলাপে-আলোচনায় বহু-বারই পাইয়াছে— কিন্তু এখন তাহার এই সংক্ষিপ্ত সহজ উত্তর শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। এ কথার উত্তরে সে যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইত, যদি না ইত্যবসরে একটি ঘটনা ঘটিত।

পথপার্শ্বে বৃক্ষতলায় বসিয়া একজন সন্ন্যাসী বিশ্রাম করিতেছিল, বিনয় ও কমলাকে আসিতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। বিনয় ও কমলা দাঁড়াইয়া পড়িল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?"

বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় সন্ন্যাসী বলিল, "ক্ষুধিত বোধ করছি, ভোজনের জন্য কিছু পয়সা।"

বিনয় তাহার মনিব্যাগ খুলিয়া চারটি আনি বাহির করিয়া সাধুর হস্তে দিল।

সাধুর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়া উঠিল ; বলিল, "তোমার জয় হোক বাবা!—কিন্তু এত আমার কি হবে ? একটিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" বলিয়া তিনটি আনি প্রত্যর্পণ করিল।

কমলা বলিল, "রাখুন না। আবার তো কাজে লাগবে।"

সহাস্যমুখে সাধু বলিল, "তোমার মঙ্গল হোক মাঈ! আবার যখন দরকার হবে তখন তোমাদের মতো সজ্জন গৃহস্থের সাক্ষাৎ পাব। অনর্থক ভার বাড়িয়ে কি লাভ ?" তাহার পর কমলা ও বিনয়—উভয়ের প্রতি একবার ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মাঈ, তোমরা স্বামী-স্ত্রী ?"

কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; সে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"তবে ? ভাই-বোন ?"

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহাও নহে।

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "বুঝেছি মাঈ। তোমাদের মঙ্গল হবে; আমি একটা ভাল জিনিস তোমাদের দিচ্ছি—হারিয়ো না, যত্ন ক'রে রেখো।" বলিয়া ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি রুদ্রাক্ষ বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি বাছিয়া কমলার হস্তে দিতে গিয়া বলিল, "এটি পঞ্চ-মুখীও নয়, একমুখীও নয়;—কিন্তু এটি সত্যিই ভাল জিনিস।"

রুদ্রাক্ষটি গ্রহণ করিয়া কমলা যুক্তকরে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উভয়ে পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূরে আসিয়া কমলা রুদ্রাক্ষটি বিনয়ের দিকে ধরিয়া বলিল, "এটি আপনি রাখুন।"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "ওটি সন্ন্যাসী তো আপনার হাতেই দিয়েছেন,—আপনিই রাখুন।"

"কিন্তু কেবলমাত্র আমাকেই তো দেন নি।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তা না দিলেও, সে যুক্তিটা তো আপনার বিরুদ্ধেও একই মাত্রায় খাটানো যেতে পারে। তা ছাড়া, আমার চেয়ে আপনার কাছে ওটি বেশি যত্নে থাকবে।"

চকিত হইয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কারণ, ওটির গুণ সম্বন্ধে আপনার মনে কিছু বিশ্বাস হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।"

"তা কি ক'রে জানলেন?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "এটা অবশ্য আমার বিশ্বাস।"

কমলার মুখের উপর একটা অতি-সূক্ষ্ম মালিন্য অধিকার করিয়া বসিল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সে বলিল, "কিন্তু, শুধুই কি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা?—আর কিছু নয়?"

"আর কি ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা বলিল, "আচ্ছা, আমার কাছেই না হয় থাকবে, একবার আপনি এটা ধরুন তো।"

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিনয় রুদ্রাক্ষটি হস্তে লইয়া বলিল, "কি করতে হবে ?"

কমলা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "খুব জোরে ওটাকে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিন।"

"কিন্তু এ তো একা আমার জিনিস নয়।"

একটু অধীরভাবে কমলা বলিল, "আমার দিক থেকে আমি তো আপনাকে সে অধিকার দিচ্ছি ;—দিন না আপনি ফেলে।"

বিনয়ের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কমলার দিকে কাতরনেত্রে চাহিয়া অনুতপ্ত-স্বরে সে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন মিস্ মিত্র। আমি অপরাধী।" তাহার পর পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সযত্নে তাহার মধ্যে রুদ্রাক্ষটি স্থাপন করিল।

কমলা বলিল, "আচ্ছা, এবার আমাকে ওটা দিন।"

"থাক্, আমার কাছেই থাক্।"

"থাক্।"

পুনরায় দুইজনে পাশাপাশি চলিল। জুতার শব্দ পুনরায় এক ছন্দে মিলিত হইয়া বাজিতে লাগিল—মচ মচ। কেহ তাহাতে ব্যাঘাত ঘটাইতে সাহস করিল না, পাছে ব্যতিক্রমে মিলনের কথাটা ধরা পড়িয়া যায়।

"মিস্ মিত্র!"

অপাঙ্গে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কমলা বলিল, "বলুন।"

"একটু ব'সে জিরিয়ে নেবেন ?—বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। ঐ

দেখুন, মাঠে ঐ গাছটার তলায় ঠিক আমাদের দুজনের মতোই বসবার ব্যবস্থা রয়েছে।"

কমলা চাহিয়া দেখিল, একটা ছায়াশীতল গাছের তলায় কাছাকাছি দুইটা পাথর রহিয়াছে যাহা স্বচ্ছন্দে বসিবার আসনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। একবার লোভ হইল, কিন্তু তখনই সে-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না, চলুন। চ'লেই যাওয়া যাক।"

কমলার মনের দ্বিধা-সংক্ষুব্ধ ভাবটুকু বিনয়ের নিকট অগোচর রহিল না। অনুনয়সহকারে সে বলিল, "পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিলেই ক্লান্তি অনেকটা ক'মে যাবে, চলাও যাবে তাড়াতাড়ি। চলুন না, একটু বসবেন। আপনার দরকার না হোক, আমার তো বিশ্রামের একটু দরকার হ'তে পারে।"

ইহার পর কমলা আর কোনো আপত্তি করিল না; বলিল, "তা হ'লে চলুন।"

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া একটা পাথর ভাল করিয়া ঝাড়িয়া নিজের গাত্রবস্ত্রটা তাহার উপর পাতিয়া দিয়া বিনয় বলিল, "বসুন।"

কমলা বলিল, "এত ক'রে আমার জন্য সিংহাসন রচনা ক'রে আপনি নিজে বসবেন ওই ময়লা পাথরটার ওপর?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "ময়লা পাথরটার ওপর কেন?—এই দেখুন তারও ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি।" বলিয়া রুমালটা সেই পাথরের উপর পাতিয়া স্মিতমুখে বলিল, "হয়েছে তো?"

"একটু বাকি আছে। আপনার গায়ের কাপড়খানা এবার তুলে নিন।"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "আপনি তা হ'লে কোন্‌টাতে বসবেন?"

"আমি না হয় রুমালটারই ওপর বসব, অনর্থক গায়ের কাপড়খানা নষ্ট করবার কোনো দরকার নেই।"

বিনয় বলিল, "নষ্ট যা হবার তা তো হয়েইছে, আপনি বসলে আর বেশি কি নষ্ট হবে?—এখন নিন, বসুন।"

"তা হ'লে আপনিই বসুন।"—বলিয়া কমলার রুমালখানার উপর বসিয়া পড়িল।

তখন বিনয় অগত্যা গাত্রবস্ত্রখানা তুলিয়া লইয়া অনাবৃত পাথরখানারই উপর বসিল; বলিল, "বিধাতা যার কপালে পাথর লিখেছেন, পাতা রুমালও তার ভাগ্যে টেঁকে না।"

কমলা বলিল, "কাশ্মীরী আলোয়ানকে যে অবহেলা করে, বিধাতা তাকে রুমাল থেকেও বঞ্চিত করেন।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তা বটে।"

মাইল দেড়েক পথ রৌদ্রে হাঁটিয়া আসার পর সুশীতল বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম বড়ই তৃপ্তিদায়ক মনে হইতেছিল, তাই দশ মিনিট কাল কাটিয়া যাওয়ার পরও পাঁচ মিনিটের কথা কাহারও মনে পড়িল না।

বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, মোটর বিগড়ে যাওয়ার জন্যে আপনার বাবা আমাকে তাঁর যে দ্বিতীয় কথা বলবার সময় পেলেন না, সে দ্বিতীয় কথা কি—তা আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?"

আরক্ত মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "না।"

"আমি বোধ হয় কতকটা পারি। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে আপনাদের বাড়িতে বাস করবার জন্যে বলবেন।"

মুখ তুলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত কমলা বলিল, "এ আপনি কেন মনে করছেন?"

"কাল তিনি আমাকে এই রকম কথার একটু আভাস দিয়েছিলেন। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়—তিনি যদি এই অনুরোধই আমাকে করেন—তাঁর অসীম স্নেহের প্রমাণে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান

ব'লে মনে করব; কিন্তু আমি আপনাদের বাড়ি উঠে এলে সুকুমাররা ভারি দুঃখিত হবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অলস উদাস কণ্ঠে কমলা বলিল, "তা তো হবারই কথা।"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বিনয় বলিল, "আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, এই কথাই যদি তিনি আমাকে বলেন, আপনি তা হ'লে দয়া ক'রে আমার হ'য়ে তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?"

আরক্ত-স্মিত মুখে কমলা বলিল, "বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কাজে লাগাতে চান?—আচ্ছা, তা হোক, আমি বলব।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সুকুমারবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার কোনো কথা হয়েছিল কি?"

বিনয় বলিল, "না।"

"সুকুমারবাবুর মার সঙ্গে?—কিংবা আর কারো সঙ্গে?"

আগ্রহ ভরে বিনয় বলিল, "কারো সঙ্গেই নয়। আমার তো শুধু অনুমান মাত্র—তা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা ক'য়ে কোনো লাভ নেই।"

কমলা বলিল, "কারো সঙ্গে কথা ক'য়ে লাভ নেই তা বলতে পারেন না—যখন আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে লাভ আছে ব'লে এই মাত্র মনে করেছেন। এখনো তো আপনার অনুমান ছাড়া আর কিছু নেই।"

এ কথার মধ্যে যে কাঁটাটি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার আঘাত খাইয়া আরক্ত মুখে বিনয় বলিল, "আজ দেখছি সব কথাতেই আপনার কাছে আমার হার হচ্ছে!"

"সব কথাতেই?—এর আগেও কোনো কথায় হয়েছিল নাকি?"

"হয়েছিল।"

"আজ ছবি আঁকা বাদ যাওয়া নিয়ে বাড়িতে যে কথা হয়েছিল—তাতেও ?"

"তাতেও।"

মৃদুকণ্ঠে কমলা বলিল, "তা হবে।" তাহার পর ক্ষণকাল পরে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিল, "এবার তা হ'লে চলুন।"

"চলুন।"

কমলা উঠিলে বিনয় রুমালখানা তুলিয়া লইয়া বুক-পকেটে রাখিল। তাহার পর তাহারা পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল—পাশাপাশি নিঃশব্দে নীরবে। বাকি অর্ধ মাইল পথ কাহারো মুখে একটি কথা রহিল না, কিন্তু মনের মধ্যে অনির্বচনীয় তাহার সীমা বিস্তার করিয়া চলিল দ্রুতবেগে।

গৃহে পৌঁছিয়া তাহারা গেটের নিকট হইতে দেখিল, বারান্দায় দ্বিজনাথের পাশে বসিয়া রহিয়াছে সুকুমার এবং শোভা।

পরস্পর মিলিত হইবার অনতিবিলম্বেই দুইটি দল পৃথক হইয়া পড়িল ; বিনয় ও সুকুমার দ্বিজনাথের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল এবং কমলা শোভাকে লইয়া তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল।

পথ চলিতে চলিতে বিনয়ের সাহত যে সকল কথা হইয়াছিল এবং ঘটনা ঘটিয়াছিল সেগুলা মনকে তখনো এমন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল যে, কমলা শোভার প্রতি যথোচিত মনোযোগী হইতে পারিতেছিল না। শোভার কথা শুনিতে এবং শোভার কথার উত্তর দিতে সে তাহার মনকে নাড়া দিয়া দিয়া সর্বদা সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু তাহারই মধ্যে কখন্ যে কেমন করিয়া তাহার মন সন্ন্যাসীর রুদ্রাক্ষ, এঞ্জিনের ব্রেক্, মোটরকারের গতি এবং গায়ের-কাপড়-রুমালের আলোচনা লইয়া অগোচরে বারংবার সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার অন্যমনস্কতা শোভার লক্ষ্য এড়াইতেছে না—এই উপলব্ধিই তাহাকে অধিকতর অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছিল।

শোভা মনে করিতেছিল অভিপ্রায় অসিদ্ধির নৈরাশ্য এবং পথ-হাঁটার শ্রান্তির জন্যই কমলা ঠিক সহজ হইতে পারিতেছে না। তাই সে বলিল, "কমলা, পথ চ'লে তুমি বোধ হয় বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ।"

কমলা বলিল, "কই, এমন তো বেশি কিছু পথ হাঁটি নি। তাও মধ্যে এক জায়গায় মিনিট পনেরো-কুড়ি জিরিয়ে নিয়েছিলাম।"

হাসিয়া উঠিয়া শোভা বলিল, "এই দেড় মাইল পথ হাঁটতে পনেরো-কুড়ি মিনিট জিরোতে হয়েছিল ?" পর-মুহূর্তেই বলিল, "বিনুদা কোনো

গল্প ফেঁদেছেন বুঝি? যা চমৎকার গল্প করতে পারেন! একবার গল্প আরম্ভ হ'লে আর তা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না।"

"তোমাদের বুঝি রোজ গল্প বলেন?"

"রোজ। এমনি তো যখন তখন;—তা ছাড়া নিয়ম ক'রে সন্ধ্যার পর থেকে খাবার আগে পর্যন্ত। এক-একদিন গল্প এমন জ'মে ওঠে যে, খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়ে রাত এগারোটা বেজে যায়। খাবার জন্যে যারা তাড়া দেবে তারাই সমস্ত ভুলে তন্ময় হ'য়ে ব'সে গল্প শোনে।"

টেবিল হইতে স্মেলিং সল্টের শিশিটা লইয়া ছিপি খুলিয়া শুঁকিতে শুঁকিতে কমলা বলিল, "এত গল্প করেন কোন্ বিষয়ে?"

উত্তেজিত হইয়া শোভা বলিল, "কোন্ বিষয়ে! শিল্প বল, সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, দেশ-বিদেশের কথা বল।" একটু থামিয়া ঝোঁক দিয়া "রাজনীতি বল। জ্ঞানী মানুষ, বুঝলে কমলা?—দস্তুরমতো জ্ঞানী মানুষ!"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "তাই তো দেখছি।"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "আমি বলছি তাই দেখছ? কেন? তোমাদের এখানে গল্প করেন না?"

"এখানে আর কার সঙ্গে গল্প করবেন বল! বাবার সঙ্গে একটু-আধটু করেন। আমার বিষয়ে বোধ হয় মনে করেন, ছবি আঁকানো ছাড়া আর আমি কিছুই বুঝি নে।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া শোভা বলিল, "না, না, অন্যায় কথা ব'লো না ভাই,—কাউকেই তিনি সামান্য মনে করেন না, তা তোমাকে! আমারই সঙ্গে গল্প ক'রে কত আনন্দ পান, তা তোমার সঙ্গে! তোমার ওপর বিনুদার কত উঁচু ধারণা তা যদি তুমি শুনতে তো বুঝতে।"

কমলা বলিল, "তা হ'লে বুঝতাম বেশি জ্ঞানী মানুষেরা কিছু না জেনে ভুল ধারণা করেন।"

শোভা হাসিয়া বলিল, "না। তা হ'লে বুঝতে বেশি জ্ঞানী মানুষেরা কত অল্প জেনে শুনে ঠিক ধারণা করেন। তোমার ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি তোমাকে যা বুঝেছেন, তুমি তার আধখানাও নিজেকে বোঝ নি।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "এটা খুব বাহাদুরির কথা হ'ল না শোভা, কারণ শূন্যকে দুগুণ করলে তা শূন্যই হয়। নিজের বিষয়ে ধারণার যথার্থ মূল্য অনেক সময়ে শূন্যের চেয়ে বড় বেশি কিছু হয় না। সে যাই হোক, তোমারও তো ছবি আঁকছেন, তোমারও বিষয়ে তা হ'লে তিনি একটা ধারণা করেছেন?"

"নিশ্চয় করেছেন।"

"আর সে ধারণা ঠিক ধারণা?"

দ্বিধাশূন্যভাবে শোভা বলিল, "নিশ্চয়ই ঠিক।" তাহার পর কমলাকে আর কোনো প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া বলিল, "তোমার আর আমার বিষয়ে একদিন বিনুদা কি বলছিলেন শুনবে?"

"বল, শুনি।"

সহাস্যমুখে শোভা বলিল, "বলছিলেন—তোমার মধ্যে আলোর খেলা বেশি, আর আমার মধ্যে ছায়ার।" পাছে কমলা কথাটার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া থাকে সেই জন্য ব্যগ্রভাবে বলিল, "গায়ের রঙের কথা নয়—স্বভাবের।"

কোনো কথা না বলিয়া কমলা মৃদু হাস্য করিল,—কতকটা কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কতকটা শোভার অনাবিল সরলতায় মুগ্ধ হইয়া।

"কমলা!"

"কি ভাই ?"

"এবার থেকে তোমাদের বিনুদার গল্প শোনবার খুব সুবিধে হবে।"

"কেন ?"

"বিনুদা বোধ হয় এবার থেকে তোমাদের বাড়িতে থাকবেন।"

চকিতনেত্রে কমলা বলিল, "এ কথা তোমাকে কে বললে ?"

"কাকাবাবু দাদাকে বলছিলেন, তাঁর একা থাকতে বড় কষ্ট হয় আর বিনুদাকে তাঁর বড় ভাল লাগে, তাই যাতে বিনুদা তাঁর কাছে দিন কতক থাকেন।"

উৎসুক হইয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদা কি বললেন ?"

"প্রথমে একটু আপত্তি করছিলেন, কিন্তু কাকাবাবুর আগ্রহ দেখে পরে বললেন, বিনুদা যদি রাজী হন তো তিনি আপত্তি করবেন না।"

একটু চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "তোমার বিনুদা রাজী হবেন না শোভা।"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "কি ক'রে তুমি তা জানলে ?"

কমলা বলিল, "যে ক'রেই হোক আমি তা জানি।" তাহার পর শোভা আর কিছু বলিবার আগেই বলিল, "তিনি নিজেই আমাকে একটু আগে বলছিলেন।"

নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিলেন ?"

"বলছিলেন, তিনি তোমাদের বাড়ি থেকে চ'লে এলে তুমি ভারি দুঃখিত হবে।"

অন্ধকার কক্ষে আলোর সুইচ টিপিয়া দিলে যেমন হয় তেমনি শোভার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "তাই বলছিলেন না-কি ?" তাহার পর কমলার মুখে রুদ্ধ মৃদু হাস্য লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি ঠাট্টা করছ কমলা !"

কমলা বলিল, "ঠাট্টা একটুখানি করেছি, কিন্তু সত্যি কথাই বেশি বলেছি। বলছিলেন, তোমরা ভারি দুঃখিত হবে।"

শোভার মুখে একটা সূক্ষ্ম ছায়াপাত হইল ; বলিল, "তাই বল।"

কমলা বলিল, "তার জন্যে দুঃখ কি ভাই ? তোমরার মধ্যেও তো তুমি আছ !"

সহাস্য মুখে শোভা বলিল, "তা অবশ্য আছি।"

বেলা বাড়িয়া উঠিয়া ক্রমশ যে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো পক্ষেরই মনে ছিল না। বারান্দায় তর্ক চলিতেছিল শিল্পকলাকে কতদূর পর্যন্ত বিধি-বিধানের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা যায় এবং বাঁধিয়া রাখা উচিত কি-না তাহা লইয়া।

বিনয় বলিতেছিল, "কতদূর পর্যন্ত বেঁধে রাখা উচিত সে বিষয়ে কোনো হিসেব বা নিয়ম থাকা সম্ভব নয়, কারণ শিল্পী যখন প্রচলিত বিধি-বিধানকে অতিক্রম ক'রে যায় তখন সে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বলেই করে। নিয়মকে অতিক্রম করবার কোনো নিয়ম হ'তে পারে না, কারণ যারা নিয়ম সৃষ্টি করে তারা নিয়মের ব্যতিক্রমকে প্রীতির চক্ষে দেখে না ; বরং তার জন্যে দণ্ডেরই ব্যবস্থা করে। তাই কোনো প্রতিভাবান শিল্পী যখন প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিকে অতিক্রম ক'রে শিল্প সৃষ্টি করে, জনসাধারণ বিচারক হ'য়ে অধিকাংশ স্থলে তার দণ্ড-বিধানই ক'রে থাকে। শিল্পী শিল্প-বিদ্যার বলে রীতি-পদ্ধতি মেনে চলে, আর শিল্প-জ্ঞানের বলে রীতি-পদ্ধতিকে অতিক্রম ক'রে যায়। সেই জন্যে যে যুগে শিল্প-জ্ঞানীর একান্ত অভাব ঘটে, সে যুগের শিল্প-কলা একঘেয়ে হ'তে বাধ্য।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমি যে তত্ত্ব বললে তা শুধু শিল্পকলার বিষয়েই নয়, যে কোনো বস্তু, যা জন্ম-বৃদ্ধি-বিনাশের অধীন, তার বিষয়ে খাটে।

এক নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস একই অবস্থায় থাকে, তার কোনো রকম পরিবর্তন হয় না, কাজেই বৈচিত্র্যের অভাব হয়।”

সুকুমার বলিল, “সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলছিলাম, সাধারণ মানুষের পক্ষে রীতি-পদ্ধতি মেনে চলাই ভাল, তা নইলে আমরা সুফলের পরিবর্তে যা পাই তা যথেচ্ছাচারিতারি ফল।”

বিনয় বলিল, “দেখ সুকুমার, নিজের স্বতন্ত্র পথ ক’রে নেবার যার শক্তি নেই, বাঁধা পথ ছাড়লে সে যাবে বিপথের পথে—দুদিন পরে কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। তার জন্যে ক্ষোভ করা বৃথা। কিন্তু নিজের স্বতন্ত্র পথ যে নিজে ক’রে নিতে পারে, সেই অসাধারণ পথিককে বাঁধা পথে ধ’রে রাখতে চেষ্টা করলে তাকে প্রাণে মারা হবে। কিন্তু নিয়ম অতিক্রম করার মধ্যেও সংযম থাকা দরকার; যার থাকে সে স্বাধীন, যার থাকে না সে যথেচ্ছাচারী।”

ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে একটু ইতস্তত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, “কিন্তু সংযম তো সাধনার বস্তু বিনয়,—সংযম তো প্রতিভার সঙ্গে উৎপন্ন হয় না। তা হ’লে নিয়ম-পালনের কথাটা একেবারে—”

বিনয় বলিল, “না, একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিভা হচ্ছে ঘোড়া আর সংযম হচ্ছে লাগাম, কিংবা প্রতিভা হচ্ছে মোটর আর সংযম হচ্ছে ব্রেক, দুইয়ের যোগে চাকা যে পথে চলে সেই হচ্ছে প্রকৃত পথ। কিন্তু শুধু ব্রেকটাই মেনে চললে চাকা অচল হবে।” মনে মনে বলিল, ‘তোমার কাছে হার মানলাম কমলা। তোমার গতির সাধনাই হচ্ছে প্রকৃত সাধনা; সংযমের সাধনা তার কাছে গৌণ।’

উত্তরে সুকুমার কিছু বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার অবসর হইল না। পদ্মমুখী আসিয়া বলিলেন, “বিনয়, অনেক বেলা হয়েছে, তোমরা তিনজনে এখন আর না গিয়ে নেয়ে খেয়ে নাও। তারপর ঠাণ্ডা পড়লে

দম্ভ আমি করি নে শৈল। তুমিই একটু ভাবো। কাল সকাল আটটার সময় চীফ এঞ্জিনীয়ারকে দরখাস্ত দিতে হবে, আমি এখন তার পিছনে একটু লাগি।"

একটু চিন্তা করিয়া শৈলজা বলিল, "সেই কথাই ভাল। তুমি বিনয় ঠাকুরপোকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

সুকুমার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। "এক্ষনি দিচ্ছি।"—বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বিনয় আসিয়া বলিল, "আমাকে তলব করেছেন বউদি?"

শৈলজা বলিল, "করেছি।"

"কি আদেশ, বলুন?"

"আদেশ, গুরুতর অপরাধে কিছুদিনের জন্য এ বাড়িতে আপনি বন্দী হলেন। যতদিন না ছাড়পত্র পান অন্য কোথাও যেতে পাচ্ছেন না।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "দণ্ডের বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রতিবাদ করছি নে, কিন্তু অপরাধ কি জানতে পারি কি?"

শৈলজার প্রকৃতি অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের মতো,—ফোড়া পাইলে অস্ত্র না চালাইয়া সে থাকিতে পারে না, প্রলেপ লাগাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিবার ধৈর্য তাহার নাই; বলিল, "আপনি বুধোর মুখে উদোর চোখ এঁকেছেন।"

শৈলজার কথা শুনিয়া বিনয় হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ও! এই কথা! তা আপনিও দেখেছেন না-কি?"

"দেখি নি, শুনেছি।"

"কার মুখে? শোভার মুখে?"

"তা, তার জন্যে আর ভাবনা কি? বুধোর মুখ থেকে উদোর চোখ মুছে দিলেই হবে।"

কৌতুকোজ্জ্বল প্রসন্নমুখে সহসা একটা অদ্ভুত নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া শৈলজা বলিল, "তাই কি হয় ঠাকুরপো? মুখ থেকে চোখ মুছে দেওয়া যত সহজ, মন থেকে সব জিনিস মুছে দেওয়া কি তেমনি সহজ?"

শৈলজার এই অকস্মাৎ-পরিবর্তিত ভাবে এবং অর্থ-গভীর কথায় বিনয়ের মুখ হইতে হাসি অন্তর্হিত হইল। যে ব্যাপার লইয়া কৌতুক চলিতেছিল তাহার গর্ভে এত বড় করুণতা প্রচ্ছন্ন ছিল উপলব্ধি করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাক্য সরিল না। সে নির্বাক বিহ্বলতায় শৈলজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা সময়ের যন্ত্র যেন এমন সুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল যাহাতে কিছুই বেসুরা ঠেকে না। যত অদ্ভুত, যত অসাধারণ কথাই হউক, সবই বলা চলে। শৈলজা বলিল, "শোভা আপনার জন্যে পাগল ঠাকুরপো! কিন্তু আজ সে বড় ভয় পেয়েছে।"

স্বপ্নাহতের মতো বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তার ছবিতে কমলার চোখ দেখে।"

প্রশ্নার্ত চক্ষে বিনয় একবার শৈলজার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনো কথা বলিতে পারিল না।

শৈলজা বলিল, "সে আমাকে তার মনের কোনো কথাই খুলে বলে নি—কিন্তু আমি সব বুঝেছি। আমি যদি তাকে অত্যন্ত ভাল না বাসতাম তা হ'লে কখনই এমন ক'রে এ-সব কথা আপনাকে বলতাম না। আপনার মনে যদি কোনোরকমে বেদনা দিয়ে থাকি, তা হ'লে আমাকে মাপ করবেন ঠাকুরপো। কিন্তু আমি আমার একদিকের কর্তব্য করলাম। এর পর এ কথা মনে ক'রে আমার আক্ষেপ হবে না যে, শোভার জন্যে যা করা আমার অসম্ভব ছিল না, তা করি নি। আমার যা বলবার আমি বললাম, আপনার যা করবার আপনি তা করবেন।"

বিনয়ের মুখে একটা গভীর বেদনা ও নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "মানুষের বুদ্ধি সময়ে সময়ে লোপ পায়। এখন আমার সেই অবস্থা হয়েছে বউদি, তাই এখন আমি চললাম। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।" বলিয়া বিনয় ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বাহিরের বারান্দায় একধারে টেবিল চেয়ার পাতা। সেখানে ল্যাম্প জ্বালিয়া বসিয়া একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ লইয়া সুকুমার নিবিষ্ট মনে দরখাস্ত লিখিতেছিল। মুসাবিদাটা কিন্তু কিছুতেই ঠিক তেমন হইয়া উঠিতেছিল না, যাহাতে প্রার্থী হিসাবে তাহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে চীফ্ এঞ্জিনীয়ারের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে। কেবলমাত্র কার্যপটু ঠিকাদার পিতামহের দাবিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো লিপি-চাতুর্য কিছুতেই আয়ত্ত হইতেছিল না, এমন সময়ে বিনয় আসিয়া পাশেই একখানা ঈজি-চেয়ারে ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

আড়ভাবে বিনয়কে একবার দেখিয়া সুকুমার ডাকিল, "বিনয়!"

সুকুমারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিনয় বলিল, "কি?"

"তুমি দরখাস্ত লিখতে জান?"

"জানি। কিন্তু আমার লেখা দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুকুমার বলিল, "তবে তো খুব লিখতে জান। কখনো দরখাস্ত করেছিলে না-কি?"

"করেছিলাম।"

"কবার?"

"দুবার।"

উৎসুক হইয়া সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "দুবার? কোথায় কোথায় হে?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিনয় বলিল, "একবার কলকাতায় কাস্টম্‌স্ হাউসে অ্যাপ্রেজারের কাজের জন্যে আর একবার লাহোরের একটা ব্যাঙ্কে একাউণ্টেণ্টের জন্যে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সুকুমার আবার হাসিতে লাগিল। বলিল, "সে তোমার দরখাস্ত লেখার দোষে নামঞ্জুর হয় নি, বুদ্ধির দোষে হয়েছিল। আর্টিস্ট্ হ'য়ে তুমি অ্যাপ্রেজার আর একাউণ্টেণ্টের কাজের জন্যে দরখাস্ত কর? নাঃ, তুমি দেখছি সত্যি-সত্যিই একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট্!"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে তোমার কমন্‌সেন্স্ অতিমাত্রায় কম। যে যত বড় আর্টিস্ট্ তার কমন্‌সেন্স্ তত বেশি কম হয়।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনয় বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি ছবি আঁকি ব'লে আমার অন্য কোনো বিষয়ে যোগ্যতা থাকতে পারে না?"

স্মিতমুখে সুকুমার বলিল, "একটা কোনো বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতা থাকলে অনেক সাধারণ যোগ্যতা তাতে ডুবে মারা যায়। এমন অনেক ব্যাপার আছে যা অন্য অনেক ব্যাপারের পক্ষে বিরোধী। ডাক্তারকে জমিদারির ম্যানেজার রেখেছে, এ কখনো শুনেছ? তুমি যে আর্টিস্ট্, এ তোমার অনেক বিষয়ের পক্ষে অপগুণ—ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন।"

বিনয় বলিল, "তা-ই যদি হয়, তা হ'লে দরখাস্ত লেখার পক্ষেও।"

সুকুমার আবার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "নাঃ, তুমি ঠকিয়েছ। সহজ বুদ্ধি না থাক্, কূটবুদ্ধি তোমার বেশ আছে।" তারপর দরখাস্তের মুসাবিদাখানা বিনয়ের হাতে দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ তো কি রকম হয়েছে! আর পারা যায় না—এই থাকল, এতেই যা হবার হবে।"

সংক্ষিপ্ত আবেদন-পত্র। পিতামহর গুণকীর্তনেই তার পরিসমাপ্তি। পড়িয়া সুকুমারের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বিনয় বলিল, "এ দরখাস্ত পড়লে নিঃসংশয়ে মনে হয়, তুমি তোমার যোগ্য পিতামহের অযোগ্য পৌত্র।"

কপট বিমর্ষতায় মুখ বিমর্ষ করিয়া সুকুমার বলিল, "তা ছাড়া তো আর-কোনো যোগ্যতা আমার নেই বিনু!"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "সে তো তোমার হিসেবে ভালই, তা হ'লে কাজে কাজেই ডিস্‌কোয়ালিফিকেশনও কিছু নেই।"

সুকুমার হাসিতে লাগিল।

"বিনু!"

"বল।"

"এ দরখাস্ত যা হয় হবে, কিন্তু তোমার বউদিদির দরখাস্তের কি করলে?"

চমকিত হইয়া বিনয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আরক্ত মুখে বলিল, "কিছু করি নি। কি-যে করব তাও জানি নে।"

"কেন, সে এমনই কি কঠিন কথা?"

"কঠিন কি সহজ, তা জানি নে ভাই,—কিন্তু আমার তো বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

সুকুমার মনে করিয়াছিল, শৈলজা বিনয়কে শুধু তাহাদের বাড়ি ছাড়িয়া না যাওয়ার জন্যই উপরোধ করিবে; বিনয়ের কথা শুনিয়া তাহার সন্দেহ হইল, হয়তো বা শোভার কথাও সে বলিয়াছে। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিনু, আমাদের বাড়ি ছেড়ে তুমি দ্বিজনাথবাবুর বাড়ি না যাও, এ ছাড়া আর অন্য কোনো কথা শৈল তোমাকে বলেছে না-কি?"

মৃদুস্বরে বিনয় বলিল, "বলেছেন।"

"কি কথা?"

"শোভার কথা।"

হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া ত্বরিতবেগে চেয়ারটা ঘুরাইয়া বিনয়ের দিকে মুখ করিয়া বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ স্বরে সুকুমার বলিল,

"শোভার কথা বলেছে? অত্যন্ত অন্যায় করেছে। ছি, ছি! ভারি ছেলেমানুষ শৈল!"

"কিন্তু ছেলেমানুষ তুমি কি ক'রে বল সুকু? ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, শোভার বিষয়ে যে অনুমান তিনি করেছেন, তাতে এ কথা আমাকে না জানিয়ে তাঁর উপায় কি? তুমি এ কথা জানতে?"

"তোমার জানবার মিনিট দশ-পনেরো আগে শৈলর মুখেই শুনেছিলাম।"

"আচ্ছা, বউদিদি যদি আমাকে এ কথা না বলতেন, তুমি কি করতে? তুমি এ কথা আমাকে জানাতে, না, জানাতে না?"

একটু চিন্তা করিয়া সুকুমার বলিল, "হয়তো জানাতুম না—আমি যে কমলার কথা জানি।"

"কিন্তু কমলার কথাও তো অনুমান ভিন্ন আর কিছু নয়।"

সুকুমার বলিল, "কমলার কথা অনুমান হ'তে পারে, কিন্তু তোমার কথা তো অনুমান নয় বিনু। আমি যে তোমার কথাও জানি।"

এ কথার বিনয় আর কোনো উত্তর দিল না, সুকুমারও আর কিছু বলিল না; সমস্যা-বিমূঢ় দুই বন্ধু নীরবে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। সুকুমার ভাবিতে লাগিল, সব দিক বিবেচনা না করিয়া শোভার কথা বলিয়া বিনয়কে এমন সঙ্কটে ফেলা সঙ্গত হয় নাই। ইহার দ্বারা বন্ধুর প্রতি অবিচার এবং অতিথির প্রতি উৎপীড়ন হইয়াছে। অসঙ্কোচে 'না' বলিবার সুবিধা যাহার ষোল আনা নাই, অনুরোধের দ্বারা তাহাকে বিড়ম্বিত করা সুনীতি-বিরুদ্ধ। সমবেদনায় সুকুমারের সদয় চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

"বিনু!"

বিনয় সুকুমারের দিকে চাহিয়া দেখিল।

"এতে ভাবনারও কোনো কারণ নেই—বিবেচনারও কোনো কথা নেই। হৃদয় যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করবে সেখানে মাথা ঘামানো বৃথা। শোভা যদি তোমাকে কামনা ক'রে থাকে তো তাকে আমি দোষ দিতে পারি নে বিনু—কারণ তুমি যে কামনার বস্তু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারবে যে, তোমার প্রতি তার ভালবাসার আকার বদলানো উচিত, তখন যে সে বিষয়ে তার দেরি হবে না—তাতেও আমার সন্দেহ নেই। সে যা হোক, উপস্থিত দ্বিজনাথবাবুর বাড়ি যাওয়া-না-যাওয়া সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করছ?"

"না যাওয়াই স্থির করছি।"

সুকুমারের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; বলিল, "সে বেশ কথা—তোমার বউদিদির তিরস্কার থেকে আমি অব্যাহতি পেলাম। তাঁর ধারণা, আমার জন্যেই তোমার সেখানে যাওয়া হচ্ছিল।"

"কিন্তু এখানেও আমি থাকছি নে সুকুমার। আমি বোধ হয় কাল কলকাতা যাচ্ছি।"

বিস্মিত হইয়া সুকুমার বলিল, "এই উভয় সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কাপুরুষের মতো?"

বিনয় বলিল, "কাপুরুষেরই মতো,—বীরপুরুষদের বীরত্ব প্রকাশ করবার নির্বিঘ্ন সুযোগ দিয়ে।"

"কিন্তু তোমার ছবি আঁকা?"

"ছবি আঁকা এই পর্যন্তই রইল।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বলিল, "এই পর্যন্তই রইল? আর আঁকবে ব'লে চুক্তি করেছ যে?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আঁকব ব'লেই চুক্তি করেছি,—চুক্তি ভাঙব না ব'লে তো চুক্তি করি নি।"

সুকুমার বলিল, "হ্যাঁ, এ একটা যুক্তি বটে! কিন্তু শুধু চুক্তির দাবিই তো নয়, তার চেয়েও কঠিন দাবি দিয়ে তোমাকে আটকাবেন প্রথমত দ্বিজনাথবাবু, এবং দ্বিতীয়ত, যদি প্রয়োজন হয়, তাঁর কন্যা কমলা। এক হাতে স্নেহ এবং অপর হাতে প্রেমের বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়বে।"

বিনয় বলিল, "সুকুমার, তুমি নিশ্চয় লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লেখ! তোমার কথাগুলি কাব্যরসাত্মক।"

এমন সময়ে শোভা আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত।

রাত্রে সুকুমারের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া শৈলজা অতিশয় রাগিয়া গেল। সুকুমারের উপর রাগ করিল, বিনয়ের উপর রাগ হইল, শোভার উপর রাগ হইল, দ্বিজনাথের উপর রাগ হইল, আর সকলের চেয়ে বেশি রাগ হইল কমলার উপর। সে-ই যত নষ্টের গোড়া! ছবি না আঁকাইলে যেন চলিতেছিল না! ছবি আঁকানো-টাকানো কিছু নয়—ও-সমস্ত কৌশল ছেলে ধরিবার জন্য। কলেজে-পড়া মেয়েদের উপর একটা গভীর অশ্রদ্ধায় শৈলজার মন ভরিয়া উঠিল।

পরদিন সকালবেলা শোভাকে দেখিতে পাইয়া সে তর্জন করিয়া ডাকিল "এ দিকে আয়।"

নিকটে আসিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল "কি বলছ, বউদি?"

রুক্ষ-স্বরে শৈলজা বলিল, "বলছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। বিনয় ঠাকুরপো তোকে চায় না—ও চায় সেই কটা-চামড়া কমলীকে। বুঝলি? ফের যদি তুই ওকে ভালবাসতে যাবি তো মাছ-কোটা বঁটি দিয়ে তোর নাক কেটে দোব; আর মাকে সব কথা ব'লে দিয়ে মজা দেখাব।"

এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের জন্য শোভা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে বিস্ময়ে আর আতঙ্কে অভিভূত হইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "ও কি বলছ বউদিদি? আমি কি করেছি?"

শৈলজা গর্জন করিয়া উঠিল, "আমি কি করেছি! ধিঙ্গী হয়েছেন, স্বাধীন হয়েছেন, কারুর সঙ্গে শলা-পরামর্শ না ক'রে আপনার মনে প্রেম করছেন! আবার বলা হচ্ছে—আমি কি করেছি! পরজন্মে কটা চামড়া নিয়ে এসে তারপর প্রেম করিস। বুঝলি?"

এবার শোভা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—শৈলজার কঠোর বচনের দুঃখে নয়, স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়ার সমবেদনার স্পর্শ লাভ করিয়া। এ ধরনের তিরস্কার তাহার পক্ষে এই নূতন নহে, সে নিঃসংশয়ে জানিত এই কর্কশ ভাষা ছদ্মবেশী স্নেহধারা ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

শোভার চোখে জল দেখিয়া শৈলজা বাহুবন্ধনের মধ্যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ্ দেখি নি, মিছিমিছি সকালে উঠে কতক-

গুলো বকুনি খেয়ে মলি! ও প'টোর সঙ্গে তোর বিয়ে সাধলেও আমরা দিতুম না। তোর বিয়ে হবে বিলিতী-পাস-করা হাকিমের সঙ্গে।"

তখন ছয়টা বাজিয়াছে। আটটার সময়ে চীফ্ এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করিবার কথা। ভোর পাঁচটা হইতে উঠিয়া সুকুমার হৈ-চৈ করিয়া সমস্ত বাড়ি তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। শোভাকে বাহু-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া শৈলজা বলিল, "শীগগির যা, তোর দাদা এখনি বেরোবেন, চা ক'রে খাবার দে।"

ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া শোভা বলিল, "বিনুদাকেও এখনি দেবে?"

ভিতরে ভিতরে একটা নিশ্বাস চাপিয়া কোমল স্বরে শৈলজা বলিল, "তাঁকে এত তাড়াতাড়িতে না দিয়ে পরে ভাল ক'রে গুছিয়ে দিস।"

দ্রুতপদে শোভা প্রস্থান করিল।

আরও আধ ঘণ্টা কাল অনাবশ্যক দৌড়াদৌড়ি করিয়া, বাড়ির সমস্ত লোককে অকারণ বকিয়া ধমকাইয়া, অর্ধেক খাবার আর আধ পেয়ালা চা খাইয়া ঝড়ের মতো সুকুমার গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া গেল। পনেরো মিনিট পরে দেখা গেল, সুকুমারের গাড়ি প্রবলবেগে ফিরিয়া আসিতেছে। থামিতে না থামিতে গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দুইটা করিয়া সিঁড়ি লাফাইয়া বারান্দায় উঠিয়া টেবিলের দেরাজটা সজোরে টানিয়া সুকুমার তাড়াতাড়ি একটা কাগজ বাহির করিয়া লইল।

বারান্দায় বিনয় বসিয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি সুকুমার?"

"দরখাস্তটা ফেলে গিয়েছিলাম।"

সবিস্ময় পুলকে বিনয় বলিল, "দরখাস্তটাই ফেলে গেছলে? আর কিছু ফেলে যাচ্ছ না তো?"

সিঁড়িতে নামিতে নামিতে পিছন ফিরিয়া সুকুমার বলিল, "তোমার বউদিদিকে ফেলে যাচ্ছি।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বিনয় বসিয়া রহিল।

গাড়ি ছুটিল সবেগে।

সন্ধ্যার ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে দিনান্তের ক্ষীণ আলোটুকু যেমন দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, তেমনি চিন্তার নিবিড়তার মধ্যে বিনয়ের অধরের হাস্যরেখাটুকু ক্রমশ মিলাইয়া গেল। গত রাত্রি হইতে যে কঠিন সমস্যাজালে সে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে যেন আর উদ্ধার নাই। কমলা অনিশ্চিত,—অনির্ণীত। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলি মথিত করিয়া সে সম্ভাবনা, অনুমান মাত্র,—তার বেশি কিছুই নহে। কিন্তু তার অনিশ্চয়তাই যেন তার আকর্ষণী শক্তি, তার দুর্লভতাই যেন তার মূল্য। শোভা কিন্তু সুনিশ্চিত,—সুলভ। শৈলজা বলিতেছিল, সে বিনয়ের জন্য পাগল। সে কথা বিনয়ের মনে জাগাইতে সক্ষম হইল কেবলমাত্র করুণা,—প্রেম রহিল বহু অন্তরালে সুষুপ্ত, অনাহত। শোভার উন্মাদনায় বিনয়ের মধ্যে আবেগ উদ্গত না হইয়া উদ্গত হইল অনুকম্পা।

শুধু তাহাই নহে। এই অনুকম্পা, এই করুণা বিনয়ের চিত্তের আর একদিকে প্রেমকে বর্ধিত করিয়া তুলিল, কালো মখমলের আধারে হীরকখণ্ড উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। শোভাকে দিয়া কমলা সুনির্ণীত হইল; পয়সা দিয়া টাকার মূল্য বোঝা গেল।

একটা দেবদারু গাছের মাথায় প্রভাত-সূর্যের আলো শাখা-পত্র অবলম্বন করিয়া সোনালী রঙে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। বিনয়ের মনে হইল, শরৎকালের সুনির্মল আকাশ ঠিক যেন একটা বিশাল হৃদয়ের মতো সেই নিঃশব্দ নিবেদন নির্বিবাদ প্রসন্নতায় গ্রহণ করিতেছে; সামান্য মাত্র

আপত্তি নাই, বিরক্তি নাই। এক দিক হইতে অকপট দান, আর-এক দিক হইতে অকুণ্ঠিত গ্রহণ;—কে দিতেছে, কে লইতেছে যেন বোঝাই যায় না। স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার একটা অসঙ্কোচ উদারতায় বিনয়ের হৃদয় প্রসারিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এবার হইতে কিছুই সে প্রত্যাখ্যান করিবে না, অগ্রাহ্য করিবে না। বুদ্ধি দিয়া যাহাকে বুঝিবে, প্রাণ দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে।

একটা অপরিসীম মমতায় শোভার প্রতি বিনয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে করিল, আজ দ্বিজনাথের বাড়ি গিয়া দেনা-পাওনা মিটাইয়া সেদিকের ব্যাপারটা সুনিশ্চিত সহজ করিয়া আসিবে। তারপর এ দিকের ব্যাপার যেমন হয়, করিলেই চলিবে। অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি কোনো মনোযোগ না দিয়া নিজের হৃদয়-বৃত্তিকে একান্তভাবে অনুসরণ করা বর্বরতা বলিয়া তাহার মনে হইল। একটা বাধাহীন সীমাহীন উদারতায় বিনয়ের মন নৃত্য করিতে লাগিল,—সব রকম ত্যাগ স্বীকার করিবার, সব রকম দুঃখ ভোগ করিবার আনন্দে।

"বিনুদা!"

"কি শোভা?"

"তোমার চা এনেছি।"

বিনয় উঠিয়া টেবিলের সামনে গিয়া বসিয়া বলিল, "এইখানে রাখ।"

চা এবং জলখাবার টেবিলের উপর রাখিয়া শোভা চলিয়া যাইতেছিল, বিনয় ডাকিল, "শোভা!"

শোভা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়ের দিকে চাহিল।

বিনয় বলিল, "অতিথির সামনে শুধু খাবার রেখে দিলেই আতিথ্যের কর্তব্য শেষ হয় না। অতিথিকে দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হয়। ঘোড়াকেও

দানা দিয়ে সইস্ সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যদি চিড়িয়াখানার বাঘ হতাম, তা হ'লেও না হয়—"

লজ্জিতমুখে শোভা বলিল, "আমি যাচ্ছিলাম আপনার হাত ধোবার জল আনতে।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ কিনা, খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাঁড়াতে, যার কোনো দরকারই নেই; এই গেলাসের জলেই হাত ধোয়ার কাজ অনায়াসে সারা যেতে পারবে। সকালবেলা বড় এক পেয়ালা চা খেয়ে তারপর এক গেলাস জল খাওয়ার মতো তেষ্টা থাকলে তোমাদের ডাক্তার ডাকতে হ'ত।

শোভার মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।"

অদূরে একটা চেয়ারে শোভা উপবেশন করিলে বিনয় বলিল, "আমি বোধ হয় তোমাদের বাড়িই থেকে গেলাম শোভা; কমলাদের বাড়ি যাব না স্থির করেছি।"

শোভার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল, "কেন?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "কেন? বোধ হয় তোমাদের বাড়ির দানাপানি আমার অদৃষ্টে এখনো কিছু আছে ব'লেই।"

মৃদু স্বরে শোভা বলিল, "দ্বি নাথবাবু কিন্তু দুঃখিত হবেন।"

"তিনি দুঃখিত হোন, তুমি তো হবে না?"

শোভার চোখে জল আসিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অল্প একটু ঘাড় নাড়িল,—অর্থাৎ, দুঃখিত হইবে না।

শোভার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বিনয় দেখিল, মনের ব্রেক হঠাৎ একটু বেশি আলগা হইয়া গিয়াছিল, সামান্য কষা দরকার; বলিল, "শোভা, একটু আগে তোমার দাদা কি রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেল, দেখেছ?

"দেখেছি।"

"বউদিদি দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

চমকিত হইয়া বিনয় ও শোভা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, শৈলজা ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া জানলায় মুখ দিয়া হাসিতেছে।

শৈলজাকে দেখিয়া ভয়ে শোভার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার মনে প'ড়ল, একটু আগে শৈলজা তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল 'ফের যদি তুই ওকে ভালবাসতে যাবি তো তোর নাক কেটে দোব।' কিন্তু শৈলজার হাসিমুখ দেখিয়া সে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, একমাত্র প্রসন্নতা ভিন্ন সেখানে অন্য কিছুই নাই।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া বিনয় বলিল, "ওখানে কি করছেন বউদি?"

সুমিষ্ট হাস্যে মুখ ভরিয়া শৈলজা বলিল, "আড়ি পাতছি।"

বিনয়ের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

শৈলজা বলিল, "ওরে শোভা, ঠাকুরপোকে আরও গোটা দুই সন্দেশ নিয়ে গিয়ে দে।"

ব্যস্ত হইয়া বিনয় বলিল, "না না, বউদি, এমন কোনো গুরুতর অপরাধ করি নি, যাতে এমন ক'রে মিষ্টি খাইয়ে দণ্ড দেবেন।"

হাসিতে হাসিতে শৈলজা বলিল, "তবে খানিকটে নুন খাইয়ে দে—তাতে যদি কিছু গুণ গান।"

আর কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল; বলিল, "ছবি আঁকতে চললাম বউদি। দেরি হয়ে গেছে, গাড়ি এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

ব্যস্ত হইয়া শৈলজা বলিল, "খাবার প'ড়ে রইল যে!"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "সেখানকার জন্যে একটু স্থান রেখে না

গেলে মারা যাব। জানেন তো দ্বিজনাথবাবুকে—স্ত্রীলোকের৺ বাড়া।”

দ্বিজনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিনয় দেখিল, তাহার প্রত্যাশায় কমলা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে।

উদ্বিগ্ন স্বরে দ্বিজনাথ বলিলেন, “এত দেরি বিনয়? অসুখ-টসুখ কিছু করে নি তো?”

বিনয় বলিল, “না।”

“আমি ভাবছিলাম, কাল অতখানি হেঁটে বুঝি—”

দ্বিজনাথকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বিনয় বলিল, “অতটুকু হেঁটে অসুখ করলে তাতে ভাবনার কথা যত না হোক, লজ্জার কথা তার অনেক বেশি হ'ত।”

“সে যা হোক, তুমি এ-বেলাই জিনিস-পত্র নিয়ে এলে না কেন? ও বেলা নিশ্চয় এনো।”

বিনয় বলিল, “আগে ছবিটা এঁকে নিই, তারপর সে সব কথা কইলেই হবে। মিস্ মিত্র তৈরী হয়ে রয়েছেন, তাঁকে অনর্থক বসিয়ে রাখব না।”

ছবিখানা যথাস্থানে রাখিয়া সরঞ্জামগুলা গুছাইয়া লইয়া বিনয় বলিল, “মিস্ মিত্র, আপনি দয়া ক'রে এবার একটু পাশ ফিরে বসুন।”

কমলা কিন্তু পাশ ফিরিয়া না বসিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল।

বিমূঢ়ভাবে দ্বিজনাথ বলিলেন, “কি হ'ল কমলা?”

ব্যাপারটা বিনয় বুঝিয়াছিল; বলিল, “কে আসছেন।”

পথের দিকে তাকাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া দ্বিজনাথ চিৎকার

করিয়া উঠিলেন, "আরে কে ও? সন্তোষ? এস, এস। ভাল আছ তো? অনেকদিন পরে!"

সন্তোষ হাসিতে হাসিতে বারান্দায় উঠিয়া দ্বিজনাথের পদধূলি লইয়া ছবির সামনে আসিয়া বলিল, "কমলার ছবি? চমৎকার হচ্ছে তো!" তারপর বিনয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনি আঁকছেন?"

উত্তর দিলেন দ্বিজনাথ। বলিলেন, "হ্যাঁ, ইনিই আঁকছেন। ইনি বিখ্যাত আর্টিস্ট্ মিস্টার বিনয়ভূষণ রায়।" বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মিস্টার সন্তোষকুমার চৌধুরী; আমার—আমার—আমার পরম আত্মীয়। পরে বলব অখন্।"

বিনয় ও সন্তোষ সহাস্যমুখে পরস্পরকে নমস্কার করিল।

১৭

সেদিন আর ছবি আঁকা হইল না। পথশ্রান্ত সন্তোষের পরিচর্যার দিকে দ্বিজনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; সেই সুযোগে বিনয় তাহার সাজ-সরঞ্জাম গুটাইয়া লইয়া এক সময়ে অন্তর্হিত হইল। যাইবার পূর্বে দ্বিজনাথের টেবিল হইতে এক টুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিল—"শ্রীচরণেষু, আজ রাত্রের ট্রেনে আমি কলকাতা যাব, সুতরাং ছবি-আঁকা উপস্থিত বন্ধ রইল। কতদিনের জন্যে তা বলতে পারছি নে, তবে সম্ভবত বেশি দিনেরই জন্যে। তাই যে টাকাটা আপনি আমাকে আগাম দিয়েছিলেন, সেটা সুকুমারের কাছে রেখে যাব, সে আপনাকে দিলে অনুগ্রহ ক'রে তা গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া, ছবি-আঁকা নিয়ে যে হাঙ্গামাটা আপনাদের ভোগ করতে হয়েছে অথচ যা উপস্থিত সার্থক হ'ল না, তার যে কি করব তা জানি নে। আশা করি, আপনার অমিত স্নেহ ও করুণার হিসাবে তার কাটান হবে। তা ছাড়া আর উপায় কি? ছবিটা আপাতত যেমন আছে থাক্, দেখব পরে কোনো সময়ে যদি তার গতি করতে পারি। আপনি আমার শ্রদ্ধাসহ প্রণাম গ্রহণ করবেন, এবং অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রণাম ঠাকুরমাকে ও নমস্কার মিস্ মিত্রকে জানাবেন। ইতি স্নেহাধীন শ্রীবিনয়ভূষণ রায়।" চিঠি লেখা শেষ হইলে কাগজখানা ভাঁজ করিয়া উপরে দ্বিজনাথের নাম লিখিয়া একটা কাগজ-চাপায় চাপিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

বিনয় চলিয়া যাইবার আধ ঘণ্টাটাক পরে দ্বিজনাথের হঠাৎ খেয়াল হইল যে, বিনয় নাই, চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি একেবারে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কখন গেল, কেন গেল, কাহাকে কি বলিয়া গেল

ইত্যাদি প্রশ্নে বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির হইয়া উঠিল। চাকররা বলিল, বহুক্ষণ পূর্বে সে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু যাইবার সময় তাহাদের কিছু বলিয়া যায় নাই। কমলা বলিল, কখন্ গিয়াছে তাহা সে জানে না; সুতরাং কেন সে গিয়াছে তাহাও জানে না। পদ্মমুখী বলিলেন, সে যে সেদিন আসিয়াছিল তাহাই তিনি জানেন না।

"তুমি কিছু জান সন্তোষ? যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

এই অনাবশ্যক প্রশ্নে পুলকিত হইয়া সহাস্যমুখে সন্তোষ বলিল, "আমার সঙ্গে দেখা হ'লে আপনার সঙ্গেও তো দেখা হ'ত।"

যুক্তির সারবত্তায় পরাজিত হইয়া অপ্রতিভ মুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা সত্যি।" মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল এই মনে করিয়া যে, সন্তোষের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার ফলে তাহার প্রতি যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহারই জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া সে চলিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা বাসা তুলিয়া চলিয়া আসিবার কথাটা পাকাপাকি হইতে পারিল না!—এই অনুশোচনায় নিজের প্রতি একটা বিরক্তি দেখা দিল, আর তাহারই সহিত দেখা দিল বিনয়ের প্রতি একটা সূক্ষ্ম অভিমান। মুখে প্রকাশ্যে বলিলেন, "আশ্চর্য ব্যাপার! চ'লে গেল, কিন্তু কিছু ব'লে গেল না?"

দূরে দাঁড়াইয়া কমলা পিতার এই কাতরোক্তি শুনিয়া মনে মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা কখ্খনো নয়, নিশ্চয় ব'লে গেছেন।' তাহার পর সন্তোষকে লইয়া দ্বিজনাথ পুনরায় ব্যাপৃত হইবামাত্র সে পিতার টেবিলে উপস্থিত হইয়া কাগজ-চাপায় চাপা বিনয়ের চিঠি দেখিতে পাইয়া নিজের অনুমান পূর্ণ হওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া খুলিয়া সে একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল; তাহার পর চতুর্থবার

আর একবার ভাল করিয়া পাঠ করিয়া যেমন চাপা ছিল তেমনিভাবে চাপিয়া রাখিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে প্রস্থান করিল। বিনয়ের চিঠির কথা কিন্তু দ্বিজনাথকে সে কিছুই জানাইল না।

মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হইবার পর কিছুক্ষণ গল্প-গুজবে কাটাইয়া অনিদ্রা-পীড়িত সন্তোষকে একটু বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিয়া দ্বিজনাথ যখন নিজের টেবিলের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, তখন বেলা দেড়টা। অভ্যাস অনুযায়ী দৈনিক খবরের কাগজখানা লইতে গিয়া চোখে পড়িল বিনয়ের চিঠি। খবরের কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া চিঠিখানা লইয়া চশমা বাহির করিয়া পড়িয়া দ্বিজনাথের মুখ সন্ধ্যাকাশের মতো আরক্ত আর কালো হইয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কমল! কমল!"

পাশের ঘরে কমলা এ আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিল; সে জানিত দ্বিজনাথের প্রবেশের অনতিবিলম্বেই এই ডাক পড়িবে।

পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ বাবা?"

ক্রোধ, বিস্ময়, বিরক্তি, দুঃখ—মুখমণ্ডলে একসঙ্গে ব্যক্ত করিয়া চিঠিখানা কমলার হাতে দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "কাণ্ডটা একবার দেখ।"

পঞ্চমবার চিঠিখানা পাঠ করিয়া ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কমলা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলার মন্তব্যের প্রত্যাশায় খানিকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করিয়া দ্বিজনাথ পুনরায় রুষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখলে একবার ব্যাপারখানা?—কি যে অপরাধ হয়েছে তা জানি নে, চললাম একেবারে রাত্রের গাড়িতে কলকাতা! রইল প'ড়ে তোমার ছবি আঁকা! তারপর কথা শোন।—আগাম দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে গেলাম, অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করবেন। আজকালকার ছেলেদের আত্মসম্মান-জ্ঞান এত বেশি টনটনে হয়েছে যে,

অপরের সম্মানের ওপর কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখা দরকার ব'লে তারা মনে করে না। কাজটা শেষ হ'ল না ব'লে তিনি সইবেন তাঁর করা পরিশ্রম, কিন্তু আমাকে ফেরত নিতে হবে আমার দেওয়া টাকা! দিয়ে ফেরত নেওয়া জিনিসটাকে এরা এতই সহজ মনে করে!—আশ্চর্য!"

কমলা বলিল, "কিন্তু বাবা, কাজ শেষ না ক'রে আগাম নেওয়া টাকা ফেরত না দিয়ে চ'লে যাওয়াও তো সহজ কথা নয়।"

উচ্চৈঃস্বরে দ্বিজনাথ বলিলেন, "কিন্তু চ'লে যেতে কে বলছে তাকে? চুক্তি ভেঙে চ'লে যাওয়া কি এতই সহজ কথা যে, গেলেই হ'ল? আইন নেই? আদালত নেই? হাকিম নেই? বিচার নেই? আমি তোমাকে ব'লে রাখছি কমল, এ আমি কখনই সইব না। আমি তাকে নিশ্চয় একটু শিক্ষা দোব।"

কমলা নিঃসন্দেহে জানিত, এ সমস্তই ফাঁকা আওয়াজ, ইহার মধ্যে গোটাও নাই ছর্‌রাও নাই যে, কোনো দিক দিয়া আঘাতের কোনো সম্ভাবনা আছে। বলিল, "তা তোমার যা ভাল মনে হয় ক'রো বাবা,—কিন্তু এই সুযোগে ছবি-আঁকা বন্ধ হ'লে এক রকম ভালই হয়।"

দ্বিজনাথ যেন ভিতর হইতে একটা আঘাত পাইয়া ঝাঁকি দিয়া উঠিলেন।—"ক্ষেপেছ তুমি। ওই ছবি আমি দশ দিনের মধ্যে শেষ করাব তবে নিরস্ত হব। আজ রাত্রের গাড়িতে কে কলকাতায় যায় তা আমি দেখছি।"

অলক্ষ্যে কমলার মুখমণ্ডলে নিশ্চিন্ততার একটি মৃদু হিল্লোল খেলিয়া গেল। বলিল, "বাবা, এখন তা হ'লে আসি?"

শান্তস্বরে দ্বিজনাথ বলিলেন, "এস।"

অপরাহ্ণ চারটার সময়ে বারান্দায় বসিয়া দ্বিজনাথ সন্তোষকে লইয়া চা পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে তাঁহার মোটর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কমলা বলিল, "গাড়িতে কি তুমি বেরুবে বাবা?"

"হ্যাঁ।"

"এই রোদ্দুরে কোথায় যাবে?"

"বিশেষ কোথাও নয়। এমনি একটু ঘুরে আসব।"

উচ্ছ্বসিত হাসি দমন করিয়া কমলা বলিল, "সুকুমারবাবুদের বাড়ির দিকে যাবে কি?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা হয়তো যেতেও পারি। কেন?"

মৃদুস্মিত মুখে কমলা বলিল, "একবার তা হ'লে আমি শোভার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতাম।"

একটু চিন্তা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার আজ গিয়ে কাজ নেই, সন্তোষ তা হ'লে নেহাত একলা পড়বেন।"

সহাস্যমুখে সন্তোষ বলিল, "আমিই বা একলা পড়ব কেন? আপনারা যদি যান আমিও তো আপনার সঙ্গে যেতে পারি।"

এ কথার উপর আর কোনো কথা বলা চলে না। অগত্যা দ্বিজনাথ বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে তোমরা শিগ্‌গির তৈরি হ'য়ে নাও, আমি প্রস্তুত আছি।"

উভয়ে গেল প্রস্তুত হইয়া আসিতে। সুটকেস্ হইতে একখানা

রেশমী পাঞ্জাবি বাহির করিয়া গায়ে দিয়া দুই মিনিটের মধ্যে বাহিরে আসিয়া সন্তোষ বলিল, "আমি প্রস্তুত।"

দ্বিজনাথ সমনোযোগে সন্তোষের বেশের পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পাঞ্জাবি আর ব্লাউসে অনেক তফাত—ব্লাউস এখনো পুরো অপ্রস্তুত। ব্লাউস যদি তার অচলতা দিয়ে পাঞ্জাবিকে টেনে না রাখত, তা হ'লে পাঞ্জাবি এতদিনে এগিয়ে গিয়ে আফগানি হ'য়ে উঠত।" বলিয়া স্বীয় রসিকতার উপভোগে হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মৃদু হাসিয়া সন্তোষ বলিল, "শুধু ব্লাউসই নয়,—তৎপরতার পক্ষে মেয়েদের মাথাও একটা মস্ত বাধা। অযথা মাথার চুলকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে তুলে তাকে গুছিয়ে নেবার সময়ে তৎপর পুরুষ-জাতের সত্যিই ধৈর্য নষ্ট হয়।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সেই সময়টায় তোমরা যদি নিজেদের দাড়ি গোঁফ কামিয়ে নাও তা হ'লে বোধ হয় উভয় পক্ষের অনুযোগের কোনো কারণ থাকে না। চাষা যখন ধান কাটে চাষা-বউ তখন গোছা বাঁধে;—মাঠের নিয়মটা মাথায় চাপালে মন্দ হয় না।"

সন্তোষ বলিল, "কিন্তু কাটতে যা সময় লাগে, বাঁধতে যে তার অনেক বেশি লাগে।"

দ্বিজনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সব সময়ে কিন্তু তা নয়। আমাদের বারের পি. ডি.-র কথা জান? পুরো একটি ঘণ্টা তার লাগে দাড়ি কামাতে। দাড়ি কামানোর জন্যে তার পয়সা কামানো হ'ল না। মক্কেল এসে ব'সে থেকে থেকে বিরক্ত হ'য়ে চ'লে যায়। কেউ সে কথা বললে বলে, 'দাড়ি কামানো নিজের হাতে, পয়সা কমানো বরাতে। বরাতে কামানোর চেয়ে নিজের হাতে কামানোই আমি বেশি পছন্দ করি। আমি দৈববাদী নই, পুরুষকারবাদী।' মিসেস্ পি. ডি.

একবার দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, 'তুমি যদি ও-রকম ক'রে এক ঘণ্টা ধ'রে দাড়ি কামাও তা হ'লে আমি তোমারই ক্ষুরে মাথা মুড়োব।' তাতে বলেছিল, 'অমন কার্যটি ক'রো না—ক্ষুর ভোঁতা হ'য়ে গেলে তোমার দুঃখের কারণ বেড়েই যাবে।" বলিয়া অপরিমিত উচ্ছ্বাসের সহিত হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কমলা ফিরিয়া আসিল—যে বেশে যে অবস্থায় গিয়াছিল, ঠিক সেই বেশে সেই অবস্থায়। দ্বিজনাথ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "এ কি কমলা! এখনো তুমি একটুও তৈরি হও নি! তোমার মতলব কি বল তো?"

অপ্রতিভমুখে কমলা বলিল, "আমার তৈরি হ'তে দেরি হবে বাবা; তোমাদের তাড়া আছে, তোমরা যাও।"

হাসিতে হাসিতে দ্বিজনাথ বলিলেন, "এ বিবেচনাটুকু আর একটু আগে করলেই তো ভাল করতে মা।" তাহার পর সন্তোষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার তাড়া সত্যিই আছে, কিন্তু তোমার কোনো তাড়া নেই। তুমি একটু অপেক্ষা কর, কমলা তৈরি হ'য়ে নিক। ততক্ষণে রোদ্দুরও প'ড়ে যাবে, তারপর পাহাড়তলী দিয়ে রেল-লাইনের ধারে ধারে দুজনে একটু বেড়িয়ে এসো। ভারি চমৎকার লাগবে।" কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল কমল?"

কোনো কথা না বলিয়া কমলা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অপাঙ্গে কমলার নিঃশব্দ আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্তোষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলুন, আপনার সঙ্গেই আমি যাই।"

কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমার সঙ্গেই যাবে?"

"মন্দ কি?"

কন্যার সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়ার চেয়ে কন্যার পিতার সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া মন্দ—এ কথা প্রকাশ্যভাবে খুলিয়া বলিতে দ্বিজনাথের সঙ্কোচ হইল। বলিলেন, "তবে তাই চল।" গাড়িতে উঠিয়া কমলাকে বলিলেন, "সন্তোষ এসেছেন, আজ রাত্রে তিন-চার জনকে খেতে বলতে পারি। সেই বুঝে পিসিমাকে খাবারের ব্যবস্থা করতে ব'লো।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের বলবে বাবা?"

"বলব কি-না তাই এখনও স্থির করি নি—তা কাদের বলব কি ক'রে বলি?"

পিতার এই স্বচ্ছ অকুটিল ছলনায় স্বেচ্ছায় প্রতারিত হইয়া কমলা বলিল, "জানতে পারলে সেই মতো ব্যবস্থা করতাম।"

তাঁর প্রচ্ছন্ন অভিলাষ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী কমলা ধরিতে পারে নাই—এই আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "শোন কথা! জানতে পারলে আবার কি ব্যবস্থা করবে! সাধারণ ভদ্রলোককে খাওয়াতে হ'লে যেমন ব্যবস্থা করতে হয়, তাই করবে। বুঝলে?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "বুঝেছি।"

"আচ্ছা, চলো।"

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

গেটের কাছে আসিয়া মহবুবকে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সোজা কার্সটেয়ার্স টাউনে সুকুমারবাবুর বাড়ি চল—একটু জোরে।"

গেট পার হইয়া মুখ ফিরিয়া গাড়ি বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

সুকুমারের গৃহে যখন দ্বিজনাথ উপস্থিত হইলেন, তখন সুকুমার ও বিনয় দুই বন্ধু দীর্ঘকালব্যাপী তর্ক এবং বচসা হইতে সদ্য-নিবৃত্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া বারান্দায় বসিয়া ছিল। দূরে দ্বিজনাথের মোটর দেখিতে পাইয়া উল্লসিত হইয়া সুকুমার বলিল, "ঠিক হয়েছে। এবার জব্দ।"

বিনয় কোনো কথা বলিল না, কিন্তু আবার একটা আসন্ন বাদানুবাদের আশঙ্কায় তাহার মুখে একটা সুস্পষ্ট বিরক্তির ছায়াপাত হইল।

মোটর সম্মুখে আসিয়া থামিতেই উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল—সুকুমার তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সাগ্রহে বলিল, "আসুন মিস্টার মিটার, আসুন।"

গাড়ির দরজা খুলিতে খুলিতে সুকুমারের দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "অ্যারেস্ট্ করতে এসেছি।"

সহাস্যমুখে সুকুমার বলিল, "তা বুঝেছি। বেশ করেছেন।"

বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া বিনয়ের কাঁধের ওপরটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "সাহস তোমার কম নয় তো হে?—হাইকোর্টের একজন দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টারের সঙ্গে ব্রিচ্ অফ্ কন্‌ট্রাক্ট করতে প্রবৃত্ত হও?" বলিয়া হো-হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

হাসির আকার এবং প্রকার দেখিয়া বিনয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যে কথা দ্বিজনাথ ভাষায় বলিয়াছিলেন তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু এ রকম হাসিকে কাটাইয়া উঠা কঠিন।

সুকুমারের সহিত সন্তোষের পরিচয় করিয়া দিয়া দ্বিজনাথ সন্তোষকে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা দুজনে পাঁচ মিনিট পরস্পরে আলাপ-পরিচয় কর—আমি ততক্ষণে আমার এই ইয়ং ফ্রেণ্ড্‌টির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিই।" বলিয়া বিনয়কে হাত ধরিয়া টানিয়া বারান্দার এক প্রান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন, "কেনই বা হঠাৎ আমাদের বাড়ি থেকে তুমি অমন ক'রে তখন চ'লে এলে, আর কেনই বা আজকে কলকাতা চ'লে যেতে চাচ্ছ আমাকে বল। লুকিয়ো না—সত্যি কথা বল।"

দ্বিজনাথের প্রশ্ন শুনিয়া এবং প্রশ্নের ভঙ্গি দেখিয়া বিনয় বিহ্বল হইয়া নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বিমূঢ় ভাবে

বলিল, "বিশ্বাস করুন, তা আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি নে। কিন্তু আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই।"

"আচ্ছা, আর দিন দুই থাক—তারপরে হয়তো সব ঠিক বুঝতে পারবে। আমার কথা শোন, অবাধ্য হ'য়ো না। ছবি তোমাকে আঁকতে হবে না।" ছবির কথা হইতে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল—সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, টাকা তুমি ফেরত দিতে চেয়েছ কোন্ বিবেচনায়? টাকা যদি তুমি ফেরত দাও তো তোমার পরিশ্রম আমি কি ক'রে ফেরত দিই বল?"

অপ্রতিভ হইয়া বিনয় বলিল, "এখন সে সব কথা থাক্—পরে যা হয় হবে। আচ্ছা, আপনার আদেশে আমি উপস্থিত যাওয়া বন্ধ করলাম, কিন্তু আপাতত আমাকে সুকুমারের বাড়ি থাকতেই অনুমতি দিন।"

হর্ষোৎফুল্লমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, তাই থাকো।"

১৯

সুকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার বন্ধুর আজ কলকাতা যাওয়া বন্ধ করলাম সুকুমার।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সুকুমার বলিল, "ভারি খুশি হলাম মিস্টার মিটার।" তাহার পর বিনয়ের দিকে চাহিয়া সে মুখের এমন একটু ভঙ্গি করিল, যাহার নিগূঢ় একটা অর্থ কল্পনা করিয়া বিনয় অপ্রতিভ হইয়া উঠিল।

বিনয়ের এই বিমূঢ় ভাবটুকু সন্তোষের চোখে ধরা পড়িল; সে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি আজ কলকাতা যাবার ইচ্ছে করেছিলেন না-কি?"

সংক্ষেপে বিনয় বলিল, "হ্যাঁ।"

সুকুমার বলিল, "শুধু ইচ্ছেই করেন নি, বন্দোবস্তও করছিলেন। সুটকেস্ গোছানো হ'য়ে গেছে, পেন্টিঙের সাজ-সরঞ্জাম সব প্যাক্ করা তৈয়ের, শুধু বিছানাটা বাঁধতে বাকি।"

সন্তোষ বলিল, "তা হ'লে ছবির কি হ'ত?—কমলার ছবি তো এখনো শেষ হয় নি! ফিরে এসে আবার শুরু করতেন?"

অনৌৎসুক্যের সহিত বিনয় বলিল, "তাই হয়তো করতাম।"

সন্তোষ বলিল, "না বিনয়বাবু, তা করবেন না, ছবিটা শেষ করবার মধ্যে বন্ধ দেবেন না। আজ সমস্ত দিন আমি শুধু ছবিটাই দেখেছি—ছবিটা রিয়েলি ওণ্ডারফুল হচ্ছে। এ রকম ছবি শেষ না করা শুধু ক্রাইম নয়, সিন।"

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া বিনয়ের শিল্পী-হৃদয়ে একটা আনন্দের

মৃদু হিল্লোল খেলিয়া গেল; সন্তোষের দিকে চাহিয়া ঈষৎ স্মিতমুখে সে বলিল, "ভাল লেগেছে আপনার?"

সন্তোষ বলিল, "ভাল লেগেছে বললে কিছুই বলা হয় না—ভাল লাগার চেয়ে ঢের বেশি আমার বিস্ময় লেগেছে। ছবিটা ঠিক যেন একটা প্যারাডক্স্—ষোলো আনা বাস্তবের মধ্যে যে ষোলো আনা কল্পনা আশ্রয় পেতে পারে—এ আগে আমি জানতাম না। ছবির মধ্যে কমলাকে আপনি অনুকরণ করেন নি, সৃষ্টি করেছেন। কমলাকে আপনি যেমন দেখিয়েছেন, কমলা নিজে বোধ হয় নিজেকে তেমন দেখাতে পারেন না।"

সুকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল, "ক্ষমা করবেন সন্তোষবাবু, আপনি যা বলছেন তাও যেন একটা প্যারাডক্স হ'য়ে উঠছে,—ষোলো আনা সুখ্যাতির মধ্যে যে ষোলো আনা নিন্দে আশ্রয় পেতে পারে—এও আগে আমরা জানতাম না।"

সুকুমারের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। সহাস্যমুখে সন্তোষ বলিল, "ষোলো আনা নিন্দে আপনি কোথায় পেলেন সুকুমারবাবু? আমি তো ষোলো আনা সুখ্যাতিই করছি—আন্অ্যাডাল্টারেটেড।"

সুকুমার বলিল, "মিস্ মিত্র নিজেকে নিজে যেমন দেখাতে পারেন না, বিনয় যদি তাঁকে তেমন দেখিয়ে থাকে তা হ'লে বুঝতে হবে, বিনয়ের পোর্ট্রেট আঁকা সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। ফুল দেখে ফল আঁকা নিশ্চয়ই নিন্দের কথা।"

সহাস্যমুখে সন্তোষ বলিল, "ও! সেই কথা বলছেন? কিন্তু উনি ফুল দেখে ফল আঁকেন নি, বড়ি দেখে সোল এঁকেছেন। ভাষায় দখল না থাকার জন্যে কথাটা ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারি নি।"

সুকুমার বলিল, "যিনি নিন্দেকে সুখ্যাতির রূপ, আর সুখ্যাতিকে নিন্দের রূপ দিতে পারেন তাঁর ভাসায় দখল নেই—এ কথা আমরা কেউই স্বীকার করব না।" তাহার পর বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার উপর চ'টো না বিনয়, ক্যালকাটা হাইকোর্টের একজন কাউন্সেলকে দিয়ে ভাল ক'রে তোমার সুখ্যাতি করিয়ে নিচ্ছি,—কৃতজ্ঞই হ'য়ো। বড়ি দেখে সোল আঁকতে পারে এমন উঁচুদরের শিল্পী, শুধু আমাদের দেশে নয়, কম দেশেই বেশি আছে।"

বিনয়ের ছবি আঁকার প্রশংসা শুনিয়া দ্বিজনাথ মনে মনে অতিশয় আনন্দ বোধ করিতেছিলেন; উৎসাহভরে বলিলেন, "সে কথা মিছে নয় সুকুমারবাবু, তোমার এই বন্ধুটি সত্যি-সত্যিই একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট্। বন্ধুগর্বে তুমি গর্বিত হ'তে পার।"

প্রীতিভরে বিনয়ের দিকে চাহিয়া সহাস্যমুখে সুকুমার বলিল, 'আর বেশি বলবেন না স্যর্—বন্ধু আবার নিজ গর্বে গর্বিত না হন।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

অন্তঃপুরে শৈলজা ভাঁড়ার-ঘরে ঘি-ময়দা বার করিতে ঢুকিয়াছিল, সুকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে ডাকিল, "ওগো, শুনছ?"

মুখ না ফিরাইয়াই শৈলজা বলিল, "এই তো শুনলাম।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বলিল, "কি শুনলে?"

"তোমার কণ্ঠস্বর।"

বিরক্তির ভান করিয়া সুকুমার বলিল, "সময় নেই অসময় নেই, পরিহাসটি সব সময়েই আছে।"

পিছন ফিরিয়া সুকুমারের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শৈলজা বলিল, "কোনো কথা না ব'লে 'শুনছ' জিজ্ঞাসা করাই বা কি কম পরিহাস শুনি? কিছু না বললে কিছু শোনা যায়?"

সুকুমারের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল; বলিল, "তবে কী বলতে হবে?—এবার থেকে তা হ'লে বলব, 'ওগো, অনুমান করছ'?"

শৈলজা বলিল, "তা হ'লে তবু তার একটা মানে থাকবে—যা হোক একটা উত্তর দেওয়া যাবে।"

সহসা মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া সুকুমার বলিল, "ওগো, অনুমান করছ?"

উদ্যত হাসি কোনো প্রকারে রোধ করিয়া গম্ভীরমুখে শৈলজা বলিল, "করছি।"

"কি অনুমান করছ?"

শৈলজা বলিল, "অনুমান করছি, জন চারেকের মতো চা আর জলখাবার তৈরি করতে হবে। সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে।"

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নীরবে চাহিয়া থাকিয়া গভীর বিস্ময়ের সুরে সুকুমার বলিল, "সত্যি শৈলজা, তোমার এত বুদ্ধি, তুমি যদি—"

সুকুমারের কথা শেষ হইতে না দিয়া শৈলজা বলিল, "শৈলজা না হ'য়ে শৈলেন্দ্র হতাম তা হ'লে খুব ভাল হ'ত, না? স্বাতী নক্ষত্রের জল গজ দন্তে না প'ড়ে ষাঁড়ের শিঙে পড়েছে। আচ্ছা, সে সব কথা যাক, এখন ওই যে নতুন বাবুটি এসেছেন তাঁকে একবার তোমার আপিস-ঘরে ডেকে দাও তো।"

সবিস্ময়ে সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি হবে?"

"কথাবার্তা হবে।"

"কার সঙ্গে?"

"আমার সঙ্গে।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ নয়,—ওঁকে আমি চিনি, উনি আমাদের ফন্তুদাদা।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সুকুমার বলিল, "আরে না না, ফন্তুদাদা নয়, ও সন্তোষ।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সন্তোষ তা জানি—ওঁর ডাকনাম ফন্তু। মহিম চৌধুরীর ছেলে, ব্যারিস্টারি করে।"

সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, মানলাম ও তোমার ফন্তুদাদা,—তবু কি রকম দাদা শুনে রাখি—নিজের দিকের হিসেবটাও জেনে রাখা ভাল।"

শৈলজা বলিল, "আমার বড়দিদির ছোট দেওরের শালা।"

"ওঃ! তবে তো নিকট আত্মীয়।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িয়া শৈলজা বলিল, "একমাত্র সম্পর্কে নিকট হ'লেই বুঝি আত্মীয়তায় নিকট হয়?" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া হাসিমুখে বলিল, "কিন্তু সম্পর্কেও নিকট হবার একবার উপক্রম হয়েছিল।"

মুখে চোখে একটা সন্ত্রাসের ভাব উৎপাদন করিয়া সুকুমার বলিল, "তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয় নি তো?"

একমুখ হাসিয়া শৈলজা বলিল, "ঠিক তাই। হয়েছিল।"

"তবে তো ও-ব্যক্তির প্রতি তোমার মনে একটু মমতা লেগে আছে?"

"মমতা লেগে আছে, না, হাতী লোগ আছে!"

"স্নেহ?"

"মিছে ব'কো না বলছি।"

"করুণা?"

শৈলজা তর্জন করিয়া উঠিল, "আঃ, চুপ করবে কি-না বল?"

তদ্গতভাবে সাগ্রহে সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "না না, লজ্জা কিসের, বলই না ছাই। বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্যে জিজ্ঞেস করছি।"

"রেখে দাও তোমার বৈজ্ঞানিক তথ্য। আমি চললাম আপিস-ঘরে, ডেকে দিতে হয় তো দাও।" কপট ক্রোধভরে শৈলজা প্রস্থান করল।

বাহিরে আসিয়া সন্তোষের কাঁধে হাত দিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে সুকুমার বলিল, "আপনার সঙ্গে জনান্তিকে একটু কথা আছে।"

আগ্রহভরে সন্তোষ বলিল, "উঠে যাব?"

"এলে ভাল হয়।"

একটু দূরে গিয়া সুকুমার বলিল, "এ বাড়িতে আপনার একজন আত্মীয়া আছেন—ওই পাশের ঘরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

বিস্মিত হইয়া সন্তোষ বলিল, "আমার আত্মীয়া! কে বলুন তো?"

সুকুমার বলিল, "কার কে বলব বলুন; আমার কে, না, আপনার কে?"

"আপনার কে বললে তো ঠিক বুঝতে পারব না—আমার কে তাই বলুন।"

একটু চিন্তা করিয়া সুকুমার বলিল, "আপনার তিনি কে হন বলা কঠিন, তবে আপনি তাঁর ছোট দেওরের বড়দিদির শালা।"

সম্পর্ক নিরূপণ করিবার জন্য আধ মিনিট ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিয়া মৃদু হাসিয়া সন্তোষ বলিল, "আপনি ভুল করছেন;— বড়দিদির শালা আবার কি?"

অপ্রতিভ হইয়া সুকুমার বলিল, "তাও তো বটে। শালীও তো হয় না। তা অত হাঙ্গামায় দরকার কি? আমি ভুল করলেও আপনি তো আর ভুল করবেন না, ঘরের ভিতর যান, চিনতে না পারেন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সন্তোষ বলিল, "সেটা কি ভাল হবে?"

সুকুমার বলিল, "সেটা ভাল হবে না যদি মনে করেন, তা হ'লে না হয় বেরিয়ে আসবেন না।"

ব্যস্ত হইয়া সন্তোষ বলিল, "না না, আমি তা বলছি নে। যাওয়াই ভাল হবে না বলছি।—আচ্ছা, আপনার তিনি কে হন?"

"স্ত্রী হন।"

"তাঁর নাম বলতে আপত্তি আছে?"

"কিছুমাত্র না—তাঁর নাম শৈলজা।"

নিবিড় ভাবে চিন্তা করিয়া সন্তোষ বলিল, "মিষ্ট্রি!"

"মিষ্ট্রি কিছুই নয়, দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।" বলিয়া সুকুমার সন্তোষের পিঠে হাত দিয়া তাহাকে পাশের ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিল।

'মিষ্ট্রি' কথাটা একটু জোরে উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া দ্বিজনাথ এবং বিনয়ের কানেও পৌছিয়াছিল। সন্তোষ ঘরে প্রবেশ করিলে উদ্বিগ্নমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, 'মিষ্ট্রি তো আমাদের পক্ষ থেকেও কম বোধ হচ্ছে না সুকুমারবাবু। সন্তোষের সঙ্গে খানিকক্ষণ কি বাদানুবাদ ক'রে অবশেষে তাকে ঘরে বন্দী করলে কেন বল দেখি?"

সহাস্যমুখে সুকুমার বলিল, "ও-ঘরে সন্তোষবাবুর একজন আত্মীয়া আছেন।"

"সন্তোষের আত্মীয়া তোমার বাড়ি? কে বল তো?"—দ্বিজনাথের ঔৎসুক্যের পরিসীমা ছিল না।

একটু ইতস্তত করিয়া সুকুমার বলিল, "আপনার বউমা।"

"বউমা! তাঁর সঙ্গে সন্তোষের কি সম্পর্ক?"

করুণভাবে সুকুমার বলিল, "সম্পর্কটা একটু জটিল, কিন্তু খুব নিকট।

সুকুমারের কথায় দ্বিজনাথ ও বিনয় উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া হাস্যোৎফুল্লমুখী শৈলজাকে একমুহূর্ত নিবিষ্টভাবে দেখিয়া সন্তোষ বলিয়া উঠিল, "আরে, আরে, এ যে আমাদের টুলু! টুলু, তোমাকে যে এখানে এমনভাবে দেখব তা স্বপ্নেও ভাবি নি। এখানে তোমরা বেড়াতে এসেছ, না, এই তোমার শ্বশুরবাড়ি?"

সহাস্যমুখে শৈলজা বলিল, "শ্বশুরবাড়ি।"

"কিন্তু তোমার বিয়ের সময় তো তোমার শ্বশুরবাড়ি ছিল কলকাতায়?"

"হ্যাঁ, তখন আমার শ্বশুর কলকাতায় থাকতেন—এ বাড়ি ভাড়া দেওয়া ছিল। সে কথা যাক, তুমি এখানে কোথায় উঠেছ ফন্তুদাদা? দ্বিজনাথবাবুর বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"ওঁদের সঙ্গে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?"

সন্তোষের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "সম্পর্ক এমন বিশেষ কিছু নেই—দ্বিজনাথবাবুর আমি জুনিয়ার।"

"তোমার বিয়ে হয়েছে ফন্তুদাদা?"

"না, হয় নি।"

উৎফুল্ল এবং উৎসুক হইয়া শৈলজা বলিল, "দ্বিজনাথবাবুর মেয়ে কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কোনো কথা আছে না-কি?"

অল্প হাসিয়া সন্তোষ বলিল, "তুমি যে আমার সমস্ত খবরই নিয়ে ফেলতে চাও,—এবার তোমার খবর কিছু বল।"

প্রশ্ন অতিক্রম করা হইতেই প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিয়া শৈলজা সহর্ষে বলিল, "চমৎকার মেয়ে কমলা। রূপে গুণে এমন একটি মেয়ে

সহসা পাওয়া যায় না। তুমি দেরি ক'রো না ফন্তুদাদা, যত শিগগির সম্ভব বিয়ে হ'য়ে যাক।"

শৈলজার কথা শুনিয়া সন্তোষ হাসিতে লাগিল; বলিল, "শুধু কমলা চমৎকার হ'লেই তো হয় না টুলু, তোমার ফন্তুদাদারও তো চমৎকার হওয়া দরকার। পছন্দ তো শুধু আমারই নেই!"

শৈলজাও হাসিতে হাসিতে বলিল, "পছন্দ যদি অন্য কারো থাকে তো সেও তোমাকে অপছন্দ করবে না ফন্তুদাদা। দাঁড়ি-পাল্লার একদিকে তোমাকে আর অপরদিকে কমলাকে বসালে কোন্ দিক নেবে যায় তা বলা কঠিন।"

এমন সময় দ্বারপার্শ্বে শোভাকে দেখা গেল,—সে ইঙ্গিতে এমন কিছু বলিল যাহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর শোভাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে শোভা, প্রণাম ক'রে যা—আমার দাদা।" সন্তোষের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার ছোট ননদ।"

শোভা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া সন্তোষকে নত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্কোচে সুষমায় মণ্ডিত এই স্নিগ্ধাভ কিশোরী মূর্তি দেখিয়া সন্তোষের দুইটি চক্ষু জুড়াইয়া গেল। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার হিসেবে আমি তো এঁর দাদা হই টুলু?"

হৃষ্টমুখে শৈলজা বলিল, "তা তো নিশ্চয়ই।"

সন্তোষ বলিল, "এমন লক্ষ্মীমূর্তি বোন পেলে কার না দাদা হ'তে লোভ হয়!"

প্রসন্ন হইয়া শৈলজা হাসিতে লাগিল।

শোভা চলিয়া গেলে শৈলজা বলিল, "বিনয়বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে তো ফন্তুদাদা?"

"হয়েছে বইকি।"

"আমার ভারি ইচ্ছে বিনয়বাবুর সঙ্গে শোভার বিয়ে দিই।"

একটু চিন্তা করিয়া সন্তোষ বলিল, "এ কি শুধু তোমারই ইচ্ছে, না আর কারও ইচ্ছের সঙ্গে তোমার ইচ্ছের যোগ হয়েছে?"

মৃদু হাসিয়া শৈলজা বলিল, "না, শুধু আমারই ইচ্ছে নয়।"

"বিনয়বাবুর ইচ্ছে আছে?"

শৈলজা বলিল, "তা থাকলে আর ভাবনা কি ছিল!"

"ইচ্ছেটা অন্য কোনো জায়গায় বাঁধা আছে না-কি তা হ'লে?"

সংশয়তীক্ষ্ণ নেত্রে একবার সন্তোষের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া শৈলজা বলিল, "পরের ইচ্ছের কথা ঠিক কি ক'রে বলি বল?" তাহার পর সন্তোষকে কোনো অধিকতর কূট প্রশ্ন করিবার আর অবকাশ না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি বাইরে গিয়ে ব'স ফস্তুদা, আমি চললাম তোমাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বিনয়, সুকুমার, শৈলজা এবং শোভাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একেবারে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দ্বিজনাথ বাড়ি ফিরিলেন।

মোটরের হর্ন শুনিয়া কমলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আয়তনে মোটরখানা বেশ বড় হইলেও আরোহীর সংখ্যা দেখিয়া কমলার হাসি পাইল। সে যেন তাহার বাবার আগ্রহেরই সরল অনুপাত।

গাড়ি হইতে নামিতে নামিতে সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "এখন বুঝতে পারলে তো কমলা, কাদের আনতে গিয়েছিলাম?"

সপুলক হাস্যে কমলার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল; ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, "পারলুম।"

—"বিনয়কে ধ'রে এনেছি,—তোমার শোভাকেও নিয়ে এসেছি। কেমন, খুশি তো?"

দ্বিজনাথের এই দু-ফলা প্রশ্নে কমলা বিপদে পড়িয়া গেল। উত্তরে 'খুশি' বলিলে কেবলমাত্র শোভাতেই সে কথা শেষ না হইয়া বিনয় পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে; পক্ষান্তরে, কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে শুধু সুরীতি-বিরুদ্ধই হয় না, সে মৌনকে বিনয়কুমার-সংশ্লিষ্ট সঙ্কোচ বলিয়াও ভুল করা যাইতে পারে।

এই উভয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে কমলা শৈলজার দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "এই যে বউদিদিও এসেছেন!"

দ্বিজনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, তুমি যাদের কথা ভাব নি তাদেরও আমি এনেছি।"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া কমলার হাসিও পাইল, রাগও ধরিল; মনে মনে বলিল, 'বাবার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে!' প্রকাশ্যে বলিল, "আমি তো কারুর কথা'ই ভাবি নি বাবা। আমি শুধু

বলেছিলাম, তুমি যদি শোভাদের বাড়ি যাও তো আমি শোভাকে দেখতে যাব।”

অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া কমলা দেখিল, বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি একান্ত মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে; চোখের কোণে একটা যেন কি ভাব—তাহা কৌতুকও হইতে পারে, কৌতূহলও হইতে পারে। চোখাচোখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইয়া অপর দিকের দরজা খুলিয়া বিনয় নামিয়া পড়িল।

কমলা বুঝিল, আর কেহ বুঝুক না বুঝুক, বিনয় তাহার মনের গুপ্ত কথাটুকু বুঝিতে পারিয়াছে;—তাহারও অন্তরালে প্রাণের যে গুপ্ততর কথাটুকু আছে হয়তো তাহাও বুঝিতে ভুল করে নাই। শোভাকে ও শৈলজাকে লইয়া কমলা বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া পদ্মমুখী একরাশ কিস্‌মিস্ লইয়া বোঁটা ছাড়াইতেছিলেন, শৈলজা আসিয়া পদ্মমুখীকে প্রণাম করিয়া পাশে মাটিতে বসিয়া নিজের সামনে অর্ধেক কিস্‌মিস্ টানিয়া লইল।

ব্যস্ত হইয়া পদ্মমুখী বলিলেন, “না না, তুমি কষ্ট ক'রো না ভাই বউদিদি। তোমরা তিনজনে বেড়িয়ে বেড়াও, না হয় কোথাও ব'সে গল্প-টল্প কর।”

হাসিমুখে শৈলজা বলিল, “গল্প করব ব'লেই তো আপনার কাছে বসলাম ঠাকুমা।”

কমলা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি একখানা আসন লইয়া আসিয়া বলিল, “বসবে তো একবার ওঠ বউদিদি। দেখ দেখি, ভাল কাপড়খানার কি দুর্দশা করলে!”

আসনখানার দিকে তাকাইয়া শৈলজা বলিল, “কাপড়খানার চেয়ে

আসনখানা আরও ভাল। কাপড় তো নষ্ট হয়েইছে, আসনখানা আর নষ্ট করি কেন?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শৈলজাকে ঠেলিয়া সরাইয়া আসনের উপর বসাইয়া কমলা আর দুইখানা আসন আনিয়া পাতিল।

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "ও দুটোয় কি হবে?"

কমলা বলিল, "শোভা আর আমি বসব।"

মাথা নাড়িয়া শৈলজা বলিল, "তোমাদের এখানে বসা হবে না, তোমরা অন্য কোথাও গিয়ে গল্প-টল্প কর।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "তোমাদের গল্প শুনব ব'লেই তো আমরা এখানে বসছি বউদিদি।"

চাপা হাসি হাসিয়া শৈলজা বলিল, "আমরা এখানে এমন গল্প করব যা শুনলে তোমরা পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।"

কমলা বলিল, "বেশ তো, তা হ'লে নিরুপায় হ'য়ে আমরা এখানে ব'সেই থাকব।"

পদ্মমুখী বলিলেন, "আমরা তোদের বরের গল্প করব।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "বেশ চমৎকার কথা! মাথা নেই তবু মাথা ব্যথা।"

পদ্মমুখী বলিলেন, "এখন যে তাই হয়েছে ভাই। আমাদের কালে আগে মাথা হ'ত, তারপর মাথা ব্যথা হ'ত; এখন আগে মাথা ব্যথা হয়, তারপর মাথা হয়। আমরা বিয়ে ক'রে ভালবাসতাম, তোরা ভালবেসে বিয়ে করিস।"

এ কথার মধ্যে একটু গোপন দংশন ছিল, যাহা কমলার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পদ্মমুখীর অন্তরের ভিতর সন্তোষের জন্য একটি স্নেহের স্বচ্ছ ধারা প্রবাহিত ছিল; সন্তোষের সহিত কমলার প্রস্তাবিত বিবাহের পক্ষে

বিনয় যে দিন দিন বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে, নারী-চিত্তের সহজ বুদ্ধির দ্বারা ইহা তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেজন্য মনের মধ্যে ক্ষোভের সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে ইশারায় তিনি কমলাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কিছু ফল হইত না তাহাও বুঝিতেন। সে দিক দিয়া হতাশ হইয়া অগত্যা তিনি সিংহলে পত্র লিখিয়া বিমলাকে এ বিষয়ে জানাইয়াছিলেন। সে চিঠির এখনো উত্তর আসে নাই, কিন্তু আসিবার সময় হইয়াছে। পদ্মমুখীর ভরসা ছিল, সন্তোষের প্রতি বিমলার যে প্রবল আকর্ষণ আছে তাহাতে তিনি ইহার একটা উপায় নিশ্চয় করিবেন।

কমলা দেখিল, সুবিধা পাইয়া পদ্মমুখী যে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে বন্ধ করাও যাইবে না, সহ্য করাও চলিবে না; অতএব এ অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নই শ্রেয়। শোভার হাত ধরিয়া টানিয়া সে বলিল, "চল ভাই শোভা, মানে—আমরা আমাদের কাল নিয়ে স'রে পড়ি।" যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, "তোমাদের কালে ভালবাসা ছিল না পদ্মঠাকুমা। বিয়ে ক'রে তোমরা ভালবাসতে না, ভয় করতে,— বড় জোর ভক্তি করতে।"

অন্য বিষয়ে পদ্মমুখীর যতই সহিষ্ণুতা থাকুক, নিজ কালের নিন্দা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না—এ তথ্যটুকু কমলার জানা ছিল, তাই যাইবার সময় সে এই সামান্য বাণটুকু নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

কমলাকে নাগালের মধ্যে না পাইয়া শৈলজার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাইয়া পদ্মমুখী বলিলেন, "শোন কথা! আমাদের কালে ভালবাসা ছিল না! আমাদের কালে যা ছিল, তোদের কালে তার সিকি আছে? আমাদের কালে টাকায় দেড় মণ চাল আর আড়াই সের ঘি ছিল, আর বলে কি না—আমাদের কালে ভালবাসা ছিল না!"

সত্যিযুগে ভালবাসা ছিল না, আর যত ভালবাসা এই কলিযুগে!" একান্ত বর্তমান কাল ছাড়া অন্য সমস্ত কালকে পদ্মমুখী তাঁর নিজের কাল বলিয়া গণ্য করিতেন।

শৈলজা বলিল, "ঠাক্‌মা, আপনি শোনেন কেন ওদের কথা? ভালবাসার মর্ম ওরা কি বোঝে? ভাল লাগাকে ওরা ভালবাসা বলে; —চোখের জিনিসকে মনের ব'লে ভুল করে।"

শৈলজার কথা শুনিয়া পদ্মমুখী অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং শৈলজার নিকট হইতে উৎসাহ এবং ইঙ্গিত পাইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে মনখানি তাহার সম্মুখে অকপটে খুলিয়া ধরিলেন। দেখা গেল, উভয়ের আন্তরিক স্বার্থে বিরোধ তো নাই-ই, মৈত্রী সম্পূর্ণ আছে। উভয়ে পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যাহাতে কমলার সহিত সন্তোষের এবং শোভার সহিত বিনয়ের বিবাহ হয়—সে বিষয়ে উভয়ে কোনো চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

পদ্মমুখী বলিলেন, "তুমি কি মনে করছ ভাই, আমি নিশ্চিন্ত আছি? আজ এরই মধ্যে দুপুরবেলা সন্তোষ শুতে গেলে তার কানে একটু মন্ত্র দিয়ে এসেছি।"

প্রফুল্ল মুখে শৈলজা বলিল, "কি মন্ত্র দিলেন ঠাক্‌মা?

সহাস্যমুখে পদ্মমুখী বলিলেন, "ফুস্ মন্ত্র! আমি বললাম—রত্ন যদি পেতে চাও ভাই, তা' হ'লে দেরি না ক'রে যত শিগগির পার নিজের বাক্সে পুরে চাবি দাও। সংসারে চোর-ডাকাতের অভাব নেই।"

সাগ্রহে শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে ফন্তুদাদা কি বললেন?"

পদ্মমুখী বলিলেন, "কি জানি ভাই, তোমাদের আজকালকার অত সাজানো কথার মর্ম আমরা ঠিক বুঝতে পারিনে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, ভাবনায় মুখখানা হ'য়ে গেল ফেক্‌সে! আহা, ছেলেটা নিজের

বেলায় ভারি আল্‌গা—মনটা যেন একেবারে গঙ্গাজল। তুমি দেখো, চিরকাল অন্য লোকে ওর মুখের গ্রাস কেড়ে খাবে।"

শৈলজা কিছু বলিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে কে যেন বলিল—সত্যি।

২১

ভিতরে যখন দুইটি সহৃদয়া রমণী একান্ত আগ্রহে দুইজন পুরুষ এবং দুইটি নারীর ভবিষ্যৎ লইয়া চিন্তা এবং পরামর্শ করিতেছিলেন, বাহিরে তখন প্রবল ভাবে চলিতেছিল নারী-অধিকার বিষয়ে তর্ক।

পদ্মমুখী এবং শৈলজার নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া কমলা শোভাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসিল। পাঁচ মিনিট গল্প করিল, গল্প ফুরাইয়া গেল; মিনিট পাঁচেক একটা বাংলা মাসিক পত্র খুলিয়া পড়িল, মন বসিল না; একখানা ছবির বই খুলিয়া দুইজনে ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল, ভাল লাগিল না। উভয়েই বুঝিতে পারিল, বাহিরের একটা কিছু অবলম্বন ভিন্ন শুধু দুইজনকে লইয়া দুইজনের কিছুতেই বেশিক্ষণ চলিবে না। দুইজনের সঙ্গে দুইজনের যোগ রাখিতে হইলে মধ্যে একটা-কিছু যোগ-সূত্রের দরকার।

কানে আসিতেছিল বাহিরে কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাতিয়া পুরুষদের তুমুল তর্ক চলিতেছে—মাঝে মাঝে দুই-একটা কথাও বোঝা যাইতেছিল। কমলা বলিল, "যাবে শোভা?—বাইরে ফাঁকায় গিয়ে বসবে? চল ন', কি অত তর্ক হচ্ছে শুনি!"

শোভা বলিল, "একটু আড়ালে কোথাও বসা যায় না?"

"আড়ালেই তো। ওই যে চামেলীফুলের ঝাড়ের পাশে একটা লোহার বেঞ্চি আছে, তাইতে আমরা দুজনে বসব অখন।"

শোভা বলিল, "চল।"

দুইজনে যখন সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া বসিল

তখন দ্বিজনাথ বলিতেছেন, "আসল কথা কি জান? নিজেদের রাজত্ব হারিয়ে মেয়েদের দৃষ্টি পড়েছে এখন পুরুষের রাজপদের ওপর। 'সংসার' বলতে আগে যে পদার্থ বোঝাত—এখন হয় তা একেবারে লুপ্ত হয়েছে, নয়, গিয়েছে চাকর-বামুনের হাতে। সংসারটা চলছে এখন একটা ব্যবসাদারী চুক্তির মতো—মাসান্তে স্বামী তার স্ত্রীকে একটা টাকা ধ'রে দেয়—স্ত্রী তার শৌখিনতার জন্যে খানিকটা তা থেকে কেটে রেখে বাকিটা দিয়ে চাকর-বামুনের সাহায্যে সংসার চালায়। শিশু প্রতিপালন করে আয়ায় ফিডিং বট্‌ল্ আর বেবি স্থদারের সাহায্যে। শিশু আর মাতৃস্তন্য পায় না, পায় বট্‌ল্‌ড্ ফুড—মাতৃস্তন পায় না, পায় রবারের বেবি-স্থদার। যে সব ব্যবসাদার মাতৃ কর্তব্যের ভার নিয়েছে তারা সর্বদা তারস্বরে চীৎকার করছে—সর্বনাশ! মায়েরা যেন ছেলেদের স্তনপান না করান—তা হ'লে তাঁদের শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। অথচ জঙ্গলে এখনও সিংহিনী তার ছানাদের ফিডিং বট্‌লে ফুড না খাইয়েও দুর্দান্ত পরাক্রমে লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে। আর-কিছুদিন পরে ব্যবসাদাররা মেয়েদের একেবারে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে—তারা সাড়ে তিন হাত লম্বা এমন চমৎকার টিনের মা তৈরি করবে যে, তার মূর্তি দেখে আসল মা'র হিংসে হবে। সেই টিনের মা'র দেহে দুটো কাচের ফিডিং বট্‌ল্ আর দুটো রবারের বেবি-স্থদার আঁটা থাকবে, প্রয়োজন হ'লেই চাবি ঘুরিয়ে দিলে তার ভেতর থেকে পেপ্‌টো-নাইজ্‌ড্ ফুড বার হ'তে থাকবে। রাত্রে শিশুকে ঘুম পাড়াবার সময়ে টিনের মা'র কোলের কাছে শিশুকে শুইয়ে দিয়ে কল টিপে দিলেই শিশুকে আঁকড়ে ধ'রে টিনের মা অল্প অল্প দুলতে থাকবে আর মুখে গুন্ গুন্ শব্দ ক'রে ছড়া পড়ার কাজ করবে।"

'টিনের মা'র বিবরণ শুনিয়া সন্তোষ, সুকুমার আর বিনয় তিন জনেই

হাসিয়া উঠিল—এমন কি অন্তরালে শোভা এবং কমলাও হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিল না।

সন্তোষ বলিল, "আচ্ছা, মানলুম না হয় মেয়েরা তাদের নিজের অধিকারের অনেক জিনিস হারিয়েছে, কিন্তু যে সব বিষয়ে এ পর্যন্ত তাদের বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছে তার অধিকার তারা পাবে না কেন?"

এবার কথা কহিল বিনয়; বলিল, "কিন্তু কে তাদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছে সন্তোষবাবু?"

সন্তোষ বলিল, "পুরুষ।"

বিনয় বলিল, "ভুল কথা। তাদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছে তাদের নিজেদের অক্ষমতা। যেদিন মেয়েরা পুরুষের সমস্ত অধিকার নিজেদের হাতে পাবে, সেদিন তাদের পক্ষে শুভদিন হবে প্রধানত এই কারণে যে, তার পরদিন থেকেই তারা বুঝতে আরম্ভ করবে, তারা পুরুষদের সমকক্ষ নয়; এতদিন ধ'রে যে আদর্শের পিছনে তারা ছুটোছুটি করেছে তা স্রেফ মরীচিকা—স্বপ্ন।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্তোষ বলিল, "এ নিতান্তই গায়ের জোরের কথা।"

বিনয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু সে গায়ের জোর আসে সত্যের জোর থেকে।"

শোভাকে একটু ঠেলা দিয়া কমলা বলিল, "শুনছ শোভা, তোমার বিনুদাদার কথা?"

ঈষৎ দ্বিধাভরে শোভা বলিল, "কিন্তু ঠিকই তো বলছেন মনে হয়।"

তপ্ত হইয়া কমলা বলিল, "একটুও মনে হয় না। সন্তোষবাবু নিতান্ত ভাল মানুষ তাই এর উত্তর দিতে পাচ্ছেন না, আমি হ'লে ঠিক উত্তর দিতাম।"

ভীতস্বরে শোভা বলিল, "তুমি উত্তর দেবে না-কি কমলা?"

শোভার মুখে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া কমলা বলিল, "চুপ! চুপ! শোন কি বলছেন!"

বিনয় বলিতেছিল, "ভেবে দেখুন, ক'টা অধিকারের পথই বা মেয়েদের কাছে বন্ধ আছে! এক ভোট দেওয়ার অধিকার, আর তা ছাড়া আইন-গত আর দু-চারটে অনধিকার। কিন্তু তার তুলনায় খোলা আছে কত দিক তা একবার ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন আসল গলদ কোথায়! সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত কোন্ বিষয়ে মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ হ'তে পেরেছে বলুন তো—অথচ হবার পক্ষে কোনো বাধাই নেই। একটা সেনার সেনাপতি হবার পক্ষে, একটা রেলওয়ে চালাবার পক্ষে, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হবার পক্ষে, একটা বড় ব্যবসায়ের নেতৃত্ব করবার পক্ষে মেয়েদের কিছুমাত্র বাধা নেই, একমাত্র তাদের অক্ষমতা ভিন্ন। কতদিন হ'য়ে গেল মেয়েরা ডাক্তারী পড়বার অধিকার পেয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একজনও মেয়ে-ডাক্তার দেখেছেন কি যে স্ত্রীরোগী পুরুষ-রোগী নির্বিচারে একজন পুরুষ ডাক্তারের মতো সমানতালে ডাক্তারি করছে? মেয়ে-ডাক্তার মানে মেয়েদের ডাক্তার, তাও যতক্ষণ রোগটা পুরুষ-ডাক্তারের পক্ষে উপেক্ষণীয় থাকে ততক্ষণ। জার্মান ওয়ারের সময় বিলেতে অনেক জিনিস মেয়েদের হাতে এসে পড়েছিল, এমন কি পুলিসের কাজ পর্যন্ত। তখন মনে হয়েছিল, পুরুষরা এতদিন গায়ের জোরে যে সব জিনিস অধিকার ক'রে ব'সে ছিল, বাধ্য হ'য়ে এবার তাতে মেয়েদের শরিকদার করতে হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কি? পুরুষ-পুলিসরা যখন সৈনিক হ'য়ে যুদ্ধে গিয়েছিল তখন মেয়েরা পুলিস হয়েছিল,—যুদ্ধের পর পুরুষ-পুলিসরা যখন ফিরে এল তখন মেয়ে-পুলিসরা আবার মেয়ে হ'ল। বেশি কথা কি, গুণ্ডামি করবার পক্ষে তো আইনের কোনো বাধা নেই—কিন্তু মেয়ে-গুণ্ডার কথা এ পর্যন্ত কেউ শুনেছেন কি?"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল,—এমন কি তাহাতে সন্তোষের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

এমন সময়ে সেখানে উত্তেজিত ভাবে কমলা আসিয়া দাঁড়াইল—মুখ তাহার আরক্ত, সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে।

বিনয় তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "বসুন মিস্ মিত্র।" সেখানে ফাল্‌তো চেয়ার ছিল না।

কমলা দ্বিজনাথের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আর সন্তোষবাবু যদি অনুমতি দেন, তা হ'লে বিনয়-বাবুর কথার উত্তর আমি দিই।"

কমলার কথা শুনিয়া বিনয় নিজের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া আবার বসিয়া পড়িল।

চিন্তিত মুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা দাও। কিন্তু তুমি উত্তেজিত হ'য়ে রয়েছ কমল, উত্তেজিত হ'য়ে আলোচনা করা ঠিক চলে না।"

কমলা বলিল, "উত্তেজনা তো এখানেও কম ছিল না বাবা। উত্তেজনাও কি পুরুষদের একচেটে ব্যাপার?" তারপর পিছন ফিরিয়া বসিতে গিয়া দেখিল, চেয়ার খালি নাই, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বিনয় চেয়ারে বসিয়া আছে। আঘাতটা যথাস্থানে গিয়া ঠিক পৌঁছাইল। মুখখানা কমলার কতখানি টকটকে হইয়া উঠিল, সন্ধ্যার আবছায়ায় তাহা কেহ জানিল না।

তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারখানা কমলার দিকে আগাইয়া দিয়া সন্তোষ আর একটা চেয়ারের সন্ধানে বারান্দার দিকে গেল।

২২

এ পর্যন্ত পুরুষদের আলোচনার মধ্যে মতান্তরের উত্তেজনা থাকিলেও মনান্তরের কোনো আশঙ্কা ছিল না—কিন্তু অকস্মাৎ তাহার মধ্যে উত্তপ্ত মূর্তি ধারণ করিয়া কমলা আবির্ভূত হওয়ায় ব্যাপারটা সহসা এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, একটা অপ্রীতিকর পরিণতির দুশ্চিন্তায় সকলের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। চেয়ার লইয়া বিনয়ের আচরণ যে তাহারই পূর্ব সূচনা, এবং আসল অভিনয়টা যে সেই অনুপাতেই গুরুত্ব লাভ করিবে —সকলেই তাহা মনে করিয়া শঙ্কিত হইল।

কমলার মুখ দিয়া কিন্তু প্রতিবাদের একটি বাক্যও বাহির হইল না। সন্তোষের দেওয়া চেয়ারে আশ্রয় লইয়া সে আরক্তমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। বিনয়ের কথা শুনিতে শুনিতে যে-সব তীক্ষ্ণ শাণিত উত্তর উপযুক্ত ভাষায় সজ্জিত হইয়া তাহার মাথার মধ্যে আপনা-আপনি উপস্থিত হইয়াছিল, হাল্কা সাদা টুকরা টুকরা মেঘের মতো কখন্ তাহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। দুই-একটা কথা যাহা মনে আসিল, মনে হইল তাহা এতই দুর্বল যে, বিনয়ের বিদ্রূপ-বিতর্কের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিবে না। বারান্দা হইতে চেয়ার লইয়া আসিয়া সন্তোষ বসিয়াছে; বিনয়ের কথার উত্তরে কমলা যাহা বলিবে তাহা শুনিবার অপেক্ষায় সকলে নীরবে অবস্থান করিতেছে; অথচ কোন্ কথা দিয়া সে কথা আরম্ভ করিবে, বিনয়ের কোন্ কথার প্রতিবাদ সে প্রথমে করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে কথা বলিতে পারিতেছে না—এই শোচনীয় অবস্থার উপলব্ধি কমলার বিহ্বলতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল।

কোনো তীক্ষ্ণ আঘাতের প্ররোচনায় একটা অবান্তর ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হইলে মানুষের এমনি দুরবস্থাই হয়। কোথায় কখন্ কি ভাবে আহত হইয়া মনের মধ্যে যে বৈরূপ্য উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা উদ্যত হইয়া উঠিল প্রথম সুযোগেই এই নারী-জাতির অধিকার বিষয়ে আলোচনা অবলম্বন করিয়া। সেই বৈরূপ্যের প্রভাবেই সমস্ত সঙ্কোচ এবং প্রতিবন্ধ কাটাইয়া কমলা বিরোধের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অবিলম্বেই সে বুঝিতে পারিল যে, ক্রোধ শুধু প্রবর্তিতই করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরেই যে জিনিসের একান্ত প্রয়োজন, তাহা অস্ত্র—ক্রোধ নহে। রাগ করিয়া সবই প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু প্রতিপন্ন করা যায় না কিছুই ;—তাহার জন্য চাই যুক্তি, বিচার, স্থৈর্য।

কমলার বিপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বিনয়ের মনে করুণা হইল। সে বুঝিল, কথাটা আবার নূতন করিয়া তুলিয়া নূতন সূত্র না যোগাইলে কমলার পক্ষ হইতে আরম্ভ হওয়া কঠিন ; বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি কি সন্তোষবাবুরই মতো বলতে চান যে, পুরুষরাই মেয়েদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে ?"

প্রসঙ্গের পুনরবতারণায় কমলা ঈষৎ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল ; মনের নিভৃত প্রদেশে হয়তো একটু কৃতজ্ঞতাও দেখা দিল ; বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় বলতে চাই।"

"আচ্ছা, এ ভাবে কতদিন পুরুষরা মেয়েদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, তা আপনার মনে পড়ে কি ? এমন কোনো যুগের কথা কি মনে পড়ে, যে সময়ে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমকক্ষতা করেছে ?"

উচ্ছ্বসিত হইয়া কমলা বলিল, "বোধ হয় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই পুরুষরা মেয়েদের বঞ্চিত ক'রে এসেছে।"

বিনয়ের মুখে একটা নীরব মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল, সন্ধ্যার অস্পষ্ট

আলোকে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, "আপনার এ উক্তি পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত জাতের সম্বন্ধে খাটে ?—না, কোনো কোনো জাত এ উক্তি থেকে বাদ পড়ে ? চীন জাপান থেকে আরম্ভ ক'রে উত্তর-আমেরিকায় দক্ষিণ-আমেরিকায় পর্যন্ত কত হাজার হাজার জাত আছে মনে ক'রে দেখুন।"

কমলাকে দিয়া যে স্বীকারোক্তি করাইয়া লইবার জন্য বিনয় অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলিল, "আছে। এমন অনেক অসভ্য জাত আছে যাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে কোন অধিকার-ভেদ নেই।"

এবার বিনয়ের হাসির মৃদু ধ্বনি শুনা গেল; সে কমলাকে সম্বোধন করিয়াই বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি এমন একটাও অসভ্য জাতের নাম করতে পারেন কি যাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে কোনো অধিকার-ভেদ নেই ?"

এ প্রশ্নে কমলা প্রথমে একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। তারপর আরক্ত-মুখে স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "আমি না পারলেও সন্তোষবাবু হয়তো পারেন।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, সন্তোষবাবুর সাহায্য নেওয়া যদি একান্তই আপনার দরকার হয়, তা হ'লে তাঁর কাছ থেকে এমন একটা অসভ্য জাতের নাম জেনে নিন যাদের সর্দার একজন পুরুষ নয়।"

এই প্রশ্নের ভঙ্গীতে কমলার অক্ষমতার বিষয়ে যে ইঙ্গিত ছিল তাহার অপমানে কমলার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল, পুরুষকে হারাইবার জন্য তর্কেও পুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন! উত্তরে সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্বেই সন্তোষ উত্তর দিল। বলিল, "হঠাৎ বলা শক্ত, তবে 'পিউপিল্‌স্ অব অল নেশন্‌স্' হাতের কাছে থাকলে হয়তো বলতে পারতাম।"

তেমনি শান্তভাবে বিনয় বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে না-হয় 'পিউপিল্‌স্

অব অল নেশন্‌স্‌' হাতের কাছে না পাওয়া পর্যন্ত এ আলোচনা বন্ধ থাক্‌।”

বিনয়ের সংযমের ভঙ্গিমায় এবং বাক্যের বাঁধুনিতে কমলা মনে মনে অতিশয় উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল; তীক্ষ কণ্ঠে বলিল, “তার দরকার কি? স্বীকার করলাম তেমন কোনো জাতের নাম জানি নে—তাতে আপনি কি বলতে চান?”

বিনয় বলিল, “তাতে আমি বলতে চাই যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশে সব জাতের পুরুষরা যদি স্ত্রীলোকদের দাবিয়ে রেখে থাকে তাতে পুরুষদের প্রতি আপনাদের যতই রাগ হোক না কেন, একবারও মনে মনে এ সংশয় হওয়া উচিত নয় কি যে, তা হয়তো আপনাদেরই দুর্বলতা অথবা অক্ষমতার জন্যে? প্রথমে আপনারা স্বেচ্ছায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং তারই সুবিধা নিয়ে পরে পুরুষরা বরাবর আপনাদের ওপর প্রভুত্ব খাটিয়ে আসছে—এ কথা বোধ হয় আপনারা বলতে চান না।”

অবহেলার স্বরে কমলা বলিল, “এ আপনাদের সেই পুরোনো যুক্তি, পুরনো তর্ক। এ আর আপনারা কতবার বলবেন?”

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, “যতবার আপনারা বলাবেন। যুক্তি পুরনো হ'লে তো কোনো দোষ নেই মিস্‌ মিত্র, ভুল হ'লেই দোষ। এক লক্ষবার তিন দুগুণে ছয় হয় বলবার পরও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—তিন দুগুণে কত হয়, তা হ'লে বলতেই হবে—তিন দুগুণে ছয় হয়; নূতনত্বের খাতিরে তিন দুগুণে সাত হয় বললে বোকামি হবে।”

উত্তেজিত হইয়া সন্তোষ বলিল, “কিন্তু আপনি যে তিন দুগুণে ছয় হয় বলছেন তার প্রমাণ কোথায়? আপনি হয়তো তিন দুগুণে সাত হয়ই বলছেন!”

মাথা নাড়িয়া বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্রের কিন্তু উপস্থিত আপত্তি এ নয় যে, আমি ভুল কথা বলছি—তাঁর আপত্তি আমি অনেকবার-বলা পুরনো কথা বলছি।"

কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রকার অবাঞ্ছনীয় আচরণ না ঘটে সে জন্য মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ থাকিলেও দ্বিজনাথ সকৌতুকে এই তর্ক-বিতর্কের সংগ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন। চেয়ারের হাতলে ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "ওহে বিনয়, তুমি যদি পেণ্টার না হ'য়ে ব্যারিস্টার হ'তে তা হ'লে আমার মনে হয় ঢের বেশি টাকা কামাতে পারতে। শুধু জেরা আর তর্ক করবার শক্তিই নয়, নিজে ঠাণ্ডা থেকে প্রতিপক্ষকে উত্তপ্ত করবার অসাধারণ ক্ষমতাও তোমার আছে তাতে সন্দেহ নেই।"

কলহ-বাক্যের পীড়নে বায়ু জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, দ্বিজনাথের পরিহাস-বাণীর প্রভাবে অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। উৎফুল্ল মুখে সুকুমার বলিল, "শুধু প্রতিপক্ষকেই নয়, মিত্র মশায়, প্রতি ব্যক্তিকেও। আমি মনে মনে অতিশয় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিলাম; কিন্তু পাছে কোনো বেফাঁস কথা বললে সেই কথা নিয়ে ও আরও তর্ক করবার সুবিধে পায়, সেই জন্য চুপ ক'রে ছিলাম।"

সুকুমারের কথা শুনিয়া দ্বিজনাথ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বেশ করেছিলে সুকুমার—বোবার শত্রু নেই।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "যারা বোবা নয় তাদেরও কিন্তু আমি শত্রু নই মিস্টার মিত্র,—তাদের আমি মিত্রই।" তারপর কমলার দিকে চাহিয়া নম্র-বিনীত স্বরে বলিল, "আমার কোনো কথায় অথবা আচরণে আপনার প্রতি যদি সামান্য মাত্রও অশিষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হ'লে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ মিত্র—আপনার প্রতি অশিষ্টতা প্রকাশ করবার

বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার ছিল না। যখন বুঝলাম যে, আপনি পুরুষের সমকক্ষতা দাবি ক'রে পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তর্ক করতে এসেছেন তখন, অন্তত সে সময়ের জন্যে, আপনার সঙ্গে স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার করা শুধু নিরর্থকই নয়—অসঙ্গত হবে ব'লে মনে হয়েছিল। ধরুন, সীতাহরণ অভিনয়ে আমাকে যদি রামের চরিত্র অভিনয় করতে হয় আর আমার বন্ধু স্বকুমারকে যদি রাবণের চরিত্র অভিনয় করতে হয় তা হ'লে স্বকুমার আমার সম্মুখে এলে আমি যদি তাকে তীর না মেরে বন্ধু বিবেচনায় শেক্ হ্যাণ্ড্ করি, তা হ'লে অবিবেচনার কাজ হয় না-কি ?"

হাসির একটা উচ্চ রোল উঠিল। স্বকুমার বলিল, "দেখুন মিত্র মশায়, কি রকম আমার বন্ধু দেখুন! উনি রাম হ'য়ে তীর মারবেন, আর আমি হব রাবণ!"

সহাস্য মুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা বাপু, বিশ হাতে তুমিও তো নেহাত কম মারবে না।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ হাতে তো আমি স্ববিধে করতে পারব না মিত্র মশায়, দু হাতে ও ই আমাকে শেষ করবে।"

বিনয় বলিল, "তোমার ভয় নেই স্বকুমার, তার আগেই আমাদের অভিনয় শেষ ক'রে দেব।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া স্বকুমার বলিল, "আর সীতা অশোকবনে প'ড়ে চিরকাল দুঃখ পাবে!"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

মনে হইতেছিল হাস্য-পরিহাসের বারি-বর্ষণে বিরোধের আগুন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু একদিকে ভস্মের ভিতর হইতে আবার নূতন করিয়া একটু ধোঁয়া দেখা দিল। বিনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কমলা বলিল, "আপনার কোনো আচরণের জন্যে আমি একটুও অনুযোগ

করছি নে বিনয়বাবু; কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে আমি অভিনয় করতে এসেছিলাম ?"

উদ্বিগ্ন-অপ্রসন্ন কণ্ঠে দ্বিজনাথ বলিলেন, "না, না, কমল, সে রকম কোনো অর্থে বিনয় অভিনয়ের কথা বলেন নি। আর, যেতে দাও ওসব কথা—তার চেয়ে বরং একটু তোমার গান-টান হোক—অতিথি-সৎকারের দিকে একটু মন দাও।"

দ্বিজনাথের প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনায় নিজ আচরণের অসমীচীনতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া কমলা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "গান যদি সুবিধে হয় তো পরে হবে বাবা, খাবারের দিকটা কতদূর এগুলো একটু দেখে আসি।"

বিনয় বলিল. "মিস্ মিত্র, দয়া ক'রে একটুখানি অপেক্ষা ক'রে যান। চপ-কাট্‌লেটের ব্যবস্থা যতই করুন না কেন, অতিথিকে প্রশ্ন ক'রে তার উত্তর না নিলে অতিথি-সৎকার কিছুতেই হবে না।"

বিনয়ের ভঙ্গী দেখিয়া সকলের ভয় হইল, আগুনটা দ্বিতীয়বার ভাল করিয়াই বুঝি জ্বলিয়া উঠিল। সন্তোষ ব'লিল, "প্রশ্ন ক'রে উত্তর না নিলে বুঝতে হবে—প্রশ্ন তুলে নেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে বিনয়বাবু, আপনি চপ-কাট্‌লেটের ব্যবস্থায় বাধা না দিতে পারেন।"

কমলা কিন্তু মীমাংসার জন্য অপেক্ষা না করিয়া চিন্তিত অপ্রসন্নমুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে বলুন কি বলবেন ?"

এক মুহূর্ত স্থিরনেত্রে কমলার দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল, "আমার তো নিশ্চয়ই মনে হয় মিস্ মিত্র, আপনি তখন আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে অভিনয় করতেই এসেছিলেন।"

কমলার দুই চক্ষের মধ্যে অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠিল; তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "অভিনয় করতে এসেছিলাম ?"

বিনয় বলিল, "এসেছিলেন। আপনার শিক্ষা, রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তির যেটুকু পরিচয় এ কয়েক দিনে আমি পেয়েছি, তাতে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, যে-মূর্তি নিয়ে আপনি আমাদের মধ্যে তখন উপস্থিত হয়েছিলেন তা আপনার নিজের মূর্তি। ওটা আপনার নিতান্তই ধার-করা মূর্তি ব'লে আমার মনে হয়েছিল। কিছু মনে করবেন না মিস্ মিত্র, আপনার কল্যাণী লক্ষ্মীমূর্তি ত্যাগ ক'রে রুদ্রমূর্তি ধারণ করবেন কিসের লোভে? নিজের পদ্মাসন ছেড়ে পুরুষের কাঁটাবনে ছুটোছুটি ক'রে কি পরমার্থ লাভ করবেন? দেখুন, ইচ্ছে ক'রে নিজের মহিমা থেকে, শ্রী থেকে, নিগূঢ়ত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন না; পুরুষের মোহ, স্বপ্ন, রহস্য নিজের হাতে ভেঙে দেবেন না। কেশ যতই ছোটো ক'রে ছাঁটুন, আর বেশ যতই খাটো ক'রে কাটুন, তাতে পরুষ হবেন, কিন্তু পুরুষ হবেন না। প্রকৃতির হাত থেকে যে বৈষম্য লাভ করতে হয়েছে, তার ফলভোগ করতেই হবে, তা ভোট দিন আর না-ই দিন। পুরুষের চেয়ে আপনারা বড় হোন, কিন্তু পুরুষের সমান হ'য়ে কাজ নেই। বিলিতি সাফ্রেজিস্ট্‌দের পথে না চ'লে নিজেদের যোগ্যতার অনুশীলন করুন, দেখবেন তা হ'লেই সত্যি-সত্যি সার্থকতা লাভ করবেন। মনে করবেন না এ আমি আপনাদের ঘুম পাড়াবার জন্যে, ভুলিয়ে রাখবার জন্যে ছড়া কাটছি,—এ আমার কঠিন বিশ্বাসের কথা। অপরকে দাবিয়ে রেখে নিজে বড় হ'য়ে থাকা মনুষ্যত্বের প্রতি সব চেয়ে বড় অপমান ব'লে আমি মনে করি।"

বিনয়ের সুদীর্ঘ অভিভাষণ শেষ হইলে অপ্রিয়তার দুশ্চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া দ্বিজনাথ প্রফুল্লমুখে চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একেবারে একমত বিনয়। আশা করি কমল, তোমার এখন আর বিনয়ের সঙ্গে মতান্তর নেই।

এবার তুমি যে কাজে যাচ্ছিলে যেতে পার।" তাহার পর বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিনয়, কমলকে বোধ হয় তোমার আর কিছু বলবার নেই?"

ব্যস্ত হইয়া বিনয় বলিল, "আজ্ঞে. না, আর আমার ওঁকে কিছুই বলবার নেই, শুধু—উনি যেন আমার অবিনয় ক্ষমা করেন।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমি যে-অপরাধ কর নি, সে-অপরাধ ক্ষমা করা কমলার পক্ষে শক্ত কথা।"

সন্তোষ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এখন তা হ'লে আপনি কমলাকে নারীদের মহিমায় স্বীকার করছেন বিনয়বাবু?"

বিনয় বলিল, "মুখে এখন করছি;—মনে বরাবরই করেছি।"

সুকুমার বলিল, "তোমার আর একটা গুণ জানা গেল বিনয়। মুখে আর মনে তুমি দু রকম ভাব করতে পার।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

২৩

চামেলী ঝাড়ের পাশ দিয়া কমলা যাইতেছিল অন্তঃপুরের দিকে। দ্রুতপদে শোভা পিছন হইতে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বা রে, বেশ তো! আমাকে একা ফেলে চ'লে যাচ্ছ?"

কমলা তাড়াতাড়ি শোভার অলক্ষ্যে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া শোভার দিকে তাকাইয়া চলিতে চলিতে বলিল, "আমি ভাই, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি এখানে ব'সে আছ!"

মৃদু হাসিয়া শোভা বলিল, "তা তো ভুলে যাবেই। যে বকুনিটা বিনুদার কাছে খেয়েছ, তাতে কি আর অন্য কোনো কথা মনে থাকে! এখন বিশ্বাস হ'ল তো সেদিন যে কথা বলেছিলাম?"

অন্যমনস্কভাবে কমলা বলিল, "কি কথা?"

"বলছিলুম না, কথা বলবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিনুদার আছে? আজ তো তুমি স্বচক্ষে দেখলে!"

কমলা বলিল, "স্বকর্ণে শুনলাম।"

অপ্রতিভ হইয়া শোভা বলিল, "এত ভুলও হয় আমার কথা বলতে গেলে!" তারপর কমলার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া একটু চাপা গলায় বলিল, "এখন বিনুদাদার উপর রাগ গিয়েছে তো কমলা?"

শোভার মুখের দিকে চাহিয়া কমলা বলিল, "কিসের রাগ?"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "অত রাগ ক'রে বিনুদার কথার জবাব দিতে গেলে, আবার বলছ কিসের রাগ?—গিয়েছে?"

"কি জানি!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শোভা বলিল, "কি জানি? শেষে তোমাকে কত ভাল কথা বললেন, 'লক্ষ্মী' বললেন, 'পদ্মাসন' বললেন, আরও কত কি সব বললেন, তবু বলছ 'কি জানি'?"

শোভার কথায় কমলা হাসিয়া ফেলিল; ডান হাত দিয়া শোভাকে একটু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ও-সব কথা বললে তোমার রাগ যেত শোভা?"

"যেত না? নিশ্চয় যেত।"

"তবে আমার গিয়েছে কি-না জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

অপ্রতিভ স্বরে শোভা বলিল, "তা বটে।"

"আচ্ছা কমলা, বিনুদাদা তোমাকে যখন—"

কমলা শোভার হাতে একটু চাপ দিয়া বলিল, "চুপ।"

শোভা অবাক হইয়া তাহার অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে থামিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই উভয়ে রান্নাঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শোভা কমলার নিষেধের অর্থ বুঝিতে পারিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর—পদ্মঠাকুমা?"

পদ্মমুখী বলিলেন, "এখনো ভাই এক কোশ।"

শৈলজা আর শোভা হাসিয়া উঠিল।

কমলা বলিল, "এখনো এক কোশ? আধ কোশে হয় না?"

"কেন, সন্তোষের ঘুম পাচ্ছে নাকি?" বলিয়া শৈলজার দিকে তাকাইয়া পদ্মমুখী একটু চাপা হাসি হাসিলেন। কমলা ও শোভার অনুপস্থিতিতে পদ্মমুখী এবং শৈলজার মধ্যে উভয়ের সঙ্কল্প সাধনার্থে যে কার্যবিধি নিরূপিত হইয়াছিল এ ব্যাপারটা তাহারই অন্তর্গত।

পদ্মমুখীর পরিহাসে কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল, "তা নয় পদ্মঠাকুমা,

বিনয়বাবু একটু ব্যস্ত হচ্ছেন।" বলিয়া পার্শ্ববর্তিনী শোভাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল।

নিক্ষিপ্ত শর তীক্ষ্ণতর হইয়া ফিরিয়া আসিল বুঝিতে পারিয়া পদ্মমুখী জ্বলিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এ তো আর ছবি আঁকা নয় যে, যখন ইচ্ছে তুলি তুলে রাখলেই হ'ল; এ খুন্তি-হাতার কাজ, একবার আরম্ভ হ'লে শেষ না ক'রে উপায় নেই।"

পরামর্শকালে স্থির হইয়াছিল যে, বিনয় শোভাকে ভালবাসে—সে বিশ্বাস কমলার মনে কৌশলে উৎপাদন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে শৈলজা বলিল, "বলবেন না ঠাকুমা, বিনয় ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন না। একজনের গায়ে ফোস্কা পড়বে।"

সহাস্যমুখে পদ্মমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার গায়ে বউদিদি ?"

শৈলজা কাহার নাম করে শুনিবার ঔৎসুক্যে কমলা আর শোভা সাগ্রহে শৈলজার দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলজা মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমার ওই ননদটির। একটি কথা যদি বিনয় ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে বলবার যো আছে! ওদিকটিও আবার ঠিক তেমনি। একদিন বিনয় ঠাকুরপোর কাছে বলেছিলাম—শোভার রঙ কালো; সে কি ভীষণ আপত্তি! বললেন, ও রঙ একটুও কালো নয়,—অনেক ফরসা রঙ ওর কাছে হার মানে।"

পদ্মমুখী বলিলেন, "আহা! দুটিতে বিয়ে হ'লে বেশ ভাল হয়। তাই দাও না কেন বউদিদি ?"

শৈলজা বলিল, "হবে বোধ হয় তাই। কোনো পক্ষ থেকে তাতে তো কোনো বাধা দেখছি নে।"

নিজের কথা আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত শোভা পলাইবার জন্য ক্রমাগত কমলাকে ঠেলিতেছিল, কমলা শোভাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়া

শৈলজার কথা শুনিতেছিল; কিন্তু শোভার কথা পরিত্যাগ করিয়া শৈলজা যখন সন্তোষ এবং কমলার কথা আরম্ভ করিল, পাত্র হিসাবে সন্তোষের মূল্য নির্ণয়ের জন্য কষ্টিপাথরে তাহাকে ঘষিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন কমলা বাবুর্চির রান্না কত দূর অগ্রসর হইল দেখিবার ছল করিয়া শোভাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইয়া কিন্তু বাবুর্চিখানায় না গিয়া সে বলিল, "চল শোভা, একটু ফাঁকায় গিয়ে বসি।"

শোভা বলিল, "রান্নার খবর নেবে না?"

"সে নেবার এমন কিছু দরকার নেই।"

চামেলী ঝাড়ের অনতিদূরে একটা সান-বাঁধানো বেদী ছিল, উভয়ে গিয়া তাহার উপর বসিল। দূরে পুরুষদের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল, শুনা যাইতেছিল কিন্তু বুঝা যাইতেছিল না। কমলা অথবা শোভা কাহারো মুখে কোনো কথা ছিল না—কিন্তু উভয়ের চিত্ত পূর্ণ হইয়া ছিল গভীর চিন্তাজালে। দুইজনের চিন্তার প্রকৃতি এক নহে, কিন্তু পরিমাণ বোধ হয় একই রকম।

বহুক্ষণের নীরবতার পর মৌন ভঙ্গ করিল শোভা; মৃদুস্বরে ডাকিল, "কমলা!"

শোভার দিকে চাহিয়া কমলা বলিল, "কি?"

"একটা কথা তোমাকে বলি—তুমি যদি কাউকে না বল।"

"কি কথা?"

"আগে বল, কাউকে বলবে না।"

"তুমি যখন মানা করছ তখন না-হয় বলব না।"

"বউদিদিকেও নয়?"

"কাউকে যখন বলব না, তখন বউদিদিকেও বলব না।"

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া শোভা বলিল, "বউদিদি যে কথা বললেন বিশ্বাস ক'রো না—আমি জানি বিনুদা তোমাকেই ভালবাসেন।"

চকিত হইয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে জানলে?"

কমলার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অস্ফুটস্বরে শোভা বলিল, "ব'লো না যেন কাউকে,—বউদিদি নিজেই আমাকে বলেছে।"

মাথার উপর আকাশ-ভরা এক রাশ তারা ঝিক্ ঝিক্ করিয়া হাসিতেছিল, আর বোধ হয় বলিতেছিল - ওরে বোকা মেয়ে! নিজের দিকটা ভুললি তো এমনি ক'রেই কি ভুললি!

*　　　*　　　*

কথাবার্তা হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া আহার যখন সমাপ্ত হইল, তখন রাত অনেক হইয়াছে।

যাইবার পূর্বে কমলাকে একটু একান্তে পাইয়া বিনয় বলিল, "দেখুন, আজ বিকেলে মিস্টার মিত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে, উপস্থিত আপনার ছবি আঁকা বন্ধ থাকবে। কিন্তু কাল থেকে আমি নিয়মিত সকালে আসব আপনার ছবি আঁকতে।"

একটু বিস্মিত হইয়া কমলা বলিল, "কেন?"

"ও-কাজটা শেষ ক'রে ফেলাই ভাল। বোধ হয় তিন-চার দিনের বেশি লাগবে না।"

একটু চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "বাবাকে ব'লে যান না কেন?"

"আপনিই ব'লে দেবেন মিস্ মিত্র।"

মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

২৪

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর বিনয় দেখিল, সুকুমার স্যুট পরিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কোন একটা জিনিস অন্বেষণ করিতেছে। একবার দেরাজ টানিতেছে, একবার বাক্স হাতড়াইতেছে, একবার টেবিলের উপরের কাগজপত্রগুলা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছে; কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুর যে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না তাহা তাহার মুখ-চোখের বিহ্বলতায় প্রতীয়মান।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিনয় দেখিল, বেলা অনেকখানি হইয়া গিয়াছে। আর আলস্য না করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতে করিতে সুকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হে, সকালে উঠে রাজবেশ ধারণ ক'রে চলেছ কোথায়?"

"চীফ এঞ্জিনিয়ারের বাড়ি ভাই।"

"কিন্তু সে পথে বাধা হচ্ছে কি?"

"বাধা হচ্ছে টেস্টিমোনিয়ালের ফাইলটা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি নে। আর সমস্ত জিনিস—এমন কি যে-সব জিনিস বহুদিন থেকে হারিয়েছে ব'লে জানতুম, পাচ্ছি—শুধু পাচ্ছি নে উপস্থিত যেটার একান্ত দরকার।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "ভগবান এমন কৌতুক সকলেরই সঙ্গে মাঝে মাঝে ক'রে থাকেন। কিন্তু সে যা হোক টেস্টিমোনিয়ালের ফাইল ব্যাপারটা কি তা তো বুঝলাম না সুকুমার। কাজে সন্তুষ্ট ক'রে টেস্টিমোনিয়াল লাভ করলে কোন্ সব ব্যক্তির কাছ থেকে—এ জানবার কৌতূহল কম হচ্ছে না।"

ওষ্ঠাধরে সলজ্জ হাসির ক্ষীণ রেখা টানিয়া সুকুমার বলিল, "দূর!

কাজই কখনো করলাম না তো টেষ্টিমোনিয়াল আমি কোথায় পাব? ও সব দাদামশায়ের টেষ্টিমোনিয়াল।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণকাল সুকুমারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিনয় বলিল, "তোমার দাদামশায়ের টেষ্টিমোনিয়ালের জোরে সাহেবের কাছ থেকে তুমি কাজ যোগাড় করবে?" তার পর খুব খানিকটা উচ্চরবে হাসিয়া লইয়া বলিল, "এ সত্যি সত্যিই অদ্ভুত। সে দিন যেমন দরখাস্ত দিয়ে এসেছ, আজ ঠিক তার উপযুক্ত টেষ্টিমোনিয়াল নিয়ে যাচ্ছ —যেমন প্রার্থনা, তেমনি দাবি—উভয়ের মধ্যে কোনো গরমিল নেই! কাজ যোগাড় করবার এ-ও যে একটা উপায় হ'তে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না।"

ঈষৎ অপ্রতিভমুখে সুকুমার বলিল, "তুমি বুঝছ না বিনু, এ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় উপায় নেই।"

বিনয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমিও বুঝছ না সুকুমার, নিরুপায় অবস্থা ব'লেও একটা অবস্থা আছে। 'থিওরি অব হেরিডিটি'র নিশ্চয়তা বিষয়ে চীফ এঞ্জিনিয়ারের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাতে না পারলে তোমার কিছুমাত্র আশা নেই। সে যদি ব'লে বসে 'তোমার দাদামশায়ের টেষ্টিমোনিয়ালের জোরে তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করলাম বটে, কিন্তু কাজ দোব তুমি যার দাদামশায় হবে তাকে'—তা হ'লে এ রকম যুক্তির বিরুদ্ধে তোমারই বা বলবার কি থাকবে, বল?"

পর্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল শৈলজা; বলিল, "ঠাকুরপোর হাসি শুনে দেখতে এলাম ব্যাপার কি!" সুকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে অত তাড়া দিয়ে এখনো তুমি যাও নি যে?"

বিষণ্ণ মুখে সুকুমার বলিল, "দুঃখের কথা বল কেন, টেষ্টিমোনিয়ালের তাড়াটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।"

"কোথায় রেখেছিলে ?"

"সেটা মনে থাকলে সেইখান থেকে বার ক'রে নিতাম।"

বিনয় বলিল, "বলতেই হবে, এ যুক্তি অকাট্য।"

সহাস্যমুখে শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "সব জায়গা খুঁজে দেখেছ ?"

"দেরাজ, টেবিল, বাক্স—সবই তো খুঁজে দেখলাম ; কোথাও নেই।"

"পকেট দেখেছ ?"

শৈলজার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া একটা কাগজের বাণ্ডিল বাহির করিয়া প্রসন্ন মুখে সুকুমার বলিল, "এই ! পকেটে রয়েছে।—ধন্যবাদ শৈলজা, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি নইলে আমি দেখছি একেবারে—"

বিনয় বলিল, "অচল।"

"ঠিক বলেছ—অচল। আচ্ছা, চললাম ভাই। তুমি চা-টা খাও—আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।" বলিয়া সুকুমার দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "আপনার অনুমানশক্তি তো খুব উঁচুদরের বউদি। কি ক'রে জানলেন পকেটে টেষ্টিমোনিয়ালের তাড়া আছে ?"

স্মিতমুখে শৈলজা বলিল, "অনুমান নয়—অভিজ্ঞতা। ওঁর যা জিনিস হারায় তার অর্ধেক পাওয়া যায় ওঁর পকেট থেকে—অথচ কোনো বার যদি প্রথমে পকেট দেখবেন ! একবার একটা হাতুড়ি হারিয়েছিল, তিন দিন পরে হঠাৎ পাওয়া গেল ওঁর ওভার-কোটের পকেটের ভিতর থেকে। চার-পাঁচ দিন পকেটে হাতুড়ি নিয়ে মর্নিং ওয়াক্ করেছেন—অথচ পকেটটা যে অত ভারী কেন হ'ল তা খেয়াল হয় নি।"

শৈলজার কথা শুনিয়া বিনয় হাসিতে লাগিল।

শৈলজা বলিল, "ওঁর ভুলের গোটা তিন-চার গল্প যদি শোনেন তো

হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। যাক, সে আর এখন কাজ নেই, অন্য সময়ে হবে, এখন আপনি তোয়ের হ'য়ে নিন—আমি শোভাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলছি।" বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল ফন্তুদাদার সঙ্গে তো আপনার আলাপ হ'ল, কেমন লাগল ওঁকে ? বেশ মানুষ, না ?"

"সন্তোষবাবুর নাম ফন্তু ?"

"হ্যাঁ, বাড়িতে ওঁর ডাকনাম ফন্তু। আমাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে পরিচয় ব'লে আমি 'ফন্তুদাদা' ব'লে ডাকি।"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ. বেশ মানুষ।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া মুখে চাপা মৃদু হাসির উচ্ছ্বাস ছড়াইয়া শৈলজা বলিল, "কাল না-কি স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে কমলার সঙ্গে আপনার রীতিমত বাগযুদ্ধ হ'য়ে গেছে ?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, কতকটা। তবে সন্ধিও তারপর হয়েছে। কে বললে আপনাকে ?—সুকু বুঝি ?"

শৈলজা বলিল, "হ্যাঁ, বাড়ি এসেই শুনলাম। সেখানে টের পেলে কমলাকে একটু ঠাট্টা ক'রে আসতাম, বলতাম—এখনি ফন্তুদাদার পক্ষ নিয়ে এমন ক'রে লড়াই করলে, একটুখানি চোট সহ্য করতে পারলে না ? বিয়ে হ'য়ে গেলে না জানি কি কাণ্ডই করবে !"

রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের উপর দিয়া একখানা লঘু মেঘ চলিয়া গেলে নিম্নে প্রদীপ্ত ভূমি সহসা যেমন মলিন হইয়া যায়, বিনয়ের মুখমণ্ডলের অবস্থাও ঠিক তেমনি হইল। এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া সে বলিল, "সন্তোষবাবুর সঙ্গে কমলার বিয়ে হবার কথা হচ্ছে ?"

শৈলজা বলিল, "কথা হচ্ছে কেন, অনেকদিন থেকেই সে কথা ঠিক হ'য়ে আছে। জামাইয়ের মতোই ফন্তুদাদা আসেন যান থাকেন।

এতদিন বিয়ে হ'য়েই যেত—শুধু কমলার মার শরীর খারাপ, চেঞ্জে গেলেন ব'লেই হ'ল না। তিনি শিগগিরই ফিরে আসছেন, তারপর অগ্রাণ মাসেই বিয়ে হবে।"

ছোট একটি 'ও' বলিয়া বিনয় তোয়ালেটা আলনা হইতে লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বাথ-রুমে যাইবার জন্য উদ্যত হইল।

"যাই, তোমার চা-টা পাঠিয়ে দিই গে।" বলিয়া শৈলজা প্রস্থান করিল।

ভিতরে গিয়া শোভার কাছে উপস্থিত হইয়া শৈলজা সদ্যোত্থিত শোভার শ্লথ মূর্তি আর কুঞ্চিত বসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কিকাঠকুড়ুনীর মতো চেহারা ক'রে রয়েছিস! একদিন রাত্রি বারোটা পর্যন্ত জেগে ঘুম ভাঙল একেবারে বেলা আটটায়! যা, শিগগির বাথ-রুমে গিয়ে হাত পা মুখে সাবান দিয়ে একখানা কাপড় ছেড়ে চুলটা ঠিক ক'রে আয়।"

সবিস্ময়ে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হবে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শৈলজা বলিল, "তোকে দেখতে আসবে।"

পাশে ঠাকুরঘরে গিরিবালা পূজার আয়োজন করিতেছিলেন, শৈলজার শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা, কি হয়েছে গা?"

শৈলজা বলিল, "ও কিছু নয়। তুমি পূজো কর মা।"

আর কোনো কথা না বলিয়া গিরিবালা পুনরায় চন্দন ঘষায় মন দিলেন।

আধ ঘণ্টাটাক পরে যখন একটি কাঠের ট্রের উপর চা ও খাবার সাজাইয়া শোভা বিনয়ের নিকট উপস্থিত হইল, তখন বিনয় মুখ হাত ধুইয়া বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিয়া নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝা-

পড়া করিয়া লইতে ব্যস্ত। নিজের মনকে একটি স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা দিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া সে তখন বুঝাইতেছে—দেখ বাপু চিত্রকর, তুমি হচ্ছ ব্যবসাদার মানুষ, মাত্রাজ্ঞান ভুল ক'রে বেতালা হ'লে তোমার চলবে কেন? ভদ্রলোকের মেয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে তার চিত্ত ধ'রে টানাটানি করা তোমার পক্ষে একান্ত অনুচিত—বিশেষত ও-বস্তুটি যখন এমন যে টানলেই সব সময় আসে না, আবার না টানলেও সময়ে সময়ে এসে উপস্থিত হয়। তোমার রঙ-তুলির কারবার শেষ ক'রে দক্ষিণা বুঝে নিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র স'রে পড়। চিত্ত নিয়ে লীলা যদি করতেই হয় তো অন্যত্র;—অর্থাৎ যত্রতত্র নয়। চাওয়ার পিছনে যেখানে পাওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে চাওয়া একটা মস্ত বড় অকল্যাণ। পাওয়ার সম্ভাবনার অঙ্ক ক'ষে যে চায় সেই বুদ্ধিমান, সে অঙ্ক না ক'ষে যে চায় সে নির্বোধ।

মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া মন বলিল—তোমার এ হিসেবের অঙ্ক সংসারের মোটামুটি জিনিসের বিষয়ে খাটে; কিন্তু যে-সব বস্তু মানুষের সাধারণ খাতাপত্রের বাইরে, তার হিসেব শুভঙ্করী ধারাপাতের নিয়মে চলে না। বিবেচনার লাঠি ধ'রে যদি মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো যায়, তা হ'লে অকল্যাণের ভয় অনেকটা কম থাকে বটে, কিন্তু বাসনার পক্ষ বিস্তার ক'রে যদি আকাশপথে পাড়ি দিতে হয় তখন বিবেচনার লাঠিটিকে অনাবশ্যক ভারবোধ পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে। মানুষের মন শুধু পায়ে হেঁটে বেড়ায় না, ডানা মেলেও ওড়ে। ওড়ার বিপদ থেকে নিরাপদ করিবার জন্যে মনকে যদি শুধু বিবেচনার লাঠি ধ'রে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বল, তা হ'লে কেবলমাত্র মাটির অঙ্ক ক'ষে ক'ষে মন মাটি হবে।

মনের এরূপ অভিব্যক্তিতে বিনয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল; তীব্রকণ্ঠে সে বলিল—আচ্ছা, বিবেচনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বিবেক

ব'লেও তো একটা জিনিস আছে ?—যে বস্তু প্রায় অপরের অধিকারভুক্ত হয়েছে, সে বস্তুর প্রতি লোভ করা নীতিসঙ্গত হয় কি ?

সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়া গিয়া মন বলিল—এবার সংযমের কথা তুলবে তো ?

আরক্ত নেত্রে বিনয় বলিল—তুমি নিজেই যদি না তুলতে তা হ'লে নিশ্চয় তুলতাম।

ঠিক এমনিভাবে বাসনা আর বিবেকের তাড়নায় বিনয়ের মন কাঁপিতেছে, এমন সময় শোভা উপস্থিত হইয়া বলিল, "বিনুদা, আপনার চা এনেছি।"

পাশ ফিরিয়া শোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্রথমেই বিনয়ের চোখে পড়িল, শোভার স্নিগ্ধ শান্ত মাজা-ঘষা মুখখানিতে কপালের উপর একটি বড় সিঁদুরের টিপ। সহসা মনে হইল, এই টিপটিই যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান,—এ যেন দিগন্তের উপর পূর্ণিমার চাঁদের রূপটি বহন করিয়া আনিয়াছে, ইহার কিরণে সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বলতা না থাকুক, কমনীয়তার অভাব নাই।

শোভার হাত হইতে ট্রেটি লইয়া পাশের টেবিলে রাখিয়া বিনয় বলিল, "সকালে উঠেই অতবড় একটি সিঁদুরের টিপ পরেছ যে শোভা ?"

এই টিপটি পরিবার সময় শোভা বারম্বার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু শৈলজা জোর করিয়া পরাইয়া দিয়াছিল, শোভার কথা শুনে নাই। সেই টিপ লইয়া প্রথমেই কথা উঠিতে শোভা লজ্জিত হইল, মনে মনে শৈলজার উপর রাগও একটু করিল। আরক্ত মুখে সে বলিল, "বউদিদির কাণ্ড।"

"ও, তাই!" বলিয়া বিনয় একটু হাসিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, সিঁদুরের এই টিপটিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে শৈলজার কত আশা, কত আগ্রহ, কত চেষ্টা;—আর তাহার সঙ্গে হয়তো জড়িত হইয়া

রহিয়াছে একটি নারীহৃদয়ের কত আশঙ্কা, কত লজ্জা, কত বেদনা! নিয়তির এ কি নিষ্ঠুর কৌতুক! যে বেদনা সে নিজে পাইয়া ব্যথিত হইতেছে সে বেদনায় অপরকে ব্যথিত করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। উদগ্র আগ্রহ, উচ্ছ্বসিত আবেদনকে অগ্রাহ্য করিয়া সে চলিয়াছে যেখানে কোনো সাড়া নাই, কোনো অনুভূতি নাই তাহার পিছনে! স্রোতস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছে মরীচিকার প্রলোভনে!

"শোভা!"

"আজ্ঞে?"

"বউদিদির এখন অবকাশ আছে?"

"আমি দেখে এসেছি তিনি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন।"

"কত দেরি হবে?"

একটু ভাবিয়া শোভা বলিল, "আধ ঘণ্টাটাক। ডাকব?"

মাথা নাড়িয়া বিনয় বলিল, "না, তাও কি হয়! একটা কথা ছিল, তা সে অন্য সময় বলব অখন। গাড়ি এসে পড়ল, এখনি আবার কমলার ছবি আঁকতে যেতে হবে।"

আঙুলে আঁচলের কোণ জড়াইতে জড়াইতে শোভা বলিল, "আমাকে যদি ব'লে যান, আমি বউদিদিকে বলতে পারি।"

মনে মনে একটুখানি কি ভাবিয়া বিনয় বলিল, "তোমারই বিষয়ে কোনো কথা—কিন্তু সে বউদিদিকেই প্রথমে বলব। আর একটি কথা শোভা, যে সব কথা তোমার সঙ্গে এখন হ'ল সে কথাও বউদিকে এখন ব'লো না, বুঝলে?"

আরক্ত মুখে শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বলিবে না।

তাড়াতাড়ি চা আর জলখাবার খাইয়া ছবি আঁকিবার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া বিনয় গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া গেল।

২৫

ছবি শেষ করিবার সময়ের বিষয়ে সেদিন রাত্রে বিদায়-কালে বিনয় কমলাকে যে আন্দাজ দিয়াছিল, কার্যকালে তাহা দ্বিগুণ হইয়া গেল। প্রত্যহ ঘণ্টা দুই করিয়া নিরবসর পরিশ্রমের দ্বারাও আট দিনের আগে ছবি শেষ হইল না। আট দিনের দিন ছবি আঁকার পর তুলি রঙ প্রভৃতি গুছাইতে গুছাইতে বিনয় বলিল, "ছবি আঁকা শেষই হয়েছে—শুধু কাল একবার অল্পক্ষণের জন্যে এসে মিলিয়ে দেখব। নিতান্ত দরকার বুঝলে দু-একটা মাত্র টান দোব-না দিতেও পারি। আজ অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি কাজ হয়েছে যে, আজ দেখে ঠিক ঠাহর করতে পারব না।" তাহার পর কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "এবার আপনার অব্যাহতি মিস্ মিত্র, কিন্তু অনেক কষ্টভোগের পর।"

উত্তরে কমলা কিছু বলিল না; শুধু মুহূর্তের জন্য ওষ্ঠাধরে, অপরাহ্নকালের দিক্‌চক্রবালে নিঃশব্দ বিদ্যুৎপ্রভার মতো ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল।

অদূরে একটা ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত হইয়া দ্বিজনাথ ছবি আঁকা দেখিতেছিলেন, বিনয়ের কথায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কষ্টভোগের পর কি-না তা জানি নে, কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়ে তা নিশ্চয়। এ ক'দিন তুমি যে-ভাবে ছবি এঁকেছ তা দেখে মাঝে মাঝে সত্যিই আমার কষ্ট হ'ত বিনয়,—মনে হ'ত, মনকে অত বেশি একাগ্র করতে গিয়ে মনকে তুমি অতি মাত্রায় পীড়ন করছ।"

একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে বিনয় বলিল, "কিন্তু আমি তো দেখি, একাগ্র না হ'তে পারলেই মন যেন বেশি পীড়া পায়।"

বিনয়ের কথায় মনোযোগ না দিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া কমলার ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসন্নমুখে দ্বিজনাথ বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু কষ্ট যেমন তুমি করেছ, ফলও পেয়েছ তেমনি। এ কি সহজ ছবি হয়েছে? এমন একখানা ছবি কি যেখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়? এ তো শুধু কমলার মূর্তি নয়,—এ যেন কমলাকে আশ্রয় ক'রে তুমি কমলাসনার মূর্তিখানি এঁকেছ।" তাহার পর সন্তোষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি সেদিন যে-কথা বলছিলে সন্তোষ, তাতে কোনো ভুল নেই,—এ ছবিতে কমলাকে অনুকরণ করা হয় নি—সৃষ্টি করা হয়েছে।"

বারান্দার প্রান্তে একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া সন্তোষ গর্কির একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল, দ্বিজনাথের কথায় উঠিয়া আসিয়া ছবির সামনে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে ছবিখানার দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কিন্তু এ কয়েক দিনে ছবিটা অনেক বদলে দিয়েছেন বিনয়বাবু। আমি এসে যে উজ্জ্বল প্রফুল্ল মূর্তি দেখেছিলাম—একটা বিষাদের ছায়াপাতে আপনি তা ঢেকে দিয়েছেন।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "কিন্তু তাতে বোধ হয় ছবিটা আরও ভালই হয়েছে। প্রফুল্লতা যত উজ্জ্বলই হোক না কেন, বিষাদের কমনীয়তা তাকে স্পর্শ ক'রে না থাকলে সে হয় হাল্কা। তুমি ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো, প্রত্যেক সুন্দর হাসিকে কমনীয় করে চোখের কোণের ছলছলে ভাব কিংবা ঠোঁটের পাশের বিষাদের টান। তার অভাবে হাসি হয় একেবারে নীরস উগ্র,—যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায় সিগারেটের টিকিটের ছবিতে কিংবা বিলিতী তৃতীয় দরের ম্যাগাজিনে।"

কিছু না', বলিয়া দ্বিজনাথের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় একটু হাসিল, তাহার পর আর সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছবিখানা দেখিতে লাগিল। ছবির অধরপ্রান্তে বিষাদ-মেদুর সুমিষ্ট হাস্য, নেত্রদ্বয়ে অতল গভীর দৃষ্টি, মুখমণ্ডল অনির্বচনীয় বেদনায় স্তিমিত মাধুরী—সমস্ত ভঙ্গিটি আলো-ছায়াখচিত বর্ষা-দিনান্তের কথা মনে করাইয়া দেয়। মুগ্ধ চিত্তে সকলে অপরূপী রূপমণ্ডিত চিত্রখানি দেখিতে লাগিল—এমন কি বিনয়-কমলাও।

যাইবার সময় বিনয় বলিল, "কাল আমি সকালে না এসে বিকেলের দিকে আসব। সকালে আমি দেওঘরে থাকব না।"

দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

বিনয় বলিল, "মধুপুর। আমার একটি বন্ধু পীড়িত হ'য়ে চেঞ্জে আসছেন। একবার দেখে শুনে আসব।"

"ক'টার গাড়িতে যাবে?"

"সম্ভবত আজ রাত্রি সাড়ে দশটার গাড়িতে। আমার বন্ধু পৌঁছবেন রাত্রি একটার সময়, আমি তার কিছু আগে মধুপুরে পৌঁছব। আমার আঁকবার সাজ-সরঞ্জামগুলো আজ এইখানেই রইল—কাল পাঁচটার গাড়িতে ফিরে স্টেশন থেকে একেবারে এখানে আসব।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ও বেলা সন্ধ্যার সময়ে এখানে এসো; এখান থেকে রাত্রে খেয়ে-দেয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠবে।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "আজ্ঞে না, তার আর দরকার নেই। আমি রাত্রি সাড়ে দশটার গাড়িতেও যেতে পারি, সন্ধ্যা ছটার গাড়িতেও যেতে পারি, এখনো একেবারে স্থির করতে পারি নি।" তাহার পর নিমন্ত্রণ অস্বীকার করায় দ্বিজনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বলিল, "কাল মধুপুর থেকে ফিরে এখানে এসে চা খাওয়া যাবে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন, "আজ রাত্রে খেয়ে গেলেই কি কাল চা-টা বাদ পড়ত? আচ্ছা, তোমার যেমন সুবিধা হয় ক'রো।"

বিনয় প্রস্থান করিলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "এমন অদ্ভুত মানুষ যদি দুটি আছে, কিছুতে যদি ধরা-বাঁধা দেবে! ছেলেবেলা থেকে জীবনটা অনাত্মীয়ের মধ্যে কেটেছে ব'লে আত্মীয়তাটা বোধ হয় ওর বরদাস্ত হয় না। নিজে কোনোমতে ধরা দেবে না, অথচ—"

কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া সে কথা সহসা বন্ধ করিয়া দ্বিজনাথ একটা চুরুট ধরাইতে উদ্যত হইলেন।

সকৌতূহলে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল, "অনাত্মীয়ের মধ্যে কেন? ওঁর বাপ মা নেই না-কি?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে কি আজকাল নেই? শিশুকাল থেকে নেই। তা ছাড়া শুধু কি বাপ-মাই নেই? তিন কুলের মধ্যে এক কুল তো এখনো হয় নি—বাকি দু কুলে কে আত্মীয় কোথায় আছে তা ও কিছুই জানে না।"

সবিস্ময়ে সন্তোষ বলিল, "কেন?"

তখন দ্বিজনাথ বিনয়ের মুখে তাহার জীবনের যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন সবিস্তারে বিবৃত করিলেন।

কৌতূহলী সন্তোষ দ্বিজনাথকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কমলা একটি কথাও বলিল না,—বিনয়ের জীবনের করুণ কাহিনী তাহার মনে যে বেদনার তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার আবেশে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহহীন স্বজনহীন বিনয়ের কথা মনে করিয়া করুণায় আর সহানুভূতিতে তাহার সমস্ত অন্তর আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কাহার জন্য এ আক্ষেপ করিতেছি? যাহার

জন্য, সে তো নিশ্চল নির্বিকার! প্রবৃত্তি নাই, অথচ মুখে সর্বদা সংযম আর সংযম! না কেহ তাহাকে বুঝিতে পারে, না সে কাহাকেও বোঝে। বাবা ঠিক বলিয়াছেন, নিজে ধরা-ছোঁয়া দেবে না, অথচ—

সহসা মনে পড়িল শোভার কথা—সে সেদিন বলিতেছিল, শৈলজা তাহাকে বলিয়াছে বিনয় কমলাকে ভালবাসে। মনে মনে মাথা নাড়িয়া কমলা বলিল, ভুল, ভুল, ও সমস্ত ভুল। নিজের মনের মধ্যে যে মস্ত বড় ব্রেক্ কষিয়া বসিয়া আছে, মনকে সে আল্‌গা দিবে কেমন করিয়া?

"বাবা!"

"কি মা?"

"বেলা অনেক হ'ল। এবার নাওয়া খাওয়ার জন্যে উঠলে ভাল হয়।"

হাতের কব্জিতে-বাঁধা ঘড়ি দেখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তাই তো, এগারটা বাজে। চল সন্তোষ, আর দেরি ক'রে কাজ নেই। কিন্তু তুমি যে কথা বলছ,—আমার ঠিক তা মনে হয় না। সংসার ব'লে কোনো জিনিসের বাঁধন নেই ব'লে বিনয় একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে পারে, কিন্তু সে অসামাজিক নয়। সংসার তার নেই বটে, কিন্তু সমাজ ছাড়া সে কখনো নয়। বরঞ্চ, সাধারণত লোকের যেমন হয়, তার চেয়ে বেশি সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার তার সুযোগ হয়েছে।"

মৃদু হাসিয়া সন্তোষ বলিল, "আপনি লক্ষ্য করেছেন কি-না বলতে পারি নে, গত আট দিনে ছবি আঁকবার সময়ে বিনয়বাবু সবসুদ্ধ আটবার কথা বলেছেন কি-না সন্দেহ। কোনো কোনো দিন তো একেবারেই বলেন নি—এমন কি আমাদের কথার প্রসঙ্গেও নয়।"

স্মিতমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "ওটা ওর খেয়ালী প্রকৃতির জন্যে;

যখন যেমন মুড এ থাকে তখন তেমন। দেখলে তো সেদিন রাত্রে ও-ই হয়েছিল প্রধান বক্তা—মুখে যেন কথার তুবড়ি ফুটছিল!"

সন্তোষ বলিল, "কিন্তু সেদিন কমলার সঙ্গে ও-রকম তীব্রভাবে তর্ক করা খুব উঁচুদরের বক্তৃতা হয়েছিল ব'লে বোধ হয় না। বলতে পারি নে আপনাদের সঙ্গে বিনয়বাবুর কি রকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছে; কিন্তু প্রত্যহ ছবি আঁকতে আসাই যদি একমাত্র পরিচয় হয়, তা হ'লে সেদিন তিনি ঠিক সঙ্গত সীমার মধ্যে ছিলেন না।"

দ্বিজনাথকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া কমলা বলিল, "বাবা, ঠিক সময়ে তোমার খাওয়া না হ'লে ও-বেলা মাথা ধরবে।" মুখে তাহার একটু অসন্তোষের রক্তিমা, যাহা সন্তোষের অন্বেষী দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

পদ্মমুখীর নিকট হইতে ইঙ্গিত লাভ করিয়া পর্যন্ত যে সংশয় সন্তোষের মনে প্রবেশ করিয়াছিল, গত কয়েক দিনে তাহার আয়তন ক্রমশই বর্ধিত হইয়াছে। কমলা অথবা বিনয়ের আচরণে অবশ্য এমন কিছু ঘটে নাই যাহা সাধারণত সংশয় উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু সংশয় এমন বস্তু যাহা মনের মধ্যে একবার আশ্রয় লইলে মৌনও অর্থময় হইয়া উঠে এবং উপেক্ষাকেও আগ্রহের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। তাই তাহার কথার বাধা স্বরূপ কমলার অন্য কথা পাড়া এবং কমলার মুখে বিরক্তির চিহ্ন—উভয়ের মধ্যে কোনোটিই সন্তোষের লক্ষ্য অতিক্রম করিল না। ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে সে বলিল, "আচ্ছা, এ সব কথা তা হ'লে থাক্।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই ভাল। চল, নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।"

২৬

পরদিন সকালে নিজের ঘরে বসিয়া কমলা একখানা কলেজের বই উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে একজন চাকর আসিয়া খবর দিল—বিনয় আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কমলা দেখিল, বিনয় ফিরিয়া যাইতেছে। দ্রুতপদে বিনয়কে খানিকটা অনুসরণ করিয়া একটু কাছাকাছি আসিয়া ডাকিল, "বিনয়বাবু!"

বিনয় তখন প্রায় গেটের কাছে পৌঁছিয়াছিল, কমলার আহ্বানে ফিরিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "এঃ, আপনি আবার কষ্ট করলেন কেন? আমি তো একজন চাকরকে ব'লে দিয়েছিলাম আপনাকে জানাতে—ও-বেলাই আসব।"

সে কথায় কোনো কথা না বলিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তা হ'লে আপনার মধুপুর যাওয়া হয় নি?"

বিনয় বলিল, "না, কাল যাওয়া হয় নি; আজ বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে যাচ্ছি। মনে করছিলাম আপনার ছবিটা সেরে দিয়েই যাই; বেশিক্ষণ তো লাগবে না—হয়তো একেবারেই কিছু করতে হবে না। কিন্তু গ্যারেজে গাড়ি নেই দেখে খবর নিয়ে জানলাম, মিস্টার মিত্র বেরিয়েছেন।"

কমলা বলিল, "হ্যাঁ, বাবা আর সন্তোষবাবু রিকিয়ায় গেছেন, বেলা এগারটার মধ্যে তাঁরা ফিরবেন। রিকিয়ায় সন্তোষবাবুর একজন আত্মীয় আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কিন্তু আপনি ফিরে

যাচ্ছিলেন কেন? এসেছেন যখন, তখন ছবির ব্যাপারটা শেষ ক'রেই দিন না।"

একটু ইতস্তত করিয়া বিনয় বলিল, "থাক্, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই তো, ও-বেলাই হবে অখন। মিস্টার মিত্র উপস্থিত থাকবেন, সুবিধে হবে।"

কমলার মনের কোন্ নিভৃত কোণে একটুখানি অভিমান আহত হইল; বলিল, "বাবা উপস্থিত না থাকলে যদি ছবি আঁকবার বিষয়ে আপনার অসুবিধে হয় তা হ'লে থাক্। কিন্তু আপনি এখন যাচ্ছিলেন কোথায়? গাড়ি তো আপনার সাড়ে দশটায়, আর এখন সাড়ে আটটাও হয় নি,—এ দু ঘণ্টা আপনি কোথায় কাটাবেন?"

মৃদুস্মিত মুখে বিনয় বলিল, "ঘণ্টা খানেক এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বাকি এক ঘণ্টা স্টেশনে। দু ঘণ্টা তো অল্প সময়,—নষ্ট করবার এমন কৌশল আমার জানা আছে যে, দু ঘণ্টার পরিবর্তে চার ঘণ্টা হ'লেও আমার ভাবনা হ'ত না।"

কমলা বলিল, "শুধু সময় নষ্ট নয়, শরীর নষ্টর বিষয়েও আপনার ভাবনা হয় না। কিন্তু সকলেই তো আপনার মতো ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। চলুন, ছবি আপনার আঁকতে হবে না, এ সময়টা আমাদের বাড়িতে ব'সে কাটাবেন, অবশ্য যদি-না বাবা উপস্থিত নেই ব'লে সে বিষয়েও অসুবিধে বোধ করেন। এই ভাদ্র আশ্বিন মাসের রৌদ্রে খালি মাথায় এক ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবার শখ পরিত্যাগ করুন।"

নীরবে একটু কি চিন্তা করিয়া বিনয় বলিল, "এতখানি সময় আপনাকে আটকে রাখব?"

"রাখবেন।"

দ্বিধা-বিক্ষুব্ধ স্বরে বিনয় বলিল, "তা হ'লে রাখি।"

পূর্বদিন দ্বিজনাথের মুখে বিনয়ের জীবন-কাহিনী শুনিয়া কমলার মনে যে বেদনা সঞ্জাত হইয়াছিল, আজ তাহা তাহার অন্তরকে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। মনে হইল, আহা! মা নাই বাপ নাই, ভাই নাই বোন নাই, গৃহ নাই সংসার নাই—তাই এমন! তাই খালি মাথায় রৌদ্রে রৌদ্রে এক ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইলেও কষ্ট হয় না, তাহার পর আবার আর এক ঘণ্টা চুপ করিয়া স্টেশনে বসিয়া সময় কাটাইতেও দুঃখ বোধ করে না। গৃহ যাহার নাই, স্টেশনই তাহার পক্ষে কম আশ্রয় কি! আত্মীয়স্বজন যাহার নাই, স্টেশনের লোক-জনেরাই তাহার পক্ষে অনাত্মীয় কেমন করিয়া! একটা অনির্বচনীয় মমতায় কমলার চিত্ত মথিত হইতে লাগিল। মনে হইল, এই গগনবিহারী ক্লান্তপক্ষ পাখী শাখায় নীড় বাঁধুক, স্বজনহীন স্বজন লাভ করুক, বৈরাগী সংসারী হউক।

বারান্দায় উঠিয়া বিনয় বলিল, "এলামই যখন, তখন ছবিটা আনতে বলুন—একবার দেখি কেমন হ'ল!"

কমলা বলিল, "আচ্ছা, আপনি বসুন, সে না হয় পরে দেখবেন। আমাকে বলুন তো আপনি যে যাচ্ছেন, তাঁরা কি জানেন—আজ আপনি যাবেন?"

বিনয় বলিল, "না, তা ঠিক জানেন না।"

"তা হ'লে, আপনি তো পৌঁছবেন বেলা একটা-দেড়টার সময়ে—তখন তাঁদের নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে যাবে—আপনার খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?"

এ সব প্রশ্ন কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্ভূত তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়া বিনয় বলিল, "পৌঁছতে একটা-দেড়টা না হ'লেও আমি তাদের গোলমালের বাড়িতে খাওয়ার গোলোযোগ করব না

তা স্থির ক'রেই যাচ্ছি। আমি মধুপুর স্টেশনে কেল্‌নারের হোটেলে খাওয়া সেরে তারপর তাদের বাড়ি যাব। তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।"

কমলা বলিল, "তার চেয়েও কম অসুবিধে হবে আপনি যদি ঘণ্টাখানেক পরে এখানে চারটি ঝোল ভাত খেয়ে যান, তা হ'লে তাতে শরীরও বাঁচবে, সময়ও বাঁচবে।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিনয় বলিল, "না না মিস্ মিত্র, ও-সব হাঙ্গামা আপনি করবেন না।"

কমলার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল; বলিল, "'মিস্ মিত্র' ব'লে আমাকে না ডেকে যদি 'মিশ কালো' ব'লে ডাকেন তা হ'লেও করব। আচ্ছা, আপনার এ কি অন্যায় বলুন দেখি? এত অনাত্মীয়ের মতো ভদ্রতা রেখে চলতে চান কেন আমাদের সঙ্গে? বেলা দশটার মধ্যে আমাদের সমস্ত রান্না হ'য়ে যায়, একটু তৎপর হ'য়ে সাড়ে নটার সময় আপনাকে খাইয়ে দেওয়া কি এতই হাঙ্গামা হবে? না, সে আমি কিছুতেই শুনব না,—খেয়ে যেতেই হবে আপনাকে। অবশ্য, এ বিষয়েও যদি আপনি বাবা বাড়ি নেই ব'লে আপত্তি তোলেন তা হ'লে নিতান্তই নাচার!"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "না না, সে আপত্তি আমি একবারও তুলছি নে—আমি আপনাকেই অনুরোধ করছি।"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও অদ্ভুত আপত্তি যদি আপনি না তোলেন, তা হ'লে অনুরোধ কেন, আদেশ করলেও আমি আপনার কথা শুনব না।" অদূরে একজন চাকর কাজ করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া কমলা বাবুর্চিকে ডাকিতে বলিল। বিনয় অনেক ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু সে তাহাতে একেবারেই কর্ণপাত করিল না।

বাবুর্চি আসিলে কমলা বলিল, "সাড়ে দশটার গাড়িতে বিনয়বাবু মধুপুর যাবেন — কতক্ষণ পরে তাঁকে খানা দিতে পারবে ?"

একটু ভাবিয়া বাবুর্চি বলিল, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দিতে পারিবে।

"আচ্ছা, ঠিক সাড়ে নটার সময় উনি খেতে বসবেন।"

বাবুর্চি সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বিনয় বলিল, "এবার তা হ'লে ছবিখানা আনান—আমার আপত্তি অগত্যা প্রত্যাহার করছি।"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "আনাচ্ছি।"

ছবি আনা হইলে কমলাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া বিনয় অনেকক্ষণ ধরিয়া কমলাকে এবং তাহার ছবিকে মিলাইয়া দেখিল। তাহার পর তুলি লইয়া দুই-চারিটা টান-টোন দিয়া বলিল, "শেষ হ'ল। আর কিছু করবার নেই।" তাহার পর তুলিগুলা তুলিতে তুলিতে বলিল, "এ ভারি খারাপ জিনিস, হাতে থাকলে হাত নিস্‌পিস্ করে—তার ফলে অনেক ছবি ভাল করতে গিয়ে খারাপ ক'রে ফেলেছি। যথাসময়ে একে নির্বাসিত না করতে পারলে বিপদ।"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন ভয়ঙ্কর জিনিস তা হ'লে একেবারে তুলে ফেলুন।"

বিনয় তুলি তুলিয়া ফেলিল, কিন্তু ছবিটিকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল। নিকট হইতে দূর হইতে, সম্মুখ হইতে পাশ হইতে, নানাভাবে দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন তাহার আশ মেটে না। একবার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া দেখিল, একবার চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, খানিকক্ষণ অন্য দিকে চাহিয়া কি ভাবিল—তাহার পর রিস্ট-ওয়াচ দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নটা বেজে পনের মিনিট। এবার ছবিটা তুলে ফেলতে বলুন। ও যা হবার তা হয়েছে।"

চাকর আসিয়া ছবি তুলিয়া রাখিল। কমলা বলিল, "এবার আপনার খাওয়ার উৎযুগ করি।"

ঘড়ির দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় বলিল, "এখনো বোধ হয় কিছু সময় আছে। লাইন ধ'রে হেঁটে গেলে স্টেশনে পৌঁছতে ক মিনিট লাগবে?"

কমলা বলিল, "মিনিট দশেকের বেশি নয়।"

"ওঃ, তা হ'লে অনেক সময় আছে। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অপরে যে যাই বলুক, ছবিটা আপনার নিজের কেমন লাগল? এ প্রশ্ন আমি যার ছবি আঁকি তাকেই করি।"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "আমার খুব ভাল লেগেছে। যদিও ছবিটায় যেমন আমি আছি তা না এঁকে যেমন আমি হ'লে ভাল হ'ত তাই আপনি এঁকেছেন—তবু কি জানি কেন, ছবিটা আমার ভারি ভাল লাগে। বোধ হয় মনে হয়—এই রকমই আমি যদি হতাম!"

কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় বলিল, "ওই রকমই আপনি—সন্তোষবাবুর কথা বিশ্বাস করবেন না।" তাহার পর কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "সত্যিই ছবিটা ভাল হয়েছে—এত ভাল ছবি এর আগে কখনো আমি আঁকি নি—পরেও কখনো আঁকতে পারব ব'লে মনে হয় না।" তারপর সোজাসুজি কমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার বাবা যদি টাকা ফেরত নিয়ে ছবিটা আমাকে ছেড়ে দেন তা হ'লে আমি খুশি হ'য়ে ছবিখানা নিয়ে যাই।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া কমলার মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। বিনয়ের অনাত্মীয়তার আচরণে তাহার মনে ধীরে ধীরে যে অমেয় অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল সহসা তাহা সাড়া দিয়া উঠিল। ঈষৎ কঠিন স্বরে সে বলিল, "বাবা রাজী হন কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু তিনি

যদি টাকা ফেরত না নিয়েও আপনাকে ছবিখানা দিতে রাজী হন, তা হ'লেও আমি রাজী হই নে।"

কমলার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "কেন?"

উচ্ছ্বাসের সহিত কমলা বলিল, "কি আশ্চর্য বিনয়বাবু, এই সহজ কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনি আপনার কাছে আমার ছবি রাখবেন কেন?—তার জন্যে তো একটা কারণ থাকা চাই, যা হয় একটা-কিছু অধিকার থাকা চাই। ফোটো যারা তোলে তারা অনেক সময় নেগেটিভ পর্যন্ত নিজেদের কাছে রাখে না—পজিটিভের কথা তো দূরের কথা। আপনাদের প্রোফেশনের নীতি আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

কমলার কথা শুনিয়া বিনয়ের মুখখানা একেবারে মেঘে-ভরা শ্রাবণ-আকাশের মতো কালো হইয়া উঠিল। স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সত্যি, সে অধিকার যে আমার নেই তা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি একেবারে প্রোফেশনাল, একেবারে স্ট্রেন্‌জার।"

কিছু না বলিয়া কমলা স্তব্ধ হইয়া দূরবর্তী ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা একটা কথা মনে পড়ায় বিনয় সজোরে বলিয়া উঠিল, "এমনই যদি আমাকে পেশাদার ব'লে মনে করেন তবে আমাকে খাইয়ে দেওয়ার জন্যে এত পেড়াপিড়ি করলেন কেন? আমি অনাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করি ব'লে অত অনুযোগ করছিলেন কেন? বলুন?"

কমলা যেন হঠাৎ তন্দ্রোত্থিত হইয়া উঠিল; অনুতপ্ত-স্বরে বলিল, "সত্যি, আমি আপনার খাওয়ার কথা একেবারে ভুলে গেছি—বোধ হয় দেরি হ'য়েই গেল। এ সব বাজে কথা এখন থাক্—আমি চললাম আপনার খাবার আনতে।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ভিতরে গিয়া কমলা দেখিল, পদ্মমুখী তখনো পূজোর ঘরে পূজা করিতেছেন। বাবুর্চির কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিল, আহার্য প্রস্তুত; বলিল, "শিগগির ভাত বেড়ে ফেল, আমি ভাঁড়ার ঘর থেকে ঘি নিয়ে আসছি।" চাকরকে বলিল, "বাবুর সামনে টেবিল দে, আর জল তোয়ালে সাবান নিয়ে যা।"

অনুতাপে কমলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। মনে মনে বলিল, ছি, ছি, কি করলাম,—জোর ক'রে মানুষকে খেতে বসিয়ে রেখে কটূক্তি করলাম! নিজের অন্যায় আচরণের জন্য কমলা মনে মনে শতবার আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগিল।

ভাত বাড়া হইলে তপ্ত ভাতের উপর অনেকখানি গাওয়া ঘি ঢালিয়া দিল। নিজ হাতে লেবু কাটিয়া নুন দিয়া ভাতের থালাখানা নিজে তুলিয়া লইয়া বাবুর্চিকে মাছ মাংস লইয়া আসিতে বলিয়া কমলা প্রস্থান করিল। বারান্দায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, চেয়ার শূন্য—বিনয় নাই। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। জীবন বাগানে কাজ করিতেছিল, উচ্চকণ্ঠে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন, বাবু কোথায় গেলেন?"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া জীবন বলিল, "বাবু চ'লে গেলেন দিদিমণি! আপনাকে বলতে ব'লে গেলেন—খাবার ইচ্ছে নেই, খাবেন না।"

স্তম্ভিত হইয়া নিরুদ্ধ শ্বাসে কমলা এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বাবুর্চির হাতে ভাতের থালাখানা দিয়া হাত ধুইয়া ঘরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

২৭

অনুতাপ এবং অভিমান সমজাতীয় বস্তু না হইলেও উভয়ই কমলার চিত্তকে যুগপৎ অধিকার করিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। ফলে, রাগ হইল নিজের প্রতি যেমন, বিনয়েরও প্রতি তেমনি। টাকা ফেরত দিয়া বিনয় কমলার ছবি অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কমলার বাক্যে যে রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল বাহির হইতে সহজ দৃষ্টিতে তাহার কারণ একমাত্র ক্রোধ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু সামান্য ক্রোধকে উপলক্ষ্য করিয়া পুঞ্জীভূত যে বৃহৎ অভিমান উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সন্ধান পাইলে হয়তো বিনয় ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া যাইত না। নিনাদ শুনিয়া যে-মেঘকে বজ্রগর্ভ মনে করিয়াই চলিয়া গেল, সে যে বারিবিন্দুরও আশ্রয়স্থল—সে কথা ভাবিয়া দেখিল না। এ কথাও সে ভাবিয়া দেখিল না যে, মানুষ যখন তার প্রিয়জনের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময়ের সুযোগ খুঁজিয়া পায় না, তখন সে তাহার সহিত কলহ করে। কারণ, দুর্যোগ হইলেও কলহ একটা যোগ; তাহার দ্বারা আর যাহাই ব্যক্ত হউক, ঔদাসীন্য ব্যক্ত হয় না। কমলার ছবির প্রতি বিনয়ের লোভাতুরতায় কমলা যে তাহার নিজেরও প্রতি বিনয়ের অনুরাগের একটু আভাস পায় নাই, তাহা নহে,—কিন্তু সে তাহার উদগ্র আগ্রহের কাছে এতই সামান্য যে, ততটুকুতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে না পারিয়া সমস্তটা স্পষ্টতরভাবে জানিবার ব্যস্ততায় সে বিনয়ের সঙ্গে একটা সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করিয়া সে তাহার গভীরতা নির্ণয় করিতে গিয়াছিল। তাই বলিয়াছিল, 'আপনি আপনার কাছে আমার ছবি রাখবেন কেন? তার তো একটা

কারণ থাকা চাই, যা-হয় একটা কিছু অধিকার থাকা চাই।' ফলে কিন্তু বিপরীত হইল।

বাহিরে পরিচিত হর্নের শব্দ শুনিয়া কমলা বুঝিতে পারিল, দ্বিজনাথ আসিয়াছেন। তাকাইয়া দেখিল, ঘড়িতে তখন দশটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। গাড়ি ছাড়িতে তখনো দশ মিনিট বাকি। একবার মনে করিল, দ্বিজনাথকে সঙ্গে লইয়া মোটর করিয়া স্টেশনে গেলে এখনো হয়তো ধরিয়া আনা যায়; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, বিনয় তো ফিরিয়া আসিবেই না, অধিকন্তু দ্বিজনাথের নিকট সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া গুরুতর লজ্জার কারণ ঘটিবে। দ্বিজনাথ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় কমলা তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া চেয়ারে বসিয়া তাহার পড়িবার টেবিলের উপর রূপার্ট ব্রুকের একখানা কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

পরক্ষণেই বাহিরের বারান্দায় ডাক পড়িল, "কমলা, কমলা, কমল!"

দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া কমলা বলিল, "বাবা?"

একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমি একাই ফিরে এলাম। সন্তোষকে তার বন্ধু এ বেলা কিছুতেই ছাড়লেন না;—বিকেলবেলা তিনি তাঁর নিজের গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। অতএব এ বেলা তোমাতে আমাতে একসঙ্গে খেতে বসব।"

গিরিডি আসিয়া পর্যন্ত দ্বিজনাথ কমলাকে সঙ্গে না লইয়া আহার করেন না। সন্তোষ উপস্থিত থাকিলে কিন্তু তাহা হয় না—কমলা আপত্তি করে। আজিকার আহারে সন্তোষ অনুপস্থিত থাকিবে বলিয়া দ্বিজনাথ কমলাকে আহারে আহ্বান করিলেন।

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া কমলা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যে খাদ্য অভুক্ত ফেলিয়া অনাহারে বিনয় চলিয়া গিয়াছে, বিনয় মধুপুরে পৌঁছিবার

পূর্বে সেই খাদ্য তাহাকে খাইতে হইবে মনে করিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার অপরাধের ইহার চেয়ে কঠোরতর দণ্ড আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হইল না। মনের চঞ্চল অবস্থা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কমলা বলিল, "আমার এখন একটুও ক্ষিধে নেই বাবা, তোমার খাবার দেবার ব্যবস্থা করি।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমারই কি এখন ক্ষিধে আছে?—খানিক পরেই খাওয়া যাবে অখন। এখন তো সাড়ে দশটাও বাজে নি। তার ওপর সন্তোষের বন্ধু কিছুতেই ছাড়লে না, একটু জল খেতেই হ'ল সেখানে।"

তাহার পর দ্বিজনাথ রিকিয়া এবং সন্তোষের বন্ধুর বিষয়ে গল্প শুরু করিয়া দিলেন। কমলা এমনভাবে দ্বিজনাথের দিকে চাহিয়া রহিল এবং মধ্যে মধ্যে সামান্য দুই-একটা কথা দিয়া গল্পের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিল যে, মনে হইতেছিল সব কথাই সে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে; কিন্তু কানের আর প্রাণের মধ্যে তখন এমন একটা অসহযোগ চলিতেছিল যে, কান দিয়া যত কথা প্রবেশ করিতেছিল তাহার অর্ধেকও চেতনার তারে আঘাত করিতে সমর্থ হইতেছিল না।

কলিকাতাগামী এক্সপ্রেস্ গাড়ি নীচের অধিত্যকা দিয়া সশব্দে দ্রুতবেগে ধূমোদ্গার করিতে করিতে চলিয়া গেল। গাড়ি দেখা গেল না, কিন্তু উর্ধ্বোত্থিত ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়ার দিকে তাকাইয়া কমলার মন কালো হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে ধোঁয়া যেন বিনয় কর্তৃক উৎসারিত অপমানের গ্লানি, যাহাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডল এখনি বিষাইয়া উঠিবে। নিশ্বাস যেন ভারী হইয়া আসিল। দ্বিজনাথের কথা শুনিতে শুনিতে কমলা একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিল, সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, সাড়ে দশটার গাড়ি চ'লে গেল, আর বেশি দেরি করলে

তোমার অনিয়ম হবে। যাই, তোমার খাওয়ার উয্‌যুগ দেখি গে।” বলিয়াই অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, “এর মধ্যে কেউ এসেছিল কমল ?”

ফিরিয়া না দাঁড়াইয়া যাইতে যাইতে কমলা বলিল, “আমি এখনি আসছি বাবা।” তাহার পর দ্বিজনাথকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম্‌ যে দ্বারটা ডান দিকে পাইল তাহা দিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টাটাক পরে খাবার ঘরে উপস্থিত হইয়া দ্বিজনাথ দেখিলেন, যথারীতি কমলা উপস্থিত আছে, কিন্তু টেবিলে মাত্র একজনের খাবার।

“তোমার খাবার কমলা ?”

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, “আমার এখনো তেমন ক্ষিধে হয় নি বাবা, —আমি পরে খাব অখন।”

কন্যার মুখ একটু মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দ্বিজনাথ দেখিলেন, সেই মৃদু হাস্যের মধ্যে চোখ দুইটি ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। চিন্তিত হইয়া বলিলেন, “কি হয়েছে কমল ? অসুখ-টসুখ করে নি তো ?”

মাথা নাড়িয়া কমলা বলিল, “না বাবা, অসুখ-টসুক কিছু করে নি ; এমনি এখন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।”

দ্বিজনাথ বলিলেন, “আচ্ছা, তা হ'লে ক্ষিধে হ'লে খেয়ো।”

বেলা দুইটার সময়ে দ্বিজনাথ তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষে পদ্মমুখীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পদ্মমুখী আসিলে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে পিসিমা। ঐ চেয়ারটায় একটু ব'স।"

আসন গ্রহণ করিয়া পদ্মমুখী সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরামর্শ বাবা?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "কমলের বিয়ের সম্বন্ধে তুমি বিমলকে সীলোনে বোধ হয় কিছু লিখেছিলে? আজ সকালে বিমলের চিঠি পেয়েছি—তার চিঠি থেকে সেই রকম মনে হয়।"

পদ্মমুখী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম—সন্তোষের সঙ্গে কমলার বিয়ের যে কথাটা রয়েছে সেটা আধাআধি না রেখে একেবারে পাকা ক'রে ফেলা ভাল। এমন চাঁদের মতো ছেলে সন্তোষ, ওর সঙ্গে কমলের বিয়ে হ'লে তো আমাদের সৌভাগ্যের কথা। রূপে গুণে, ধনে মানে, স্বভাবে চরিত্রে, এমন আর-একটি কোথায় পাবে বল?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বিমলও সেই কথা বলে; আমারও মতে পাত্র হিসেবে সন্তোষ কমলার অযোগ্য নয়; তোমার মত তো জানতেই পারলাম। কিন্তু কমলের মনের কথা কিছু বুঝতে পার পিসিমা? তার ইচ্ছে আছে তো?"

পদ্মমুখী দেখিলেন, যে-বিষয়ে শৈলজা এবং তিনি সাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে মহা সুযোগ উপস্থিত; এ সুযোগকে অবহেলা করিলে পরে অনুতাপ করিতে হইতে পারে। তাহা ছাড়া পদ্মমুখীর মতে, সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন

করায় কোনো অন্যায় নাই; বিষ খাওয়াইলে রোগীর যদি প্রাণরক্ষা হয় রোগীকে বিষ খাওয়াইতে চিকিৎসকেরা দ্বিধা বোধ করে না। উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "ওমা! ইচ্ছে আবার নেই? খুব ইচ্ছে। সন্তোষের কথা বললেই কমলার মুখখানি কেমন হাসি হাসি হ'য়ে লাল হ'য়ে ওঠে—কান দুটি খাড়া হ'য়ে থাকে।" বনেদ একেবারে পাকা করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "সুকুমারবাবুর পরিবার শৈলজা সেদিন বল্‌ছিল—শোভার কাছে কমলা বলেছে, সন্তোষের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে আছে। আরও কত কি সব কথা পাগলীর মতো বলেছে—সে আর তোমাকে কি বলব?" বলিয়া মুচকিয়া একটু হাসিলেন।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে আজ সন্ধ্যার পর সন্তোষের সঙ্গে কথাটা শেষ ক'রেই ফেলি। ও-ও বোধ হয় চাইছে, এ বিষয়ে একটা পাকা কথা হ'য়ে যায়।"

অতিশয় উল্লসিত হইয়া পদ্মমুখী বলিলেন, "এ খুব ভাল কথা দ্বিজ, আজই তুমি সমস্ত কথাবার্তা শেষ ক'রে ফেল। বিয়ে-থাওয়ার কথা তো কিছু বলা যায় না বাবা, কোন্ দিক দিয়ে কখন কি বিঘ্ন এসে জোটে!"

মনে মনে একটা কি কথা চিন্তা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "কোনো বিঘ্ন এসে জুটেছে ব'লে কি তোমার মনে হয় পিসিমা?"

উল্লাসের মত্ততায় সতর্কতার দিকটা পদ্মমুখীর আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, বলিলেন, "জোটে নি তাই বা বলি কি ক'রে? তোমার ওই ছবি-আঁকিয়েটিকে আমার কেমন ভাল লাগে না দ্বিজ। ওই তো আজ সকালে এসে কি সব হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে গেল, তাই না মেয়েটা এখন পর্যন্ত উপোস ক'রে প'ড়ে রয়েছে।" কথাটা বলিয়াই কিন্তু

নিজেরই কানে কি রকম খারাপ শুনাইল; মনে হইল, পাকা বনেদটা যেন একটু কাঁচিয়া যাইবার দিকে গেল। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে অবিশ্যি এমন কোনো কথাই নয়। তবে কি জান? সাবধানের বিনাশ নেই।"

দ্বিজনাথ কিন্তু কথাটাকে সামান্য বলিয়া একেবারেই উপেক্ষা করিলেন না; ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "কমল এখনো খায় নি?"

"না, কই আর খেয়েছে?"

"সকালবেলা বিনয় এসেছিল?"

"এসেছিল বইকি। খানিকক্ষণ ছবি-টবি এঁকে চ'লে গেল।" আহার লইয়া যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল সে কথাটা না বলাই ভাল বিবেচনা করিয়া পদ্মমুখী সে কথার কোনো উল্লেখ করিলেন না।

কিন্তু সে কথাও চাপিয়া রাখা গেল না; পদ্মমুখীর কথার গুরুতম অংশটা দ্বিজনাথের মনে ছিল; বলিলেন, "তুমি যে বললে পিসিমা, সকালে এসে বিনয় হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে গেল, সে কী কথা?"

এবার পদ্মমুখীর মুখ শুকাইয়া উঠিল,—মনে হইল নিজের কথাটা বুঝি সঙ্গে সঙ্গে এমনি করিয়াই ফলিয়া গেল—বিঘ্ন সত্য-সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইল। খুব সংক্ষেপে কথাটাকে শেষ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজনাথ সে বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন,—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত কথাটা জানিয়া লইলেন।

পদ্মমুখীর মনে পরিতাপের অন্ত ছিল না, নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আচ্ছা পিসিমা, তুমি এখন বিশ্রাম কর গে।"

চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সভয়ে পদ্মমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা কইবে কি বাবা?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ পিসিমা, আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা শেষ করব।"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া অমূলক আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়াছিলেন মনে করিয়া পদ্মমুখী নিশ্চিন্ত হইলেন। উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ কথা দ্বিজ, আশীর্বাদ করি—কমলা আমাদের সুখী হোক।"

প্রসন্নমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সেই আশীর্বাদ কর পিসিমা।"

পদ্মমুখী প্রস্থান করিলে বিমলার চিঠিখানা জামার পকেটে লইয়া দ্বিজনাথ কমলার ঘরের দ্বারে আসিয়া ধাক্কা দিয়া ডাকিলেন, "কমল, জেগে আছ কি?"

দ্বারটা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, কমলা তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল, "কেন বাবা?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে মা। চল, তোমারই ঘরে গিয়ে বসি।"

২৯

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কমলা একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া আঁচল দিয়া একটু মুছিয়া দ্বিজনাথের সম্মুখে স্থাপিত করিল। দ্বিজনাথ উপবেশন করিলে নিজের শয্যার উপর আসন গ্রহণ করিয়া ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বাবা?"

সিগার-কেস্ হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া মুখে দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "বলছি।" তাহার পর দেশলাই জ্বালিয়া সিগারটা ধরাইয়া লইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা নিবাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তার আগে একটা কথা বলি কমল। লজ্জা সঙ্কোচ প্রভৃতি জিনিসগুলোর এক দিক দিয়ে যত মূল্যই থাক্, কোনো একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার সময়ে সেগুলোকে বিঘ্ন ক'রে তুলে বিড়ম্বিত হওয়া কখনো উচিত নয়। যে কথাটা তোমাকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হয়েছে, সে কথা তোমার মা এখানে উপস্থিত থাকলে তোমাকে যেমন সহজভাবে জিজ্ঞাসা করতেন আমি তেমনি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি তাঁকে যে রকম সহজভাবে উত্তর দিতে আমাকেও ঠিক তেমনি সহজভাবে উত্তর দিয়ো।" বলিয়া কমলাকে সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রস্তুত হইবার সময় দিবার উদ্দেশ্যে দ্বিজনাথ চুরুটে ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন।

ভূমিকা হইতে আলোচ্য বিষয়ের ধারণা করিতে কমলার বিলম্ব হইল না,—বিশেষত সন্তোষ যখন রুশিডিতে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অপর কোনও বিষয়ে সঙ্কোচই বা কিসের, আর লজ্জাই বা কেন হইবে? সঙ্কোচের কারণ যত হউক, সঙ্কট-কাল যে আসন্ন

তাহা উপলব্ধি করিয়া কমলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কোনো কথা না বলিয়া সে নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার মা এখানে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর কথা দিয়েই কথাটা আরম্ভ হোক; তাঁর মুখ থেকে না শুনলেও তাঁর চিঠি থেকেই কথাটা শোন।" বলিয়া বিমলার চিঠিখানা কমলার হাতে দিয়া বলিলেন, "যে অংশটুকু লাল পেন্সিল দিয়ে ঘেরা আছে শুধু সেই অংশটুকু পড়লেই হবে।"

সৎপাত্র হিসাবে সন্তোষের যোগ্যতা সম্বন্ধে যে অংশে বিমলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল—সেই অংশটুকু দ্বিজনাথ লাল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন, বাদ দিয়াছিলেন যে অংশে পদ্মমুখীর চিঠিতে অবগত বিনয় সম্বন্ধে উদ্বেগ-প্রকাশ এবং সতর্ককরণ ছিল। চিহ্নিত অংশটুকু পাঠ করিয়া চিঠিখানা দ্বিজনাথকে ফিরাইয়া দিয়া কমলা নীরবে বসিয়া রহিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সন্তোষ সম্বন্ধে তোমার মার মত তো জানতেই পারলে। তোমার পদ্ম ঠাকুমারও একান্ত আগ্রহ সন্তোষের হাতে তোমাকে সমর্পণ করি। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমারও অমত নেই;—রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ, যে দিক দিয়েই দেখ না কেন, সন্তোষের মতো একটি পাত্র পাওয়া কঠিন। এখন তোমার যদি সম্মতি থাকে তো আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা শেষ করি। আমার বিশ্বাস, এ কথার একটা পাকাপাকি ক'রে ফেলবার জন্যে সন্তোষ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ হবে যদি-না আমরা অবিলম্বে তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে তাঁকে মুক্ত করি। তুমি অসঙ্কোচে তোমার মত জানাও কমল, কিছুমাত্র লজ্জা ক'রো না।"

উদ্বেগে এবং উত্তেজনায় কমলার কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরিয়া উঠিল। মুখ দিয়া কিন্তু কোনো কথা বাহির হইল না—সে পূর্বের মতো নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তবে যদি তোমার কোনো কারণে—তা সে যে কারণই হোক না কেন, প্রকাশ করতে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'য়ো না—যদি তোমার অমত থাকে, তা হ'লে কখনই আমরা সন্তোষের কথা আর ভাবব না, তা অন্য দিক দিয়ে সন্তোষ যতই বাঞ্ছনীয় হোন না কেন।"

এতটা আশ্বাস লাভ করিয়াও কমলার মুখ দিয়া কোনো কথা নির্গত হইল না।

কমলার এই দুরুচ্ছেদ্য মৌনের সহিত দ্বিজনাথ তাঁহার অন্তরের কোনো নিভৃত-পালিত বাসনার মৈত্র্য উপলব্ধি করিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ধর যদি কমল, এ বিষয়ে তোমার এমন কোনো আপত্তিই থাকে যা প্রকাশ করতেও তুমি সঙ্কোচ বোধ করছ, সে সঙ্কোচও তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ধর যদি এমন কিছু—" মাছ ধরিবেন অথচ জলস্পর্শ করিবেন না, সে কৌশল সুকঠিন দেখিয়া দ্বিজনাথ অর্ধ-পথেই নিবৃত্ত হইলেন।

পিতার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া কমলার দুঃখ হইল। সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "মা ফিরে আসা পর্যন্ত এ কথা বন্ধ থাক্ না বাবা।"

দ্বিজনাথ অধীর হইয়া উঠিলেন, ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "না না কমল, এ কথা আর অনির্দিষ্টভাবে ফেলে রাখা যায় না। আমরা কিছু না বলি, এ যাত্রায় যাবার আগে সন্তোষ এ কথা তুলবেনই। তাঁর মনে যে সংশয় আর উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে, এ আমি তাঁর কথাবার্তা আর

আচরণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। তিনি যখন কথাটা তুলবেন তখন তাঁকে তো আর বলা চলবে না যে, তোমার মা ফিরে আসা পর্যন্ত কথাটা বন্ধ থাক্। তা ছাড়া, যে কথাটা তোমার মাকে বলতে পারবে ব'লে মনে করছ, সেটা আমাকে বলতে তোমার এত সঙ্কোচ কেন? বাপের চেয়ে মা কি এতই বেশি আপনার?" বলিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। মাতার অপেক্ষা পিতাকে কমলা ভালবাসিতও বেশি, সঙ্কোচ করিতও কম। এ শুধু সময় লইবার উদ্দেশ্যে সে একটা ছল করিতেছিল। কি বলিয়া কথাটার একটা উত্তর দিবে মনে মনে কমলা ভাবিতেছে এমন সময়ে দ্বিজনাথ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি আজ না খেয়ে উপোস ক'রে আছ কমল?"

ত্রস্ত হইয়া নত নেত্র ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কমলা দেখিল, পিতার মুখে-চক্ষে নিবিড় সহানুভূতি এবং লঘু কৌতুক একসঙ্গে খেলা করিতেছে,—গভীর উদারা-স্বরের সহিত তীক্ষ্ণ তারা-স্বরের অনুরণনের মতো। প্রথমে কমলার শুষ্ক মুখ সন্ধ্যাকাশের মতো আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার পর তাহার আনতস্থির চক্ষু দুইটি হইতে টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মুখের কথা আটকাইয়া রাখিতে গিয়া শক্তির যে অপচয় হইয়াছিল তাহারই দুর্বলতায় চোখের জল নিরুপায় ভাবে বাহির হইয়া আসিল। যে-কথা নির্ণয়ের জন্য দ্বিজনাথ এতক্ষণ নিষ্ফলভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, একটি সমীচীন প্রশ্নের উত্তরে চোখের জল তাহা অসংশয়িতভাবে নিরূপিত করিয়া দিল।

কমলার অশ্রু দেখিয়া দ্বিজনাথেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, মুখে কিন্তু তিনি হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন, "ছেলেমানুষ আর কাকে বলে! যে কথা জানবার জন্যে কত রকম ক'রে পেড়াপীড়ি করছি, মুখ

ফুটে সে কথাটা বললেই তো হ'ত। এতে লজ্জার কি আছে মা? তোমার তো জানতে বাকি নেই কমল, বিনয়কে আমি কত ভালবাসি, সুতরাং বুঝতেই পারছ এতে আমি কত সুখী হয়েছি।" তাহার পর চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কমলার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় দক্ষিণ হাতটি সস্নেহে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আজ সন্ধ্যাবেলাই বিনয়ের সঙ্গে আমি এ কথার শেষ করব। আশা করি, তোমার মা ফিরে আসা পর্যন্ত এ কথাটা বন্ধ না রাখলেও চলবে?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

নিবিড় সঙ্কোচে ও সুখে কমলা তাহার আরক্ত মুখ দ্বিজনাথের দেহের মধ্যে লুকাইল।

৩৩

বৈকাল সাড়ে চারটার গাড়িতে বিনয় মধুপুর হইতে ফিরিতেছিল। তাহার পীড়িত বন্ধুর মধুপুরে আসা হয় নাই। যে গৃহ ভাড়া হইয়া আছে মধ্যাহ্নে তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই গাড়িতেই বিনয় স্টেশনে ফিরিয়া আসে। সাড়ে চারটার আগে অন্য কোনো ট্রেন না থাকায় অগত্যা সাড়ে চারটার ট্রেনেই ফিরিয়া আসিতেছে।

সমস্ত দিন সে অভুক্ত রহিয়াছে। শুধু অভুক্ত নয়, সকালে সুকুমারদের বাড়ি হইতে যে চা আর খাবার খাইয়া বাহির হইয়াছিল তাহার পর জলস্পর্শ পর্যন্ত করে নাই। মধুপুরে খাবারের অভাব ছিল না, দেশী বিলাতী হোটেল ছিল, স্টেশনে রিফ্রেশ্‌মেণ্ট রুম ছিল, তাহা ছাড়া ময়রার দোকানের তো সংখ্যাই নাই;—কিন্তু বিনয়ের আহারের প্রবৃত্তি ছিল না। এমন কি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যখন দেহটা কষ্ট ভোগ করিতেছিল তখন পর্যন্ত নহে। দেহ যেটা স্বভাবের তাড়নায় চাহিতেছিল, মন তাহাকে বাধা দিতেছিল অস্বাভাবিক উত্তেজনায়। কিন্তু সেই উত্তেজনার মূল যে কোথায় নিহিত ছিল,—অভিমানে, না অনুশোচনায়, না রাগে, না বৈরাগ্যে,—সে বিষয়ে তাহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না; শুধু মনে হইতেছিল, আহারে ও পানে আজ বাধা পড়িয়াছে, আজ ও দুই ব্যাপারের দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণার শান্তি নাই।

একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার জানলার ধারে বসিয়া বিনয় বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। জশিডি পৌঁছিবার বহু পূর্ব হইতে রেলগাড়ির বাঁ দিকে ডিগ্‌রিয়া পাহাড় দেখা যায়; তাহাই দেখিতে দেখিতে

তাহার মনের মধ্যে ডিগ্‌রিয়ারই মতো সঙ্কল্পের একটি বিশাল পাহাড় তৈরি হইয়া উঠিয়াছিল,—ডিগ্‌রিয়ারই মতো যাহার পিছন দিকে আনন্দের সূর্য অস্তগমনোন্মুখ, ডিগ্‌রিয়ারই মতো যাহার সম্মুখ দেশ বিষাদের ছায়ায় ম্রিয়মাণ। যেরূপেই হউক, কাল সকাল দশটার গাড়িতে কমলার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ নিস্তার নাই। যে বাঁধন মিলিত করে না—আবদ্ধ করে, তাহা হইতে মুক্তি না পাইলেই নয়।

কিন্তু এই সঙ্কল্পের কথা মনে করিয়াই বিনয়ের মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। লোভকে জয় করিবার জন্যই তো সঙ্কল্প, রোগকে প্রশমিত করিবার জন্য যেমন ঔষধ। কিন্তু এই লোভ মনের মধ্যে আসে কেন? আজ সকালে কমলার সামান্য কথায় আহার না করিয়া চলিয়া আসা, সমস্ত দিন অকারণ উপবাসে নিজেকে নিপীড়িত করা, লোভের প্রভাব হইতে দূরে পলায়নের সঙ্কল্প প্রভৃতি দুর্বলতার পরিচায়ক আচরণ স্মরণ করিয়া বিনয় নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করিতে লাগিল। যেখানে সহজ হইয়া অবস্থান করিবার কথা, সেখানে মন কঠোরতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করে কেন?

একটা নির্বিকল্প ঔদাসীন্যে নিজের মনকে নিরাময় করিয়া লইবার জন্য বিনয় চেষ্টা করিতে লাগিল—যে অবস্থায় আসক্তি বিরক্তি, আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছুই থাকিবে না, যে অবস্থায় কমলাকে দ্বিজনাথের কন্যা অথবা সন্তোষের বাগ্‌দত্তা বধূর অতিরিক্ত কিছুই মনে হইবে না, সুতরাং পরদিন বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে দেওঘর পরিত্যাগ করা না-করা প্রভেদশূন্য হইবে।

কিন্তু মনে করিবার চেষ্টা করিলেই যদি সব কথা মনে করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে মন হইত হিসাবের খাতার মতো সত্য-মিথ্যায়

নির্বিকার; জমা অথবা খরচের ঘরে মিথ্যা অঙ্ক ফেলিলেও হিসাব-নিকাশের সময় সত্যেরই মতো তাহা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইত।

এ কথার সত্যতার পরীক্ষা হইয়া গেল হঠাৎ শোভার কথা মনে পড়ায়। জমার ঘরে শোভাকে ফেলিলে কি হয়? বিনয় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, তাহাতে বৃদ্ধি কিছুই হয় না, পরন্তু হ্রাস হয়। বিস্মিত হইয়া হিসাব পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, জমার ঘরে শোভাকে ফেলিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খরচের ঘরে পড়ে দ্বিজনাথের কন্যা অথবা সন্তোষের বাগ্‌দত্তা বধূ কমলা। বুঝিল, খাতার হিসাবের নিয়মের সহিত মনের হিসাবের নিয়মের প্রভেদ আছে।

ইতিমধ্যে জশিডি স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিয়া গিয়াছিল। পরদিন বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে দেওঘর পরিত্যাগের সঙ্কল্প মনে মনে পাকা করিয়া গাড়ি হইতে প্ল্যাটফর্মে নামিয়াই বিনয় দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বিজনাথ। সমস্ত মনটা বিরক্তিতে ঘুলাইয়া উঠিল—একটা নিরুপায় হতাশায় সে মনে মনে অস্থির হইয়া পড়িল। ইহারা দেখিতেছি কিছুতেই নিস্তার দিবে না! অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "আপনি কষ্ট ক'রে এসেছেন কেন?"

দ্বিজনাথের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বিনয়ের কাঁধে একটা হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কেন কষ্ট ক'রে এসেছি তা বুঝবে আমার মতো বয়স হ'লে, আর কমলার মতো একটি মেয়ে থাকলে। এখন চল।"

"কোথায়?"

"আপাতত আমার গাড়িতে, তারপর আমার বাড়িতে।"

দেহটা একটু কঠিন করিয়া লইয়া বিনয় বলিল, "কিন্তু—"

হাসিমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "কিন্তু বললে আমি যদ্যপি তত্রাচ সুতরাং অনেক কথাই বলব, অতএব চল।" তাহার পর মনে

মনে কি ভাবিয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কমলা সমস্ত দিন উপোস ক'রে রয়েছে।"

চকিত হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "কেন?"

"তোমারই অবিবেচনার জন্যে। এখন চল।"

আর কোনো কথা না বলিয়া নিরতিগভীর চিন্তিত মনে বিনয় দ্বিজনাথের সহিত ওভার-ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইল।

গাড়ি করিয়া যাইতে যাইতে দ্বিজনাথ বিনয়ের বন্ধুর বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন। বন্ধু মধুপুরে তখন পর্যন্ত পৌঁছায় নাই শুনিয়া বলিলেন, "তুমি তা হ'লে এতক্ষণ সময় কাটালে কোথায়?"

বিনয় বলিল, "স্টেশনে। ওরা আসে নি দেখে বাড়িওয়ালার কাছে কোনো চিঠিপত্র এসেছে কি-না খবর নিয়ে স্টেশনে ফিরে এসে অপেক্ষা করেছিলাম।" অতঃপর স্বাভাবিক অনুক্রমে দ্বিজনাথের যে প্রশ্ন করিবার সম্ভাবনা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আগ্রহে বিনয় কথাটাকে ভিন্ন ধারায় চালিত করিবার চেষ্টা করিল; "বাড়িওয়ালার কাছে চিঠিপত্রও কিছু আসে নি; কি যে হ'ল, কিছু বুঝতে পারছি নে—মনে বড় ভাবনা হচ্ছে।"

দ্বিজনাথ কিন্তু বিনয়ের এ উৎকণ্ঠায় কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে খেলে কোথায় বিনয়? স্টেশনের রিফ্রেশ্‌মেণ্ট্-রুমে?"

ঠিক এই কথাটাই বিনয় মনে মনে ভয় করিতেছিল; এক পক্ষে কমলা অনাহারে রহিয়াছে সে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া অপর পক্ষের সংবাদও যদি ঠিক একই রকম পাওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই আচরণের গুরুত্ব পৃথকভাবে বৃদ্ধি পায়। কি বলিবে সহসা স্থির করিতে না পারিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বিনয় বলিল, "খাওয়ার বিশেষ দরকার ছিল না—সকালে ভাল ক'রে জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "অর্থাৎ, সমস্ত দিন উপোস ক'রে রয়েছ—সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছ। কি যে তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝি নে।"

এ 'কিছুই বুঝি নে'র অর্থ যে কত বুঝি, এবং 'কাণ্ড'র অর্থ কেবল মাত্র অনাহারই নহে, তাহা বুঝিতে বিনয়ের ভুল হইল না। সে অপ্রতিবাদের দ্বারা দ্বিজনাথের সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। দেওঘর যাইবার পাকা রাস্তা ছাড়িয়া দ্বিজনাথের বাড়ি যাইবার কাঁচা রাস্তায় পড়িবার আগে বিনয়ের একবার মনে হইল, দ্বিজনাথের বাড়ি না গিয়া একেবারে সোজাসুজি তাহাকে সুকুমারদের বাড়ি পৌছাইয়া দিবার জন্য দ্বিজনাথকে অনুরোধ করে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রবল উত্তেজনা তাহার মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার এমন একটা অলসতা বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহার মুখ দিয়া একটি বাক্য নির্গত হইল না; শুধু চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল একটি অনাহার-খিন্ন তরুণীর বিষণ্ণ-মেদুর মাধুরী, এবং প্রাণের তারে ধ্বনিত হইতে লাগিল একটি শ্রুতি-সুমধুর নাম—কমলা, কমলা, কমলা! বিনয়কে আহার করাইতে পারে নাই বলিয়া কমলা স্বয়ং সমস্ত দিন উপবাসিনী রহিয়াছে! —যে আহার্য সে বিনয়ের মুখে দিতে পারে নাই, সে আহার্য সে নিজেও গ্রহণ করিতে পারে নাই! বিবাদ বিতর্ক কলহ বৈরূপ্যের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া ছিল এই অন্তরের ঐকান্তিক সহযোগিতা, যাহা প্রস্ফুটিত শতদলেরই মতো চিত্তের যথার্থ স্বরূপটি বিকশিত করিয়া দিয়াছে! অভুক্ত লঘু দেহের মধ্যে বিনয়ের মনখানি অচিন্তিত সৌভাগ্যের উজ্জ্বল আনন্দে কাঁপিতে লাগিল।

পথের দুই ধারে ইউক্যালিপ্‌টস্ গাছ হইতে একটা মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। ডান দিকে একটা সাদা চুনকাম-করা বাড়ির গেটে বিলাতী লতার দেহ অসংখ্য কমলালেবু রঙের ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। বিনয়ের মনে হইল, আজ যেন আকাশে নূতন আলো, বাতাসে নূতন স্পর্শ, তরুগুল্মে নূতন সজীবতা, আজ যেন শরৎ

অপরাহ্ণ তাহার সমস্ত কমনীয়তায় এবং রমণীয়তায় সজ্জিত হইয়া তাহার বহুদুঃখলব্ধ দয়িতার গৃহ-পথটি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কমলা এবং সে উভয়েই অভুক্ত;—মনে হইল এ যেন মিলনের পূর্বে সংযমের বিধি-পালন।

গেট অতিক্রম করিয়া গাড়ি গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই বিনয়ের উৎসুক দৃষ্টি চতুর্দিকে যে বস্তুর অনুসরণ করিয়া আসিল, কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। গাড়ির শব্দ পাইয়া একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্তোষবাবু এসেছেন ?"

"আজ্ঞে না হুজুর।"

"আচ্ছা, দিদিমণিকে শিগগির বৈঠকখানা-ঘরে ডেকে দে।" বলিয়া দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কমলা তখন নিজের ঘরে বসিয়া একটা বই লইয়া পাতা উল্টাইতেছিল। ভৃত্য দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদিমণি!"

কমলা আসিয়া পর্দা সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"বৈঠকখানায় সাহেব আপনাকে শিগগির ডাকছেন।"

হর্নের শব্দ কমলার কানে গিয়াছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে আর কেউ আছেন ?"

"সেই ছবি-ওয়ালা বাবু।"

কমলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল।

"আর কেউ ?"

"আর তো কেউ না।"

"আচ্ছা, বল গে—যাচ্ছি।"

মিনিট দুই পরে বৈঠকখানার দ্বারের পার্শ্বে হাজির হইয়া মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "বাবা, আমাকে ডাকছ ?"

ঘরের ভিতর হইতে দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, ডাকছি বইকি। ভিতরে এস।"

দ্বিধালস পদে ভিতরে প্রবেশ করিয়া কমলা দেখিল, একটা বড় সোফায় দ্বিজনাথ এবং বিনয় বসিয়া। ইঙ্গিতে দ্বিজনাথ কমলাকে নিকটে ডাকিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিলেন, "তুমি মনে ক'রো না কমল, একা তুমিই উপবাস ক'রে রয়েছ; আমার ডান দিকে যে ব্যক্তি ব'সে আছেন তোমার আচরণের সঙ্গে তাঁরও আচরণের যে কোনো প্রভেদ নেই তা তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। আজ সকালে বাড়ি থেকে সামান্য যেটুকু খাবার খেয়ে বেরিয়েছিলেন, তারপর সমস্ত দিনে মুখে অন্নজল পড়ে নি।"

শুনিয়া কমলার বিশুষ্ক মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; একবার অচেষ্ট আগ্রহে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া দৃষ্টি নত করিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। পাছে আহার করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়া কষ্ট পায়—এই আশঙ্কায় সে সকালে বিনয়কে আহার করিয়া যাইবার জন্য কত পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু এখন বিনয় সমস্ত দিন অভুক্ত রহিয়াছে শুনিয়াও তাহার মুখ দিয়া একটি বাক্য নির্গত হইল না। মনের মধ্যে একটা দুঃখ অনুভব করিল বটে, কিন্তু সে দুঃখের মধ্যেও একটা সুমিষ্ট তরল আনন্দ ঠিক তেমনি ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল—রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্না যেমন ভাবে থাকে।

আহার না করিয়া কমলাকে না জানাইয়া চলিয়া যাওয়ার জন্যই কমলা অভুক্ত রহিয়াছে, অতএব সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে হইলেও, পরিবর্তিত অবস্থায় সে কথাটা এখন নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বিনয়ের মনে হইতেছিল। বন্যার প্লাবনের সময়ে বৃষ্টির কথা ছোট হইয়া গিয়াছে। তবুও যথাসম্ভব সঙ্কোচ

কাটাইয়া কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "আমার অন্যায় আচরণের জন্যে আপনি সমস্ত দিন না খেয়ে রয়েছেন মিস্ মিত্র, সে জন্যে আমি—"

বিনয়কে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে জন্যে তুমি যা, তা বলবার পরে যথেষ্ট সময় পাবে—তার আগে আমার কাজটি আমি সারি বিনয়।" বলিয়া অকস্মাৎ একটি কাণ্ড করিলেন। এক হস্তে কমলার হাত অপর হস্তে বিনয়ের হাত ধরিয়া কমলার হাত বিনয়ের হস্তে স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "কমলার চেয়ে আদরের জিনিস আমার আর নেই বিনয়, কমলাকে আমি তোমাকে দিলাম। তুমি কমলাকে গ্রহণ কর।"

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনয় বলিল, "এ আপনি কি করলেন?—আমাকে না জেনে, না বুঝে, আমি যোগ্য কি অযোগ্য বিচার না ক'রে, এ আপনি কেন করলেন?"

দ্বিজনাথের মুখ উদ্বেগে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; স্খলিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সে কি বিনয়! তবে কি আমি ভুল করলাম? তবে কি তুমি কমলার—"দ্বিজনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "আজ্ঞে হঁ্যা, আমি কমলার অযোগ্য। আমি গৃহহীন, দরিদ্র,—আপনি আমার ইতিহাস জানেন না। কমলা আমার কামনার বস্তু হ'লেও আমি কমলাকে পাবার অধিকারী নই।"

দ্বিজনাথের মুখ হইতে দুশ্চিন্তার ঘন মেঘ অপসৃত হইল। বিনয়কে হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিলেন, "যে বস্তু তুমি জয় করেছ সে বস্তুর তুমি অধিকারী। অধিকারী ব'লে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস না হ'লে আমি তোমার হাতে কমলাকে দান করতাম না। তুমি গৃহহীন তা আমি জানি, তুমি ধনবান নও তাও আমি জানি;

কিন্তু তোমাকে আমি উইল ক'রে অথবা দান-পত্র ক'রে আমার সম্পত্তি দিচ্ছি নে বিনয়। যে জিনিস তুমি নিজে জয় ক'রে অধিকার করেছ তাই আমি তোমাকে দিচ্ছি,—এ অনুগ্রহের দান নয়। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি কমলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।"

সমস্ত ঘরখানা একটা অপরিমেয় বিস্ময়ের উৎকণ্ঠায় তম্‌তম্ করিতে লাগিল। এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তবে আমাকে এই আশীর্বাদ করুন, আমি যেন কমলার যোগ্য হ'তে পারি।"

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "পড়েছ তো বিনয়—**None but the brave deserves the fair.**"

আরক্তমুখে কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় বলিল, "তা হ'লে এস কমলা, আমরা দুজনে বাবাকে একসঙ্গে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।"

প্রণাম করিবার সময় কমলা দুই বাহু দিয়া দ্বিজনাথের পদদ্বয় বেষ্টিত করিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দ্বিজনাথ তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া শান্ত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের দুজনকে আজ এই আশীর্বাদ করি যে, জীবনে নিয়ত তোমরা একমাত্র সত্যকে অবলম্বন ক'রে থেকো। কোনো বিরুদ্ধ শক্তি কখনো যেন তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। যথার্থ মিলন তোমাদের আজ হ'য়ে গেল, সামাজিক অনুষ্ঠান তোমাদের মা সীলোন্ থেকে ফিরে এলে হবে। এখন আমি নিশ্চিন্ত,—এখন আমি সুখী।"

পশ্চিম গগন অস্তগামী সূর্যকিরণে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার কিরণে উদ্ভাসিত গেটের পাশে একটা লাল স্থলপদ্মের গাছ তাহার

অসংখ্য রক্তপুষ্প লইয়া এই সহসা-সংঘটিত মিলন-অভিনয়ের সাক্ষ্য হইয়া রহিল।

বিনয়কে স্নানাহার করিয়া রাত্রে খাইয়া যাইবার জন্য দ্বিজনাথ অনুরোধ করিলেন—কিন্তু বিনয় স্বীকৃত হইল না। একটা তীব্র উল্লাসের উত্তেজনায় সে এমন একটা অবসন্নতা বোধ করিতেছিল যে, একটু বিশ্রামের এবং নির্জনতার জন্য তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। এক পেয়ালা চা এবং সামান্য কিছু খাবার খাইয়া সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মনের অপরিসীম আনন্দে দ্বিজনাথ অতিশয় উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন; বলিলেন, "চল বিনয়, তোমাকে আমি পৌছে দিয়ে আসি।"

বিনয় এবং দ্বিজনাথ প্রস্থান করিবার ঘণ্টাখানেক পরে রিকিয়া হইতে সন্তোষ ফিরিয়া আসিল। সংবাদ পাইয়া পদ্মমুখী তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অন্দরে উপস্থিত হইয়া সন্তোষ পদ্মমুখীর ঘরে আসন গ্রহণ করিলে তাহার সম্মুখে একজন ভৃত্য চা এবং খাবার রাখিয়া গেল।

সন্তোষ বলিল, "আসবার আগেই অনেক খাবার-টাবার খেয়ে এসেছি ঠাকুমা,—আর কিছু খাব না।"

সহাস্য প্রসন্নমুখে পদ্মমুখী বলিলেন, "তা না-খাও না-খাবে, কিন্তু আমাকে কি খাওয়াবে বল?—খোস-খবর আছে।"

স্মিতমুখে সন্তোষ বলিল, "আপাতত বদ্যিনাথের পেঁড়া। তারপর ক্রমশ কাশীর চমচম্ থেকে আরম্ভ ক'রে কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া পর্যন্ত সমস্ত। কিন্তু কি খোস-খবর তা বলুন, কমলার বিয়ে বিনয়ের সঙ্গে?"

সন্তোষ জানিত এ কথাটা উপস্থিত অবস্থায় একেবারেই পরিহাস, এবং এ পরিহাসে পদ্মমুখী উত্তেজিত হইবেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পদ্মমুখী বলিলেন, "ব'লো না অমন অলক্ষণে কথা! তা হ'লে কি কি-খাওয়াবে জিজ্ঞাসা করতাম?—একেবারে দু ভরি আফিমের ফরমাস দিতাম।" তাহার পর প্রসন্নমুখে বলিলেন, "কমলার বিয়ে বটে, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে।"

এ বিষয়ে অনেকখানি আশা থাকিলেও সম্প্রতি সন্তোষের মনে অনেকখানি আশঙ্কাও স্থানাধিকার করিয়াছিল। উৎফুল্লমুখে সে বলিল, "আরও খুলে বলুন ঠাকুমা।"

তখন খানিকটা রঙ এবং খানিকটা পালিশ দিয়া পদ্মমুখী বিপ্রহরে দ্বিজনাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল বিবৃত করিলেন। বলিলেন, "শুভকর্মে বিলম্ব ক'রো না—সেই প'টোটাকে নিয়ে দ্বিজ বদ্যিনাথ পৌঁছে দিতে গেছে—ফিরে এসেই তোমাকে সব কথা বলবে। কালই যাতে তোমাকে দ্বিজ আশীর্বাদ করে তার ব্যবস্থা আমি করব। তারপর, তুমি যদি আমাকে ভার দাও তো তোমার পক্ষ হ'য়ে আমি কমলাকে আশীর্বাদ ক'রে রাখব। কি বল?"

হাসিমুখে সন্তোষ বলিল, "আপনার আশীর্বাদেই যখন কমলাকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে তখন কমলাকে আপনি আশীর্বাদ করবেন—সে ভার কি আমাকে দিতে হবে ঠাকুমা? আপনি কমলাকে আশীর্বাদ করবেন আপনার নিজের দাবিতে।"

সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মমুখী বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে তাই ঠিক রইল।"

আরও কিছুক্ষণ কথোপকথন এবং পরামর্শের পর সন্তোষ বাহিরে আসিয়া বারান্দায় বসিল। মনে হইল, বাগানের এক প্রান্তে একটা শিলাখণ্ডের উপর কমলা বসিয়া রহিয়াছে;—গাছপালার অবকাশ দিয়া

তাহার লালপাড় শাড়ির অংশ দেখা যাইতেছে। প্রথমে মনে হইল আজ যখন সন্ধ্যার পর সমস্ত কথা পাকা হইবার কথা রহিয়াছে তখন তাহার পূর্বে কমলার সহিত কোনো কথা না হওয়াই ভাল; কিন্তু সন্তোষ তাহার উন্মত্ত হৃদয়ের আবেগকে রোধ করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কমলার সমীপে উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "কমলা!"

কমলা সন্তোষের আগমন জানিতে পারিয়াছিল; বলিল, "আজ্ঞে ?"

"তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এলাম কমলা।"

চকিত হইয়া কমলা বলিল, "কি প্রশ্ন ?"

সহাস্যমুখে প্রসন্নস্বরে সন্তোষ বলিল, "আজ আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী—তুমি, না, আমি,—তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

সন্তোষের কথা শুনিয়া দুঃখে, ভয়ে, লজ্জায় কমলার হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল। এই নিরতিশয় সঙ্কটের অবস্থায় সে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সন্তোষ বলিল, "আমিই বেশি সুখী, কারণ আজ আমি তোমাকে পাব। আজ রাত্রে তোমার বাবা আমাকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের কথা জানাবেন। তুমি আমার জীবনের আলো কমলা, আজ আমার জীবন আলোকিত হবে।"

এমন সময়ে দ্বিজনাথের মোটর কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল। সঙ্কট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার লাভ করিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা এসেছেন, চলুন।" বলিয়া আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

কমলা যেখানে বসিয়া ছিল সেখানে বসিয়া পড়িয়া সন্তোষ মনে মনে বলিল, "হে শিলাময়ী ধরিত্রী, তুমি আমাদের উভয়ের অটল মিলন-ক্ষেত্র হও।"

শিলাময়ী ধরিত্রী প্রাণময়ী হইলে তখন নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হইত। কিন্তু প্রাণময় পদার্থও যে সহনশীলতায় বসুন্ধরার অপেক্ষা কম নহে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গেল যখন আধ ঘণ্টাটাক পরে দ্বিজনাথ কমলা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত সন্তোষের নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রচণ্ড অগ্নি-দাহ বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া বসুমতী বাহিরে যেমন প্রসন্ন হাসি হাসেন, দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া সন্তোষের অবস্থা ঠিক তেমনি হইল। মনের ভিতরটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিলেও প্রশান্ত মুখমণ্ডলের মধ্যে তাহার বিশেষ কোনো চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মৃদু হাসি হাসিয়া সে বলিল, "না, এ অবস্থায় আপনি যা করেছেন তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কমলা সুখী হ'লে আমরা সকলেই সুখী।"

এ উত্তরে দ্বিজনাথ বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হইলেন না। নিজে হিসাবে ভুল করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এ ছেলেটি দেখছি একেবারে বেণের মত মতো হিসাবী। সেণ্টিমেণ্টের কোনো ধার ধারে না। বিফলতায় যে বেদনা বোধ করে না, সফলতা তো তার কাছে সামান্য বস্তু। দুঃখ যে অনুভব করলে না, কি হবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে! প্রকাশ্যে কথার উত্তর দিতে গিয়া মুখে কিন্তু সান্ত্বনার কথাই কতকটা বাহির হইয়া আসিল; বলিলেন, "সুখ-দুঃখের তো গণ্ডিবাঁধা এলাকা নেই সন্তোষ, সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা সকলে যে কেবল সুখীই হয়েছি তা নয়;—এমন কি আমার মনে হয়, কমলা নিজেও হয় নি। সুখ-দুঃখের হিসেব ঠিক টাকা-আনা-পয়সার হিসেবের মতো নয়। সুখ থেকে দুঃখ আর দুঃখ থেকে সুখ বিয়োগ দিয়ে দিয়েই আমাদের জীবনের কারবার

চলে বটে—কিন্তু সে যোগ-বিয়োগের ফলে বা অবশিষ্ট থাকে তা নিছাঁক সুখ কিংবা নিছাঁক দুঃখ নয়। আঠারো আনা সুখের মধ্যে ষোলো আনা দুঃখের একেবারে নিরবশেষ কাটান হয় না সন্তোষ, এক-আধ পাই বাকি থাকেই।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া স্মিতমুখে সন্তোষ বলিল, "সেই এক-আধ পাই আমাদের বাইরের কারবার থেকে তুলে নিয়ে মনের মধ্যে সঞ্চিত করলে সেখানে তা সম্পদ হ'য়ে থাকে।"

সন্তোষের সংযমকে ঔদাসীন্য বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিয়া দ্বিজনাথ অনুতপ্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিলেন, "এর চেয়ে আর সত্যি কথা নেই সন্তোষ, এর চেয়ে আর বড় কথাও কিছু নেই। আমি একান্ত মনে আশীর্বাদ করি, আজ তুমি যে দুঃখ পেলে তা যেন তোমার ভবিষ্যৎ সুখের মূল হয়।"

এই অনিশ্চিত মূল হইতে কোন্ ভবিষ্যতে গাছ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে সুখের ফুল ফুটিবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে শয্যা গ্রহণ করিয়া সন্তোষ বুঝিতে পারিল, আপাতত সেই সুখের মূল হইতে কাঁটা গাছ বাহির হইয়াছে। দ্বিজনাথের সহিত, এমন কি আহারকালে কমলার সম্মুখে, সে যে-দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া শয্যা গ্রহণ করিবার পর সে দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল। অন্ধকারের এবং নিঃসঙ্গতার আশ্রয়ে তাহার বিক্ষেপহীন মন যথার্থরূপে বুঝিতে পারিল, কতখানি ক্ষতি আজ হইয়া গিয়াছে! হৃদয়ের এক দিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত তাকাইয়া দেখিল, সমস্ত নিশ্চিহ্ন নীরব; এতদিন ধরিয়া পলে পলে যে বিশাল আনন্দলোক গড়িয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন কোথা হইতে একটা দুর্ধর্ষ বন্যা আসিয়া তাহার সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে।

দুঃখ গ্লানি অপমানে হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল। বাড়িখানাকে মনে হইল কারাগার, শয্যাকে মনে হইল কণ্টক-শয্যা। নিতান্তই চক্ষুলজ্জার বশে আজই রাত্রের ট্রেনে কলিকাতা রওনা হয় নাই বলিয়া মনে গভীর পরিতাপ উপস্থিত হইল।

বৈঠকখানা-ঘরে ক্লক-ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। বারোটা বাজার কথা মনে আছে, কিন্তু একটা বাজার কথা মনে পড়িল না। বিরক্ত হইয়া সন্তোষ পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু চিন্তা চিত্তকে কোনো মতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না, সুতরাং নিদ্রা নেত্রকে পরিত্যাগ করিয়াই রহিল। অবশেষে শেষ রাত্রের দিকে সামান্য একটু ঘুম হইল—কিন্তু পাঁচটা বাজিবার পূর্বেই সে ঘুমটুকু ভাঙিয়া গেল।

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া সন্তোষ দেখিল, শরৎকালের প্রত্যুষের সুষমায় জাগ্রত হইয়া পৃথিবী হাসিতেছে,—সে পৃথিবীর মুখে অনিদ্রার কোনো গ্লানি নাই। মনটা হঠাৎ হালকা হইয়া উঠিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া লইয়া সন্তোষ রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। তখন দ্বিজনাথের গৃহে সকলেই নিদ্রিত, শুধু মাড়োওয়ারী সানিটোরিয়মের অধিবাসী এবং অধিবাসিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ পথে বাহির হইয়াছেন।

সন্তোষের মনের কোন্ এঞ্জিনে হঠাৎ জল-কয়লা-আগুনের সংযোগ হইল বলা কঠিন, যাহার ফলে সে দ্রুতপদে দেওঘরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রভাত-কালের শান্ত শীতল সৌন্দর্যের মধ্যে ঘুটিং-ঢালা পরিচ্ছন্ন পথটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে পড়িয়া ছিল,—তাহার দুই ধারে মনোহর দৃশ্য, মাথার উপর নির্মল আকাশের অবগাঢ় দৃষ্টি, গাছে গাছে পাখীর ডাক। এই মাধুর্যময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে একরকম নিশ্চেতন হইয়া

সন্তোষ একমনে হন হন করিয়া পথ চলিয়া যখন সুকুমারদের বাড়ি উপস্থিত হইল, তখন সবে মাত্র চাকরেরা জাগ্রত হইয়া বাড়ির গেট খুলিয়া দিয়াছে।

কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়া একজন ভৃত্যকে দেখিতে পাইয়া সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুরা কোথায়? এখনও ওঠেন নি না কি?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না হুজুর।"

সবিস্ময়ে সন্তোষ বলিল, "এখনো ওঠেন নি? প্রায় সাড়ে ছটা বাজে যে! আরো দেরি হবে না-কি?

"আজ্ঞে না, এখনি উঠবেন। ডেকে দোব?"

"তোমাকে ডাকতে হবে না, আমিই ডাকছি। বিনয়বাবুর ঘর কোন্‌টা?"

ভৃত্য হস্ত-সঙ্কেতে দেখাইয়া বলিল, "ওই পশ্চিম দিকেরটা।"

বারান্দায় উঠিয়া পশ্চিম দিকের ঘরের খোলা জানলা দিয়া সন্তোষ দেখিল, মশারির ভিতর বিনয় নিদ্রিত। অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "বিনয়-বাবু! বিনয়বাবু."

বিনয়ের ঘুম তরল হইয়া আসিয়াছিল; জাগিয়া উঠিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কে? সন্তোষবাবু? আসুন আসুন।"

সন্তোষ বলিল, "আমি তো এসেইছি; আপনি বেরিয়ে আসুন।"

তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া বিনয় বাহিরে আসিয়া সন্তোষের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেরি ক'রে ওঠার অপরাধ আমি করেছি নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনিও যে একটু বেশি সকালে এসেছেন তাতে সন্দেহ নাই সন্তোষবাবু। জশিড়ি থেকে আমার হিসাবে বলছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সহাস্যমুখে সন্তোষ বলিল, "ঘুম যখন ভেঙে গেল তখন শেষ রাত্রি। কিছুক্ষণ পরে পথে বেরিয়ে কি খেয়াল হ'ল—মনে করলাম, আপনাকে কংগ্র্যাচুলেট ক'রে আসা যাক।"

বিনয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটু কি চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আপনি সব শুনেছেন সন্তোষবাবু?"

"শুনেছি বইকি। না শুনলে কংগ্র্যাচুলেট করতে আসি কি ক'রে?"

ব্যথিত স্বরে বিনয় বলিল, "যদিও ইচ্ছা ক'রে নয়, তবুও আমি আপনার ক্ষোভের কারণ হয়েছি সন্তোষবাবু,—আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বিনয়ের বাম স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া একটু নাড়া দিয়া সন্তোষ বলিল, "আপনি অতি ছেলেমানুষ বিনয়বাবু! কমলার সঙ্গে আমার বিয়ের একটা কথা চলছিল, সেই কথা বলছেন তো? অমন আমাদের বাঙালীর ঘরে কত কথা চ'লে থাকে, তার হিসেব রাখতে গেলে আর চলে না। এসব কথার কি কিছু ঠিক আছে বিনয়বাবু? তাই লোকে কথায় বলে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে।"

বিনয় বলিল, "বিধাতা নিয়ে নিশ্চয়ই—তা নইলে কি আপনার জায়গায় আমি দাঁড়াতে পারি!"

সন্তোষ হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ আপনার নিতান্তই বিনয় বিনয়বাবু। আপনি আপনার মহত্তর শক্তি দিয়ে কমলাকে জয় করেছেন। আমি আপনার কাছে পরাভব স্বীকার করছি।—আচ্ছা, আমি আধ ঘণ্টাটাক ঘুরে আসছি, ততক্ষণ আপনারা তৈরী হ'য়ে নিন। এখানে এসেই চা খাওয়া যাবে অখন।" বলিয়া সন্তোষ প্রস্থানোদ্যত হইল।

ব্যস্ত হইয়া বিনয় বলিল, "না, না, আর আপনার কোথাও যেতে

হবে না—এইখানেই বসুন। চার মাইল পথ চ'লে এসে আরো আধ ঘণ্টা ঘুরতে আপনার ইচ্ছে হচ্ছে ?"

সন্তোষের মুখে মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "ভগবান সময়ে সময়ে আমাদের পায়ে চাকা বেঁধে দেন বিনয়বাবু, তখন চার মাইল কি, চল্লিশ মাইলেরও হিসেব থাকে না। তা ছাড়া, বেশি ঘুরব না। আজই বিকেল পাঁচটার গাড়িতে কলকাতা যাব কি-না, তাই এদিকটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

ভগবান চাকা যে পায়ে বাঁধেন নাই, মনে বাঁধিয়াছেন, আর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছাটা যে মানসিক অস্থিরতার ছদ্মনাম—এ কথা বুঝিতে বিনয়ের বিলম্ব হইল না ; সুতরাং ও-বিষয়ে আর কোনও আলোচনা না করিয়া সে বলিল, আজই কলকাতা যাবেন ? এখন তো আপনার ছুটি আছে, দিন কতক এখানে কাটাতে পারতেন।"

সন্তোষ বলিল, "না বিনয়বাবু, যত শীঘ্র সম্ভব চ'লে যাওয়াই ভাল। আপনি বুদ্ধিমান, বুঝতে পারছেন তো এ অবস্থায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সঙ্কোচ হবেই। আমি বরং কতকটা সহজে আমার সঙ্কোচ কাটাতে পারি, কিন্তু ওঁদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা একটু শক্ত।"

একটু চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে বিনয় বলিল, "তা বটে।"

সন্তোষ প্রস্থান করিলে বিনয় বারান্দার বেঞ্চে বসিয়া খানিকক্ষণ কত কি ভাবিল, তাহার পর বারান্দার প্রান্তে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া সুকুমারের ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুকুমারকে ডাকিতে লাগিল।

জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া সুকুমার স্মিতমুখে বলিল, "কি হে, আজ এত উৎসাহ কেন ? রসুনচৌকির ফরমাস দিতে যেতে হবে না-কি ?"

বিনয় বলিল, "তার আগে সন্তোষবাবুকে চা খাওয়াতে হবে। তিনি খানিক আগে এসেছিলেন, বেড়াতে গেছেন, আধ ঘণ্টাটাক পরে আবার আসবেন।"

অর্ধোচ্চস্বরে ত্রস্তভাবে সুকুমার বলিল, "ডিউএল্ লড়তে না-কি?"

বিনয় বলিল, "তা হ'লে তো তত ভয়ের কথা ছিল না। এ ঠিক তার বিপরীত—কংগ্র্যাচুলেট করতে।"

শুনিয়া সুকুমার মুখ উদ্বিগ্ন করিয়া বলিল, "সাবধানে থেকো বিনু, বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং—"

"কিন্তু ইনি তো স্ত্রীলোকও নন, রাজকুলও নন।"

"তবুও। চোট খেয়ে যদি কেউ সন্দেশ খাওয়াতে আসে সে সন্দেশকে সন্দেহ ক'রো।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "আচ্ছা, তা না-হয় করব; কিন্তু সন্তোষবাবু চা খেতে সন্দেহ করবেন না, অতএব তার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি কর। আর দেখ,—বদ্যিনাথের বিখ্যাত জিনিস একমাত্র রসুনচৌকি বাজনাই নয়, পেঁড়াও। পার যদি তো সন্তোষবাবুকে দু-চারটে পেঁড়াও খাইয়ো।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সুকুমার হাসিতে লাগিল। বলিল, "তা মন্দ নয়, নিয়তির বিধানে একজনের ভাগে পড়ল রসুনচৌকি, আর একজনের ভাগে পেঁড়া;—একজনের ভাগে পড়ল কমলা, আর-একজনের ভাগে ম-বর্জিত কমলা—অর্থাৎ কলা।"

হাসিমুখে বিনয় বলিল, "কিছু বলা যায় না সুকুমার। আমার মনে হয় পাশার চাল উল্টো পড়েছে,—শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যেই না ম-বর্জিত কমলা পড়ে।"

"সে ভয় ক'রো না বিনু,—এ পাশার দান সামান্য লোকের দান নয়, স্বয়ং বিধাতার দান। আচ্ছা, তুমি ব'স, শৈলকে চায়ের কথাটা ব'লে আমি আসছি।" বলিয়া সুকুমার অদৃশ্য হইল।

৩৩

সন্তোষ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বারান্দায় একটি গোল টেবিলের ধারে দুইখানি চেয়ারে বসিয়া সুকুমার এবং বিনয় অপেক্ষা করিতেছে; তৃতীয় একখানি চেয়ার তাহারই জন্য রাখা।

সে নিকটে আসিতেই উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুকুমার আগাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "ভারি খুশি হয়েছি সন্তোষ-বাবু, আপনি আসাতে। কিন্তু এতখানি পথ হেঁটে এসে আবার বেরিয়েছিলেন কেন? আমাকে একটা ডাক দিলেই তো হ'ত।"

চেয়ারে উপবেশন করিয়া সন্তোষ বলিল, "না, আপনাকে আর তখন ডাকি নি। সে উপদ্রবটা আপনার বন্ধুর উপর ক'রেই নিরস্ত হয়েছিলাম।"

"কিন্তু এ পক্ষপাতে আমিও তো ক্ষুণ্ণ হ'তে পারি।"

সুকুমারের কথায় সন্তোষ হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "আপনাকে ক্ষুণ্ণ না করা শক্ত দেখছি সুকুমারবাবু।"

বিনয় বলিল, "সেই জন্যই বোধ হয় ওকে খুশি করা এত সহজ।"

বিনয়ের কথায় সকলে হাসিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে একজন ভৃত্য চা এবং খাবার দিয়া গেল।

চা খাইতে খাইতে কথাবার্তা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আগাইয়া চলিল, কিন্তু যে বিষয়টা সম্ভবত তিন জনেরই মনে সর্বোচ্চ হইয়া বিরাজ করিতেছিল সেইটাই অকথিত রহিয়া গেল। সাধারণ অবস্থায় সেই কথাটাই আজকে চায়ের মজলিসে আলোচনার প্রধান প্রসঙ্গ হইত,

কিন্তু জলের একটা দিক বরফ হইয়া জমাট বাঁধিয়া তরল অংশের দিকটা গতি রোধ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; সুকুমার বলিল, "চললুম সন্তোষবাবু, চা খেয়ে গাড়ি ক'রে খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্।"

সন্তোষ বলিল, "আমার তো না বেড়িয়ে উপায় নেই—অন্তত জশিডি পর্যন্ত, কিন্তু এবার আর পদব্রজে নয়—ট্রেনে। চলুন না হয় স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন। কিন্তু পৌনে-আটটার গাড়ি তো চ'লে গেল, এখন বোধ হয় সওয়া নটার গাড়ি ভিন্ন উপায় নেই?"

সুকুমার বলিল, "সে গাড়িতেও আপনার উপায় আছে ব'লে মনে করবেন না। এ বাড়ির এক ব্যক্তি সে বিষয়ে আপনার বিঘ্ন হয়েছেন। তিনি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন, আপনার চা খাওয়া হ'লেই আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।"

সন্তোষ বলিল, "কে? শৈল? তা পাশের ঘরে অপেক্ষা করবার দরকার কি? এখানে এসে বসলেই তো হয়।"

"নিশ্চয় হয়; কিন্তু সে বিষয়ে আমাকে তিনি বিঘ্ন ব'লে মনে করেন।"

সুকুমারের কথায় সন্তোষ এবং বিনয় হাসিয়া উঠিল। সন্তোষ বলিল, "এতে আপনার দুঃখ করবার বিশেষ কারণ নেই সুকুমারবাবু—অনেক বৃহৎ ব্যাপার তুচ্ছ ব্যাপারের পক্ষে বিঘ্ন। কিন্তু সওয়া নটার তো এখনো অনেক দেরি, তবে সে গাড়িতে আমার যাওয়া চলবে না কেন?"

কেন চলিবে না শুনিয়া সন্তোষ একটু চিন্তিত হইল। বলিল, "কিন্তু আমি যে আপনাদের এখানে আসছি—সে কথাও দ্বিজনাথবাবুর বাড়ির কাউকে ব'লে আসি নি। চায়ের সময়টা একরকম ক'রে চ'লে যাবে—কিন্তু ভাত খাবার সময় আমি উপস্থিত না হ'লে তাঁরা ভারি অসুবিধায় পড়বেন।"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আপনার এ আপত্তি তোলবার পথ বউদিদি রাখেন নি। দ্বিজনাথবাবুর নামে তাঁর চিঠি নিয়ে পৌনে আটটার গাড়িতে লোক চ'লে গিয়েছে।"

শুনিয়া সন্তোষ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হতাশভাবে বলিল, "তা হ'লে আর উপায় কি?"

সুকুমার বলিল, "আমি তো বলছিলাম, উপায় নেই।"

চা খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য আসিয়া পেয়ালা রেকাব প্রভৃতি তুলিয়া লইয়া যাওয়ার পরই পাশের ঘরে মৃদু কাশির শব্দ শোনা গেল।

সুকুমার বলিল, "এ কাশির সঙ্গে সর্দির কোনো যোগ নেই সন্তোষবাবু; এর অর্থ আছে। আপনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমার প্রতি এ সঙ্কেত। আপনি যান,—কিন্তু একটু সতর্ক থাকবেন। পর্দার আড়াল থেকে যাঁরা এই রকম কেশে থাকেন তাঁরাই হচ্ছেন আপনাদের আইন-রাজ্যের পর্দা-নসিন লেডী। পর্দার ও-দিকে এঁরা অবলীলার সঙ্গে যে সব আশা ভরসা দেন, তার অর্থ পর্দার এ-দিকে এসে অনেক অনর্থ ঘটায়।"

সন্তোষ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু সেই অনর্থ আমাদের পকেট অর্থে পূর্ণ ক'রে দেয় সুকুমারবাবু। পর্দা-প্রথা উঠে গেলে প্রধান ক্ষতি হবে উকিল-ব্যারিস্টারের।"

কৌতুক-হাস্যের মৃদু আভাসটুকু মুখে বহন করিয়া সন্তোষ পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। একটা চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া শৈলজা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শৈলজার মুখের দিকে তাকাইয়া সন্তোষের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। বাহিরে এতক্ষণ হাস্য-পরিহাসের যে তরঙ্গ চলিতেছিল তাহা শৈলজাকে একেবারে স্পর্শ করে নাই। মুখে

তাহার নিবিড় সমবেদনার ছায়া, চক্ষে সকাতর দৃষ্টি। চেয়ারখানা সন্তোষের দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "ব'স।" তাহার পর সন্তোষ উপবেশন করিলে নিজে একখানা হালকা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "কাল রাত্রেই আমি সব শুনেছি। মনে সত্যিই ভারি কষ্ট পেয়েছি ফন্তুদাদা।"

সন্তোষের মুখে আবার ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "মন জিনিসটা মোটেই সুবিধের নয় টুলু। আঘাত পাবার পক্ষে কেমন ওর একটু বিশেষ পটুতা আছে। জ্ঞানী লোকেরা তাই মনকে জয় করবার জন্যে উপদেশ দেন।"

এই তত্ত্ব-কথার প্রতি কোনো প্রকারের মনোযোগ না দিয়া শৈলজা বলিল, "তোমার সঙ্গে তো কথা এক রকম স্থিরই হ'য়ে গিয়েছিল, তবে আবার এ রকম হ'ল কেন?"

একটু চিন্তা করিয়া শৈলজার মুখের দিকে তাকাইয়া স্মিতমুখে সন্তোষ বলিল, "অদৃষ্ট ব'লে মেনে নিলেই তো সব চুকে-বুকে যায় টুলু।"

শৈলজার মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল; রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "অদৃষ্ট, না আরো কিছু! এমন অবিচারকে তুমি অদৃষ্ট বল?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া সন্তোষ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বাহিরে বারান্দায় বসিয়া সুকুমার এবং বিনয় মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল,—গুন গুন করিয়া তাহার শব্দ শোনা যাইতেছিল, কথা বোঝা যাইতেছিল না। পথ দিয়া একটা সাঁওতাল-বালক বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল,—তাহার একটানা করুণ স্বরে বায়ুমণ্ডল যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। কম্পাউণ্ডের পাঁচিলের পাশে নিম্ গাছের ডালে বসিয়া একটা দোয়েল অবিশ্রান্ত শিস দিয়া যাইতেছিল।

"ফন্তুদাদা!"

শৈলজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তোষ বলিল, "বল।"

"তুমি যেমন কষ্ট পেয়েছ, আর একজন ঠিক তেমনি কষ্ট পেয়েছে; তোমার চেয়ে একটুও কম নয়। কে জান?"

"তোমার ননদ শোভা?"

"কি ক'রে জানলে? তোমাকে সে-দিন বলেছিলাম বুঝি?"

"বলেছিলে।"

"শৈলজা বলিল, "ভালবাসা যদি বলতে হয় তো সে শোভার ভালবাসা। কোথায় লাগে তার কাছে কমলার চোখের নেশা! এত চাপা মেয়ে, তবু কাল থেকে শুনে পর্যন্ত মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আমি ওর মুখের দিকে চাই নে, পাছে কেঁদে ফেলে।"

সন্তোষ বলিল, "আহা!"

"ফন্তুদাদা, একটা কথা বলব?"

"বল।"

একটু ইতস্তত করিয়া শৈলজা বলিল, "তুমি শোভাকে বিয়ে কর।"

শুনিয়া সন্তোষ হাসিতে লাগিল; বলিল, "তুমি কমলাদের ওপর সত্যিই চটেছ দেখছি টুলু।"

শৈলজা বলিল, "চটেছি খুবই, কিন্তু আমি সে জন্যে বলছি নে। এতে ভাল হবে।"

সহাস্যমুখে সন্তোষ বলিল, "কার ভাল হবে? আর যারই হোক, শোভার তো নয়ই। আমি নিতান্তই বাজে জিনিস টুলু। দেখলে না, দু-দুবার তার প্রমাণ হ'য়ে গেল। আমি পাবার মতো বস্তু নই—এ আমি বেশ বুঝেছি।"

শৈলজার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। এ কথার মধ্যে তাহার সঙ্গে

সন্তোষের বিবাহ ভাঙিয়া যাইবার উল্লেখ ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল; বলিল, "শোভার যদি পূর্বজন্মের পুণ্য থাকে তা হ'লে সে তোমাকে পাবে। সে তোমার সম্পূর্ণ উপযুক্ত কি-না তা আমি বলতে পারি নে ফস্তুদাদা। তুমি সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে রাজী হও।"

সন্তোষ বলিল, "এ যদি শুধু যোগ-বিয়োগের বিবেচনা করা যায় তা হ'লে তোমার কথা সমীচীন ব'লে মনে হবে। কিন্তু মনের হিসেব তো ধারাপাতের নিয়মে চলবে না টুলু, তুমি শোভাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, সে-ও বলবে—চলবে না।"

ইহার পর শৈলজা নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের জাল দিয়া সন্তোষকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই মত পরিবর্তন করিল না। বলিল, "তুমি যদি নিতান্তই আমার দুঃখ লাঘব করতে চাও তো ভাল ক'রে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করগে। সমস্ত দিন যদি তর্কই করবে তো রাঁধবে কখন?"

শৈলজা হাসিতে লাগিল; বলিল, "দুঃখ লাঘবের জন্যে কত খাও তা যথাসময়ে দেখা যাবে। এখন আর বেশি পেড়াপিড়ি করব না,—কিন্তু আমার আরজি পেশ ক'রে রাখলাম ফস্তুদাদা।"

সন্তোষ হাসিমুখে বলিল, "কিন্তু এ আরজি মঞ্জুর করলে তোমার কোনো মঙ্গল করব না—তা আমি নিঃসন্দেহে ব'লে দিলাম।"

আহারাদির ঘণ্টাখানেক পরে সন্তোষ বলিল, "ছটার সময়ে যখন কলকাতা যাবার ট্রেন, তখন এবার আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিই সুকুমারবাবু। আমাকে অনুগ্রহ ক'রে একখানা ঠিকে-গাড়ি আনিয়ে দিন।"

সুকুমার বলিল, "ঠিকে-গাড়ির দরকার নেই—ঘরের গাড়িই জুতিয়ে দিচ্ছি।"

সন্তোষ বলিল, "না, না, ঘরের গাড়ি নয়, ঠিকে-গাড়িই আনিয়ে দিন। ঘরের গাড়ি এতখানি পথ যাবে, তারপর ফিরে আসবে।"

সুকুমার বলিল, "ফিরে আসবে সেটা চিন্তার কারণ নয়, ফিরে না এলেই চিন্তার কারণ হবে। তা ছাড়া সমস্ত দিন ঘোড়া ব'সে রয়েছে—একটু ফেরাই ভাল।"

কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা সুকুমার ঠিকা-গাড়ির জন্য লোক পাঠাইল।

গাড়ি আসিলে বিনয় বলিল, "চলুন সন্তোষবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও যাই—আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসব।"

সন্তোষ বলিল, "অনর্থক কেন কষ্ট করবেন।" তাহার পর একটা কথা সহসা মনে পড়ায় বলিল, "আচ্ছা, চলুন।"

সুকুমার বলিল, "তা হ'লে আমিও যেতে পারি বিনু।"

বিনয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তুমি বাড়িতে থাক। একজন গেলেই যথেষ্ট।"

সুকুমারের মুখে অর্থব্যঞ্জক হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল।

সমস্ত পথ বিনয় সন্তোষের সহিত নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে চলিল, বাড়ি পৌঁছিয়া সন্তোষের জিনিসপত্র গুছানোর ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ যোগ দিয়া রহিল, চা খাওয়ার সময়ে পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে একটু বেশি করিয়া খাবার খাওয়াইল এবং যাইবার সময়ে মোটর আসিয়া দাঁড়াইলে দ্বিজনাথকে বলিল, "আপনার যাবার দরকার নেই—আমি গিয়ে তুলে দিচ্ছি।" সুকুমারের বাড়ি হইতে আসিয়া পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য সে সন্তোষের সঙ্গ ছাড়ে নাই, এবং তাহার নিরবসর পরিচর্যার মধ্যে এমন একটু ফাঁক ছিল না যাহার মধ্য দিয়া দ্বিজনাথ কমলা বা অন্য কেহ প্রবেশ করিয়া একটু কাজে লাগিতে পারে।

অন্দর হইতে পদ্মমুখীকে প্রণাম করিয়া আসিয়া সন্তোষ দ্বিজনাথকে প্রণাম করিল। অদূরে কমলা দাঁড়াইয়া ছিল, নিকটে আসিয়া নত হইয়া সন্তোষকে প্রণাম করিল। যুক্তকরে তাহার প্রত্যভিবাদন করিয়া সন্তোষ গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

স্টেশনে পৌঁছিয়া বিনয় মহবুবকে বলিল, "সাহাব হাওয়া খানে যাঙ্গে—গাড়ি লে যাও।" তাহার পর প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দেখিল, হোম্ সিগ্‌নাল্ ডাউন হইয়াছে, গাড়ি আসিবার দেরি নাই।

টিকিট কেনাই ছিল। অল্পক্ষণ পরে গাড়ি আসিলে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরার পাশের দিকের বেঞ্চে কুলিকে দিয়া বিনয় সন্তোষের শয্যা পাতাইয়া দেওয়াইল। তাহার পর স্যুটকেস, অ্যাটাসি কেস, টিফিন্ কেরিয়ার, খাবার জলের সোরাই প্রভৃতি ভাল করিয়া যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া সে বিছানার উপর সন্তোষের পাশে বসিল। জশিডিতে এই প্যাসেঞ্জার গাড়ি পনেরো মিনিট দাঁড়ায়। দুইজনে এই দীর্ঘ সময় পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল—একটা কথাও কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না। গার্ড হুইস্‌ল্ দিলে বিনয় গাড়ি হইতে নামিয়া জানলার ধারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষ তাহার ডান হাতখানা বিনয়ের দিকে প্রসারিত করিয়া বিনয়ের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

"কলকাতায় গেলে দেখা করবেন।"

বিনয় বলিল, "নিশ্চয় করব।"

সে দিন কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে যাত্রীর ভিড় ছিল—একখানা দেওঘর যাইবার ট্রেন প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করিতেছিল। সন্তোষের গাড়ি দৃষ্টির অন্তরাল হইলে একখানা টিকিট কিনিয়া বিনয় গাড়িতে চড়িয়া বসিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কি মনে করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া

পড়িয়া রেলের লাইন ধরিয়া দ্বিজনাথের গৃহে উপস্থিত হইল। দ্বিজনাথ নিয়মিত বেড়াইতে গিয়েছিলেন, তখনও ফেরেন নাই। কমলা বিষণ্ণ চিত্তে পূর্বদিনের মতো সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ছিল, বিনয় নিকটে উপস্থিত হইলেও সে উঠিল না—নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

কমলার ডান পাশে যে স্বল্প পরিসর একটু স্থান ছিল তাহাতে বসিয়া পড়িয়া কমলার ডান হাতখানি দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বিনয় বলিল, "সন্তোষকে বিদায় দিয়ে এলাম কমলা।"

উত্তরে কমলা কিছু বলিল না—যেমন বসিয়া ছিল ঠিক তেমনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিল,—শুধু তাহার দুই চক্ষু হইতে নিঃশব্দে ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

এই শিলাখণ্ডের উপর ঠিক একদিন পূর্বে বসিয়া সন্তোষ প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার সহিত কমলার মিলন যেন অটল হয়। তখন তাহার মনে পড়ে নাই—শিলার আর একটা নাম পাষাণ।

পরদিন কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। এমন কি, বাড়ির চাকর-বাকরদেরও জানিতে বাকি রহিল না যে, 'ছবি-ওয়ালাবাবু' শুধু কমলার ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কমলাকে বিবাহ করিয়া তবে নিরস্ত হইবে। দ্বিজনাথ এবং কমলার সহিত পদ্মমুখী দুই-তিন দিন ভাল করিয়া কথা কহিলেন না, মুখ ভার করিয়া রহিলেন; কিন্তু ক্রমশ বিবেচনার কাছে চিত্তাবেগকে পরাভূত করিয়া তিনি মনকে হালকা করিয়া লইলেন। এমন কি, শৈলজা পর্যন্ত ঘটনার অলঙ্ঘনীয়তাকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়া বিনয়ের সহিত অল্প অল্প কৌতুক-পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। শুধু শোভার মনে কথাটা কাঁটার মতো বিঁধিয়া রহিল—সেখান হইতে সহজে তাহা উৎপাটিত হইল না; কিন্তু ফুলের মধ্যে কীটের মতো সে কথা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল একটা বাহ্য ঔদাসীন্যের আবরণে।

সকালে চা-পানের পর নিয়মিত প্রাতভ্রমণে না গিয়া দ্বিজনাথ বেলা দশটা পর্যন্ত বসিয়া বিমলাকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। শারীরিক অসুস্থতা বশত যে কার্য আদালতে কিছুদিন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিমলার চিঠিতে বিনয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই ওকালতি চূড়ান্তভাবে করিলেন। পরিশেষে লিখিলেন, "সন্তোষের মতো সৎপাত্রকে পরিত্যাগ ক'রে বিনয়ের হাতে কমলাকে অর্পণ আমি অবিবেচনায় করি নি,—আমার প্রতি এ বিশ্বাসটুকু রেখে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ো। কমলার বিবাহে কমলার সুখই যদি আমাদের প্রধান কাম্য হয় তা হ'লে কমলার অভিরুচি অনুযায়ী কাজ ক'রে আমি ভুল করি নি। কমলা

নিজে যে কোনো ভুল করে নি তা তুমি এখানে এসে বিনয়কে দেখলেই বুঝতে পারবে।" অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে বিনয়ের সহিত কমলার বিবাহ দিবেন, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ম দ্বিজনাথ বিমলকে তাগিদ দিলেন।

বৈকালে সুকুমারদের গৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি সকলের নিকট শুভ-সংবাদ ব্যক্ত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া সুকুমার ও বিনয়কে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুই বন্ধুর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্বে মোটর আসিয়া হাজির হয়,—সুকুমার একদিন যায় তো দুই-দিন ওজর-আপত্তি করিয়া কাটাইয়া দেয়। বিনয় তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া বলে, "ভুল করছ বন্ধু,—নিমন্ত্রণগুলি থেকে তুমি নিজেকেও বঞ্চিত করছ,—আমারও তাতে কোনো সুবিধে না হ'য়ে অসুবিধেই হচ্ছে। তুমি থাকলে তবু তোমাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের অবস্থান বোঝাবার ছল ক'রে দ্বিজনাথবাবুর উঠে যাবার সুবিধে হয়—কিন্তু তুমি না থাকলে ধ্রুব তারার মতো অচল হ'য়ে তিনি ব'সে থাকতে বাধ্য হন।" বিনয়ের কথা শুনিয়া সুকুমার হাসিয়া উঠে, বলে, "কিন্তু তুমি বুঝছ না বিনু। কাল আমাকে কৃত্তিকা দেখিয়েছেন—আজ গেলে হয়তো রোহিণী দেখাবেন। কিন্তু রোজ রোজ গেলে শেষে একদিন যখন হস্তা দেখিয়ে দেবেন, তখন আর অনুতাপের সীমা থাকবে না। একটা নিমন্ত্রণও বাদ দোব না সঙ্কল্প করলে শেষকালে একটা নিমন্ত্রণও পাব না।" মাথা নাড়িয়া বিনয় বলে, "নক্ষত্র-প্রকরণ জান না? কৃত্তিকার অনেক পরে হস্তা; তার আগেই অশ্লেষা মঘা একটা কোনো শুভ নক্ষত্র মাথায় ক'রে আমি কলকাতা রওনা হব।" সুকুমারের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠে; বলে, "আমি না হয় নক্ষত্র-প্রকরণ

জানি নে, কিন্তু তুমিও তারকা-প্রকরণ জান না বিনু। আকাশের সমস্ত নক্ষত্র দেখা আমার শেষ হ'য়ে যাবে—কিন্তু কমলার দুটি চোখের নীলিমায় যে দুটি তারা আছে তা দেখা তোমার শেষ হবে না। অশ্লেষা মঘার কথা কি বলছ? কত অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা রেবতী কেটে যাবে, তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না।"

কথাটা যে এমন করিয়া বলা চলে না, তাহা নহে; কারণ কমলার প্রতি বিনয়ের আকর্ষণ বাড়িয়া চলিয়াছিল গুণ-বৃদ্ধি হারে। আজ যাহা, কাল তাহার দ্বিগুণ,—পরশু চতুর্গুণ। সন্ধ্যার সময়ে গাড়ি আসিতে বিলম্ব হইলে উদ্বেগে সে যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিত, গাড়ি আসার পর আনন্দের চঞ্চলতা তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম প্রকাশ পাইত না। সুকুমার পরিহাস করিত, শৈলজা বিদ্রূপ করিত; তদুত্তরে গাড়ি আসিবার পূর্বে বিনয়ের চক্ষে দেখা দিত ভ্রূকুটি, গাড়ি আসিবার পরে মুখে দেখা দিত হাসি। সুকুমার বলিত, "ভায়া, কমলা-মিষ্টান্নটি যত উপাদেয়ই হোক একেবারে বেমালুম পরিপাক ক'রো না; কিছু বাকি রেখো—ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।" শৈলজা বলিত, "আমি তার চেয়েও গুরুতর বিপদ থেকে আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি ঠাকুরপো। কমলা-মিষ্টান্নটিই যেন আপনাকে বেমালুম পরিপাক না করে, কিছু নিজের বাকি রাখবেন—ভবিষ্যতে যাতে একেবারে অকেজো না হ'য়ে যান।" বিনয় কোনো তর্ক না তুলিয়া মৃদু হাস্যের দ্বারা সুকুমারের রঙ্গ এবং শৈলজার ব্যঙ্গ উভয়ই পরিপাক করিত। সুতরাং সুকুমারের কথার মধ্যে অবিবেচনার কথা বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু চার-পাঁচ দিন পরে সকালে চা খাওয়ার পর যখন বিনয় বলিল, "আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা চললাম সুকুমার।" তখন সুকুমার বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল বিনয়ের মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তারপর জিজ্ঞাসা করিল "হঠাৎ?"

বিনয় বলিল, "মাস দুই আগে যেদিন এসেছিলাম সেদিনও তো হঠাৎ এসেছিলাম—বিচার-বিবেচনা ক'রে আসি নি।"

শৈলজা শুনিয়া বলিল, "ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন না-কি ঠাকুরপো?"

বিনয় বলিল, "সত্যিই ভয় পেয়ে। যা ভয় আপনি দেখালেন! পাছে কমলা আমাকে বেমালুম পরিপাক ক'রে ফেলে সেই ভয়ে পালাচ্ছি।"

"বাকি কিছু রেখেছে কি?"

বিনয়ের মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "কেন, আমার অবস্থা কি ঠিক সুকুমারেরই মতো হয়েছে ব'লে আপনার মনে হচ্ছে?"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সুকুমার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ঢিল মারতে গিয়ে পাটকেল খেতে হ'ল শৈল। এখন কি উত্তর দেবে দাও।"

আরক্তমুখে শৈলজা বলিল, "আমি তো আর কমলার মতো উপাদেয় বস্তু নই যে, ঠাকুরপোর মতো তোমার অবস্থা হবে।"

সুকুমার সহাস্যমুখে বলিল, "এ তোমার বিনয়ের কথা হ'ল শৈল। ও-বিষয়ে তোমরা কেউ কারুর চেয়ে কম নও। প্রত্যেক গোখরো সাপ বোধ হয় নিজেদের মধ্যে দীনতা প্রকাশ ক'রে বলে—আমার আর এমনই কি বিষ আছে!"

কপট কোপ করিয়া শৈল বলিল, "দেখে তো তোমাকে একটুও মনে হয় না যে, এক বিন্দুও তোমাকে পরিপাক করেছি। তুমি ঠিক আস্তটিই আছ।"

সুকুমার বলিল, "দেখে তো মনে হবার কথা নয়। তোমাদের পরিপাক ঠিক গজের পরিপাকের মতো,—কৎবেলের খোলাটি ঠিক থাকে, কিন্তু ভিতরের পদার্থটি একেবারে নিঃশেষে পরিপাক কর।"

বিনয় হাসিতে লাগিল; বলিল, "সুকুমার বলতে চায়—আপনার

আমাদের একেবারে অপদার্থ ক'রে ছেড়ে দেন। অতএব এ অবস্থায় যদি কিছু পদার্থ এখনও বাকি থাকে তা নিয়ে স'রে পড়াই উচিত।"

সুকুমার বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয়, ভীরুর মতো পালিয়ে না গিয়ে বীরপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করা উচিত। আর কিছুদিন থেকে যাও। নিতান্ত যদি দরকার মনে কর, বিয়ের আগে মাস খানেক অদর্শনের দ্বারা প্রেমটাকে আবার একটু ঝালিয়ে নিয়ো।"

শৈলজা বলিল, "আর কিছুদিন থেকে গেলে অন্তত বলতে পারবেন অপদার্থ হ'তে কিছু সময় লেগেছিল।"

বিনয় কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বেলা বারোটার মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া লইল। সন্ধ্যার সময়ে সুকুমারের অন্যত্র একটু কাজ ছিল; সুতরাং স্থির হইল, সে রাত্রি এগারোটার সময়ে বিনয়ের দ্রব্যাদি লইয়া স্টেশনে উপস্থিত হইবে—সন্ধ্যাবেলা দ্বিজনাথের মোটর আসিলে বিনয় একা কমলাদের বাড়ি যাইবে।

মোটর যখন আসিল, সুকুমার বাড়ি ছিল না। গিরিবালার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া বিনয় শৈলজাকে বলিল, "অনেক দিনের বাসা তুলে চললাম বউদি,—ত্রুটি অপরাধ অনেক হয়েছে, ক্ষমা করবেন।"

প্রণাম করিবার জন্য শোভা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সামনে আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বিনয় বলিল, "তোমার স্নেহ-যত্নের কথা কখনো ভুলব না শোভা,— চিরদিন মনে থাকবে।"

কোনো কথা না বলিয়া ক্ষণকাল নতনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শোভা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

শোভা প্রস্থান করিলে বিষণ্নমুখে শৈলজা বলিল, "আপনি আর কমলা সুখী হোন ঠাকুরপো—একান্ত মনে তাই কামনা করি; কিন্তু

শোভার জন্য আমার মনে একটুও সুখ নেই। এখনও ও সামলাতে পারে নি ; আপনি চ'লে যাবেন শুনে পর্যন্ত ওর মুখে কথা নেই, মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে ! অথচ এখন তো আর কোনো—" কথাটা শেষ না করিয়া সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া বলিল, "যাক, সে সব কথা। আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন—ওর জন্যে একটি ভাল পাত্রের সন্ধান করবেন তো ঠাকুরপো। এখান থেকে খোঁজ-তল্লাশ করা কী যে মুশকিল !"

পাংশু মুখে বিনয় বলিল, "করব।"

শৈলজা বলিল, "শোভাকে বিয়ে করবার জন্যে আমি ফন্তুদাদাকে অনুরোধ করেছিলাম।"

বিনয়ের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ; সাগ্রহে বলিল, "কি বললেন তিনি ?"

একটু চিন্তা করিয়া শৈলজা বলিল, "বললেন বিশেষ কিছুই না—নিজেকে বাজে জিনিস ব'লে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, শোভাকে তাঁর বিয়ে করলে নিতান্তই যোগ-বিয়োগের অঙ্ক কষা হবে।"

নতনেত্রে অন্যমনস্কভাবে কি একটু চিন্তা করিয়া বিনয় বলিল, "চললুম বউদি।"

শৈলজা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আসুন। যা বললাম মনে রাখবেন।"

মনে সেটা এতই রহিল যে সারা পথ এক মুহূর্তের জন্য বিনয় তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইল না। গাড়ি আসিয়া বারান্দার সম্মুখে থামিতে কমলা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল ; বিনয় নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে বলিল, "বাবা যদুনাথবাবুর অসুখ শুনে দেখতে গেছেন। বেশি দূরে বাড়ি নয়। লেডিস পার্কের কাছে। ডাকতে পাঠাব কি ?"

বিনয় বলিল, "ব্যস্ত করবার দরকার নেই, কতই বা তাঁর দেরি হবে !"

যথারীতি বাগানের ভিতর চার-পাঁচখানা চেয়ার মণ্ডলাকারে রাখা ছিল—উভয়ে গিয়া দুইখানা অধিকার করিয়া বসিল।

"সুকুমারবাবু এলেন না?"

বিনয় বলিল, "রাত্রি এগারটার সময় আমার জিনিসপত্র নিয়ে সে স্টেশনে যাবে। আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি কমলা।"

কমলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "আজ? এত শিগগির যাবার তো কোনো কথা ছিল না!"

"না, ছিল না,—কিন্তু যাওয়া দরকার হয়েছে। কতকগুলো অর্ডার এসে রয়েছে—সেগুলোর কাজ শিগগির আরম্ভ না করলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। তা ছাড়া, পারী থেকে একজন আমার পরিচিত নামজাদা আর্টিস্ট কলকাতায় এসেছেন—তিনি তিন-চার দিনের মধ্যে চ'লে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না হ'লে শুধু আমিই দুঃখিত হব না, তিনিও হবেন।"

বিনয়ের মুখে একটা বিমর্ষ মলিন ভাবের অস্তিত্ব কমলা প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর কি আজ তেমন ভাল নেই?"

একটু ইতস্তত করিয়া বিনয় বলিল, "শরীর ভাল আছে, কিন্তু মনটা তেমন ভাল নেই। রিজ-এর ওপর গিয়ে একটু বসবে কমলা? অবশ্য যদি কোনো অসুবিধে বা আপত্তি না থাকে।"

"না, আপত্তি কিসের?—চলুন যাই।" বলিয়া কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। গেটের পাশে জীবনের ঘর। জীবন ঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিল, কমলা ও বিনয় নিকটে আসিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলা বলিল, "জীবন, বাবা এসে খোঁজ করলে ব'লো—আমরা পশ্চিম দিকের ঢালে বেড়াতে গেছি।"

সাগ্রহে মাথা নাড়িয়া বিনীতভাবে জীবন বলিল, "যে আজ্ঞে দিদিমণি।" তাহার পর দুই পা আগাইয়া আসিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "দিদিমণি, সাহেব আমাকে ব'লে গেছলেন জা—জামাই-বাবু এলে তাঁকে খবর দিতে। দেব কি?"

কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; মৃদুস্বরে 'দরকার নেই' বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

গেটের বাহিরে আসিয়াই বিনয় সকৌতূহলে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও জামাইবাবু কাকে বললে?"

প্রশ্ন শুনিয়া কমলার হাস্য রোধ করা কঠিন হইল—কোনো রকমে মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিয়া সে মনে মনে বলিল, 'একমাত্র ছবি আঁকা ছাড়া যে আর কিছুই বোঝে না তাকে।' প্রকাশ্যে বলিল, "আপনার কাকে মনে হয়?"

"বোধ হয় আমাকে,—কিন্তু ওরা কি এরই মধ্যে সব জানতে পেরেছে?"

"সে কথা ফেরবার সময় ওকেই জিজ্ঞাসা করবেন।"

কমলা পরিহাস করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বিনয়ের মুখে অপ্রতিভতার সলজ্জ হাস্য দেখা দিল।

বাড়ির পাশ দিয়াই রিজ-এ যাইবার পথ, বাড়ির সীমা অতিক্রম করিলেই রিজ। রিজ-এর একদিকে বৈদ্যনাথ যাইবার রেল লাইন,—অপরদিকে নিম্ন অধিত্যকায় ই. আই. আর. কোম্পানির মেন্ লাইন। একটা দীর্ঘ মালগাড়ি ঘন-কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গিরণ করিতে করিতে বিকট ঘজো-ঘজো শব্দ করিয়া মন্থরগতি সরীসৃপের মতো কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। গিরি-গাত্রে একটু নামিয়া গেলে কয়েকটা আতা গাছের অন্তরালে একটা শিলাখণ্ড আছে; তথায় উপবেশন করিলে

সম্মুখের দৃশ্য প্রমুক্ত থাকে, অথচ পিছন দিক হইতে সহসা দেখা যায় না। এ ব্যবস্থাটি লোকচক্ষু-অন্তরালকামীদের পক্ষে লোভনীয়। কমলা ও বিনয় তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শিলাসনের উপর পাশাপাশি উপবেশন করিল।

সন্ধ্যার ঘনায়মান ধূসরতার মধ্যে ডিগ্ রিয়া পাহাড়ের অস্পষ্ট আকৃতি দেখা যাইতেছিল। তাহার শিখরদেশে শরৎকালের নির্মল আকাশে মাজা-ঘষা চকচকে দুই-তিনটি তারা। চতুর্দিক জনশূন্য নীরস —অপসৃয়মান মালগাড়ির বিলীয়মান শব্দ সে নীরবতাকে যেন পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। ডিগ্ রিয়ার পাদদেশে ছোট ছোট পল্লীগুলিতে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া বহুক্ষণ সম্মুখের উদার উন্মুক্ত দৃশ্যের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সহসা এক সময়ে বিনয় কমলার দক্ষিণ হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "কমলা, কি কষ্ট তা জান ?"

চমকিত হইয়া বিনয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া কমলা বলিল, "না।"

"আমাদের মিলনের মধ্যে দুটি প্রাণীর বিচ্ছেদ-ব্যথা বাসা বেঁধে আছে, তা বোধ হয় জান না ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে কমলা বলিল, "জানি।"

"শোভার কথাও জান ?"

"জানি।"

"একজনকে তুমি অসুখী করেছ, আর একজনকে করেছি আমি।"

ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কমলা বলিল, "তাই কি আজ হঠাৎ চ'লে যাচ্ছেন ?"

"তাই যাচ্ছি নে। যাচ্ছি, যে কারণ তোমাকে বললাম, সেই কারণে ; কিন্তু ও-কারণেই যাওয়া উচিত ছিল আরো অনেক আগে।"

"কেন ?"

"তা হ'লে দুঃখ দেওয়ার পাপ থেকে আর একটু বেশি পরিত্রাণ পেতাম ."

এই সামান্য কথার মধ্যে দুঃখ, অভিমান অথবা অপমানের কি কারণ কোথায় লুক্কায়িত ছিল বলা কঠিন, কিন্তু কমলার চক্ষু হইতে এক রাশ অশ্রু বিনয়ের দুই হাতের উপর ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

চকিত হইয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল, "তুমি কাঁদছ কমলা ?—তোমার মনে কষ্ট হ'তে পারে আমি তো এমন কোনো কথা বলি নি!"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া কমলা বলিল, "না, কাঁদি নি।"

"কাঁদো নি ? কই দেখি, কেমন কাঁদো নি, একবার উঠে দাঁড়াও তো।" বলিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কমলা উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে কমলার আনত-সিক্ত চক্ষু দুটি চক্‌চক্‌ করিতেছে। ক্ষণকাল অপলক চক্ষে বিনয় কমলার সেই অপূর্ব সুষমামণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাম হাত দিয়া কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া দক্ষিণ হাত কমলার মাথার পিছন দিকে রাখিয়া সন্তর্পণে কমলার মুখের উপর একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। লজ্জায় পুলকে অননুভূতপূর্ব অনুভূতির প্রকোপে কমলার দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার অবসন্ন মস্তক বিনয়ের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। বিনয় সযত্নে কমলার অবশ দেহ নিজ দেহের উপর ধরিয়া রাখিল, তাহার পর কিছুক্ষণ পরে কমলা একটু সুস্থ হইলে বলিল, "এখন বাড়ি যেতে পারবে কমলা ? বাবা বোধ হয় এতক্ষণে ফিরে এসেছেন। পারবে ?"

মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "পারব।"

তখন কমলার বাহু নিজ বাহুর মধ্যে গ্রহণ করিয়া বিনয় ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

৩৬

বিনয় কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার পর শুধু কমলারই নহে, দ্বিজনাথেরও মন খারাপ হইয়া গেল। জশিডি আর ভাল লাগে না, ত্রিকূট-ডিগ্রিয়ার সে মোহিনীমায়া অন্তর্হিত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের গিরি-পৃষ্ঠে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয় না,—এমন কি উভয়ের মধ্যে কথোপকথনও আর তেমন জমে না, আরম্ভ হইয়াই সংক্ষিপ্ত দুই-চারটা উত্তর-প্রত্যুত্তরে শেষ হইয়া যায়; তখন আবার একটা নূতন প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য মনে মনে বিষয়-বস্তুর অন্বেষণ করিতে হয়।

বিপদ দেখিয়া দ্বিজনাথ উপনিষদ্ খুলিয়া শঙ্কর-ভাষ্যে লাল পেন্সিলের দাগ কাটিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাল লাগিল না; বিশ্বের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যখন উর্ণনাভ এবং তন্তু, পৃথিবী এবং ওষধি, জীবদেহ এবং কেশলোমের দৃষ্টান্ত আসিয়া পড়িল তখন ক্ষণকাল অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিয়া পুস্তকখানি মুড়িয়া রাখিয়া কমলার ঘরের সামনে আসিয়া ডাক দিলেন, "কমল!"

কমলা তখন একটি রুটিন তৈরী করিয়া 'উত্তরমেঘ' খুলিয়া পড়িতেছিল—'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং', আর মনে মনে চিত্রকূটকে ত্রিকূট এবং অলকাকে কলিকাতা বলিয়া কল্পনা করিতেছিল। দ্বিজনাথের ডাক শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া পর্দা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি বাবা?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "কিছু করছিলে কি?"

"বিশেষ কিছু না,—একটু পড়ছিলাম।"

"তা হ'লে চল না একটু বেড়িয়ে আসা যাক—শরীরটা তেমন সুবিধে ঠেকছে না।"

কমলার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এখানে শরীর অর্থে মন। বলিল, "বেশ তো, তাই চল; কিন্তু কোন্ দিকে যাবে বাবা?"

"তুমিই বল, কোন্ দিকে যাওয়া যায়!"

কমলার মনে ত্রিকূট তখনো আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিল; বলিল, "ত্রিকূট গেলে মন্দ হয় না।"

ঘড়ি দেখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "একটু দেরি হ'য়ে গেছে,—তা হোক, চল, ত্রিকূটই যাওয়া যাক। শিগগির তৈরী হ'য়ে নাও।"

ডুম্‌কা যাইবার পাকা সড়কের পাশে ত্রিকূটপর্বতশ্রেণী পথ হইতে প্রায় দেড় পোয়া দূরে অবস্থিত। পথের অপর দিকে শ্রীশা মৌজা—একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। দ্বিজনাথের মোটর যখন শ্রীশা মৌজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। শরতের অপরাহ্ণ, পথ-পার্শ্ব হইতে গিরিপাদমূল পর্যন্ত উচ্ছলিত হিল্লোলিত ঘন সবুজবর্ণের ধানক্ষেত, তাহার ভিতর দিয়া আলের উপরে উপরে পাহাড়ের নিকটে উপস্থিত হইবার পথ। ধানক্ষেতের প্রান্তে লতাপাদপ-মণ্ডিত ঘন নীলবর্ণের ত্রিকূট পাহাড়ের ধ্যান-নিমগ্ন মূর্তি। সূর্য তখন পাহাড়ের পশ্চাতে নামিয়া গিয়াছে; সুতরাং ছায়ালোকের স্নিগ্ধ-নিবিড়-সম্পাতে সমস্ত দৃশ্য অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

গাড়ির উপর বসিয়া এই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্যের লীলা দেখিতে দেখিতে কমলা আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল; তাহার পর হঠাৎ এক সময়ে চেতনা লাভ করিয়া দ্বিজনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, একটুখানি পাহাড়ে উঠলে হয় না?"

কমলার এই আগ্রহের সহিত যাহাদের স্বার্থের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ

ছিল এমন দুই-তিনটি গ্রাম্যযুবক নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া দ্বিজনাথকে বলিল, "চলুন না হুজুর, উপরে ত্রিকূটেশ্বরী মহাদেবের মন্দির আছে—দর্শন করবেন। তা ছাড়া, গুহার মধ্যে একটি বাঙালী বাবা আছেন,—সাধু লোক।"

দ্বিজনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কমলা বলিল, "গেলে হয় না বাবা? মন্দ কি, দেবদর্শনও হবে।"

প্রথমে একটু ইতস্তত করিয়া দ্বিজনাথ অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। পথে দুই-এক জায়গায় ঝরনার জলের ধারা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, সুতরাং গাইড্ দুইজনের পরামর্শে জুতা খুলিয়া যাইতে হইল। পাহাড়ের কিয়দ্দূর উঠিয়া ত্রিকূটেশ্বরের মন্দির এবং সংলগ্ন ধর্মশালা। মন্দির দর্শন করিয়া কমলা এবং দ্বিজনাথ আরও কিছু উপরে বাঙালী সাধুর গুহায় উপস্থিত হইলেন। পর্বতগাত্রে সে গুহা মানুষের সুবিধার জন্য মানুষের চেষ্টায় একটি প্রশস্ত কক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। ঈষৎ-উচ্চ বেদীর উপর শয্যা বিছানো,—তাহার উপর একটি বাঙালী সাধু বসিয়া আছেন। তিনি যে আশ্রমের অধীন সেই আশ্রমের প্রকাশিত ইংরাজী বাংলা এবং হিন্দী অনেকগুলি পুস্তক প্রদর্শনের জন্য এবং বিক্রয়ার্থে তাঁহার সম্মুখে থাক্ থাক্ করিয়া সাজানো। কিছুক্ষণ সাধুর সহিত আলাপের পর খান দুই বই খরিদ করিয়া দ্বিজনাথ কমলাকে লইয়া গুহার বাহিরে আসিলেন। সেখান হইতে সম্মুখের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা গতিহারা হইয়া ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিলেন। তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ কিরণে সমস্ত পাহাড় পর্বত গাছপালা উদ্ভাসিত, বহুদূরস্থিত পর্বতগুলির অস্পষ্ট ধূসর মূর্তি দিক্চক্রবালের উপর অঙ্কিত, বনতরু-নিবদ্ধ দিগন্ত-প্রসারিত নিম্নভূমির বক্ষে আসন্ন সন্ধ্যার ঘন মায়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

ক্ষণকাল প্রকৃতির এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "চল কমল, এবার নেবে যাওয়া যাক। অন্ধকার হ'য়ে গেলে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে না।"

কমলা ঠিক যেন কোনো স্বপ্নালোকে বিরাজ করিতেছিল, দ্বিজনাথের কথায় তন্দ্রামুক্ত হইয়া বলিল, "চল বাবা। কিন্তু কী ভালই যে আজ লাগল! মনে হচ্ছে, আজ রাতটা এখানেই কাটাই।"

পশ্চাতে সাধু দাঁড়াইয়া ছিলেন; মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা নেই তো মা। আজ রাত্রে আমাকে শহরে যেতে হবে—আজকের রাতের মতো আমার আশ্রয় আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি। এমন কি, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য কিছু আহারের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়ে যেতে পারব।"

দ্বিজনাথ পিছন ফিরিয়া সাধুর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন, "সৌভাগ্য গ্রহণ করতে পারার জন্যও একটা স্বতন্ত্র সৌভাগ্য থাকা দরকার। আমাদের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ সে সৌভাগ্য লেখেন নি।"

সাধু আর কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "ফেরবার পথে একবার সুকুমারদের বাড়ি হ'য়ে গেলে মন্দ হয় না। কি বল কমল?"

কমলা বলিল, "বিশেষ কিছু দরকার যদি না থাকে তো সোজাসুজি বাড়ি চ'লে গেলেই হয়।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "দরকার এমন কিছুই নেই—তবে পরশু বিনয় কলকাতা গেছেন, আজ একখানা চিঠি প্রত্যাশা করছিলাম; ওদের বাড়ি পৌঁছা-সংবাদ এসেছে কি-না দেখতাম।"

এ কথার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া কমলা নীরবে দক্ষিণ দিকের

দ্রুত-অপসৃয়মান ত্রিকূটপর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিল। সুকুমারদের বাড়ি যাইবার কথা উঠায় শোভার কথা মনে পড়িয়াই তাহার মনে অনিচ্ছার উদয় হইয়াছিল। কলহ নাই, বিবাদ নাই, প্রতিযোগিতায় শোভা তাহার নিকট পরাস্ত, তবু যেন অন্তরের কোন্ নিভৃত স্থানে শোভার সহিত তাহার বিরোধ। শোভা বাধা দেয় না বলিয়াই তাহাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে বাধে, শোভা পথ ছাড়িয়া দেয় বলিয়াই সে পথকে নিরাপদ মনে হয় না।

মোটরের শব্দ এবং হর্ন শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল শোভাই। সুকুমার বাড়ি নাই, তাহার ঠিকাদারী কাজের ব্যাপারে রেলের একজন বড় অফিসারের সহিত দেখা করিতে মধুপুর গিয়াছে, রাত্রি দশটার গাড়িতে ফিরিবে। বিনয়ের চিঠিপত্র আসে নাই শুনিয়া দ্বিজনাথ তখনি যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন, কিন্তু শোভা কিছুতেই ছাড়িল না; বলিল, "দাদা বিনুদা নেই ব'লে আপনি যদি না বসেন তা হ'লে আমরা ভারি দুঃখিত হব। তা ছাড়া, ত্রিকূটে উঠেছিলেন, ক্লান্ত হয়েছেন, একটু চা-টা না খেয়ে যাওয়া হবে না।" তাহার পর শৈলজার উপর দ্বিজনাথের পরিচর্যার ভার দিয়া সে কমলাকে লইয়া আপনার ঘরে গিয়া বসিল।

"বিনুদার জন্যে মন কেমন করছে কমলা?"

শোভার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কমলা প্রথমটা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার পরই তাহার মাথায় বুদ্ধি যোগাইল; বলিল, "তোমার?"

প্রশ্নের পারম্পর্যের হিসাবে উত্তর যে প্রথমে কমলারই দেওয়ার কথা— এ কথা শোভার খেয়াল হইল না; একটু বিপন্ন হওয়ার মৃদু হাসি হাসিয়া সে বলিল, "আমার? তা একটু করছে বইকি। অমন মানুষ বাড়ি থেকে চ'লে গেলে কার না মন কেমন করে, বল? তোমার করে

না ?"। তাহার পর নিজের প্রশ্নের অযৌক্তিকতায় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কি যে বলছি! তোমার তো আরো বেশি করছে।"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "কেন, আমার আরো বেশি করছে কেন ?"

"তোমার সঙ্গে বিমুদার যে বিয়ে হবে।"

"বিয়ে হ'লেই বেশি মন কেমন করে ? আর বিয়ে না হ'লে করে না ?"

কমলার কথা শুনিয়া শোভার মুখ লাল হইয়া উঠিল ; বলিল, "তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল ভাই !"

কথোপকথনের মধ্যে কমলা এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছবিটা কি হ'ল শোভা ?"

"কোন্ ছবি ?"

"যে ছবিটা আঁকছিলেন ?"

কমলার এই প্রশ্নের মধ্যে একটা সরস রহস্যোপভোগের সুযোগ দেখিয়া পুলকিত হইয়া শোভা বলিল, "কে আঁকছিলেন না বললে বলব কেমন ক'রে ?"

শোভার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কমলার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিল, "বুঝতে পারছ না ?—তোমার বিমুদা।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শোভা বলিল, "বাপ রে! কি চালাক মেয়ে তুমি! তবু নিজের দিক দিয়ে কথাটা বললে না!"

হাস্যমুখে কমলা বলিল, "নিজের দিক দিয়ে কথাটা কি শুনি ? 'উনি', 'তিনি' ? তুমি হ'লে 'উনি' 'তিনি' বলতে ?"

আরক্তমুখে শোভা বলিল, "কখ্খনো না।"

"তবে আমি কেমন ক'রে বলব বল ?"

"তা সত্যি।" বলিয়া শোভা হাসিতে লাগিল।

তাহার পর ক্ষণকাল পরে শোভা বলিল, "বিমুদা যে তোমাকে কত

ভালবাসেন তা যদি তুমি জানতে কমলা! আমি আজ তার একটি প্রমাণ পেয়েছি, তুমি যদি কাউকে না বল তো তোমাকে দেখাই।"

কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া কমলাকে শোভার শর্তে স্বীকৃত হইতে হইল।

একটা ভাঁজ-করা ড্রয়িং-পেপার লইয়া আসিয়া কমলার হাতে দিয়া শোভা বলিল, "যে অন্যমনস্ক মানুষ বিনুদা, দাদার টাইম্-টেবিলের ভিতর রেখে ভুলে ফেলে গেছেন।"

কাগজটায় দৃষ্টিপাত করিয়া কমলার মুখ আরক্ত এবং চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমস্ত কাগজ ভরিয়া তুলি দিয়া তাহার নাম লেখা। কোনোটা লাল, কোনোটা নীল, কোনোটা সবুজ; কোনোটা লম্বা ছাঁদে, কোনোটা খর্বাকারে; কোনোটা মোটা হইতে সরু, কোনোটা বা সরু হইতে মোটা। যে মানুষ একদিন সংযমের তথ্য আর তত্ত্ব লইয়া কত কথা বলিয়াছিল, একান্ত অবসরকালে তুলির মুখ দিয়া এ কী তাহার উচ্ছ্বাস! অপরিসীম আনন্দে এবং পরিতৃপ্তিতে কমলার অন্তর সিক্ত হইয়া উঠিল। কাগজখানা ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে সে বলিল, "তোমার নামও তো রয়েছে শোভা।"

শোভা বলিল, "হ্যাঁ, তিন জায়গায়। তোমার নাম ক জায়গায় জান?"

"ক জায়গায়?"

"তেষট্টি জায়গায়।"

"গুনেছ?"

"গুনেছি।"

একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া তাহার পর কাগজখানা দেখিতে দেখিতে কমলা বলিল, "এটা আমাকে দেবে শোভা?"

শোভার মুখে একটা দ্বিধার ভাব ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "চাও ?"

"দিলে নিই।"

একটু ভাবিয়া শোভা বলিল, "তবে নাও।"

কিন্তু মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "না, কাজ নেই, তোমার কাছেই থাক্।"

যাইবার সময়ে কমলাকে এক পাশে টানিয়া লইয়া শোভা বলিল, "বিনুদার চিঠির খবর নিতে এসেছিলে, কিন্তু বিনুদার চিঠি তোমারই কাছে আগে আসবে। এলে দেখিয়ো ভাই।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

কমলা বলিল, "না, তোমারই কাছে আসবে। তুমি আমাকে দেখিয়ো।"

মাথা নাড়িয়া শোভা বলিল, "আমাকে আবার বিনুদা আলাদা চিঠি দেবেন কেন? দাদার চিঠিতে কিংবা তোমার চিঠিতে হয়তো একটু আশীর্বাদ জানাবেন। তুমি দেখো, কাল তাঁর চিঠি পাবে। কত আদর, কত যত্ন ক'রে কত কথা তোমাকে লিখবেন।"

শোভার কথা কিন্তু পরদিন প্রাতেই সত্য হইল। ডাক আসিল—তাহার মধ্যে বিনয়ের দুইখানি চিঠি, একখানি দ্বিজনাথের একখানি কমলার। কমলা তখন বাগানে একটা গাছতলায় চেয়ার লইয়া বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। জীবন আসিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া গেল। নীলাভ খাম, তাহার উপর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে কমলার নাম ও ঠিকানা লেখা। হস্তাক্ষর ঠিক পরিচিত নহে—কিন্তু টিকিটের উপর কলিকাতা আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট আফিসের ছাপ দেখিয়া একটা প্রত্যাশিত পুলকে মনটা নাচিয়া উঠিল। একবার কমলা বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল দ্বিজনাথকে সেখান হইতে দেখা যাইতেছে না। তাহার পর ধীরে ধীরে চিঠিখানা বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিতে

প্রথমেই চোখে পড়িল পত্রাগ্রভাগের সম্বোধন 'প্রিয়তমে'। সমস্ত অন্তরের যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, প্রত্যাশা এই চারটি অক্ষরের ব্যঞ্জনায় মধ্যে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া একটা অনির্বচনীয় ভাবাবেশে কমলার দেহকে অবশ করিয়া দিল। কিছুকাল গেল নিজের অপহৃত চেতনাকে ফিরিয়া পাইতে। পাতা উল্টাইয়া চিঠির নীচে দেখিল, লেখা রহিয়াছে 'তোমার প্রণয়গর্বিত বিনয়'। মনটা আবার মাদকতায় আচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়িয়া শেষ করিল। সুদীর্ঘ চিঠি—তাহার মধ্যে কত আকুলতা ব্যাকুলতা, কত উচ্ছ্বাস আদর! এক জায়গায় লেখা রহিয়াছে "আমার সমস্ত দেহ মন আত্মা তুমি অধিকার করেছ কমলা! অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সেই শুভদিনের প্রত্যাশায়, যে দিন বিবাহের শুভ অনুষ্ঠান এই গৃহহীনকে তার গৃহলক্ষ্মী দান করবে। তার পূর্বেই কমলার কমলাসনের ব্যবস্থা করবার চেষ্টায় আছি। বালিগঞ্জের দিকে একটি পরিচ্ছন্ন নূতন বাড়ি বিক্রয়ের জন্য আছে।—সেটির দর-দস্তর ঠিক ক'রে বায়না করবার চেষ্টা করছি।" আর এক স্থানে বিনয় লিখিয়াছে—"তোমার প্রতি আমার এই প্রেম শুধু আজকের নয়,—জন্ম-জন্মান্তর থেকে তুমি আমার আপনার—অনাগত অনন্ত ভবিষ্যতেও তুমি আমার একান্ত আপনার থাকবে।"

চিঠিখানা খামের ভিতর পুরিয়া হাতে লইয়া কমলা বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আকাশে বাতাসে কি যেন একটা অশ্রুতপূর্ব ছন্দের গুঞ্জন, লতাপাদপে অভিনব আনন্দের মর্মরধ্বনি, অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোক!

দুপুরবেলা ঘরের দোর বন্ধ করিয়া কমলা বিনয়ের চিঠির উত্তর লিখিল;—পত্রপাঠান্তে উত্তরের জন্য বিনয়ের ঐকান্তিক আবেদন ছিল। চিঠি লিখিতে বসিয়া অনেক কথা অনেক সম্বোধনই মনে আসিল, কিন্তু

বেথুন কলেজের থার্ড ইয়ার ক্লাসের এই শিক্ষিতা মেয়েটি অবশেষে চিঠি আরম্ভ করিল 'শ্রীচরণকমলেষু' লিখিয়া এবং শেষ করিল 'তোমার চরণাশ্রিতা কমলা' দিয়া। প্রণয়ের দুর্মদ কামনা আত্ম-সমর্পণের রিক্ততার মধ্যেই পরিতৃপ্তি লাভ করিল।

দিন চার-পাঁচ পরে দ্বিজনাথ যখন কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন সে বিষয়ে কমলার আপত্তি এমন আকার ধারণ করিল যে, সেই দিনই তিনি গাড়ি রিজার্ভ করিবার জন্য রেল কোম্পানিকে চিঠি লিখিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া বিনয় ক্যালকাটা হোটেলে তাহার নিজের রুমে উঠিয়াছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে তাহার ঘরটি সে ছাড়িয়া দিয়া যায় নাই, বরাবরই তাহার অধিকারে রাখিয়াছিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সেই দিনই সে আহারাদির পর অপরাহ্ণের দিকে কন্টিনেন্টাল হোটেলে তাহার পরিচিত বন্ধু ফরাসী আর্টিস্টের সহিত দেখা করে এবং বিশেষ অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা তাহাকে ক্যালকাটা হোটেলে নিজের রুমে লইয়া আসে। কয়েক দিন বিনয়ের অতিথি-রূপে ক্যালকাটা হোটেলে বাস করিয়া দিন পাঁচেক হইল সে দার্জিলিং গিয়াছে।

যে কয়েকদিন ঘরে অতিথি ছিল বিনয় তাহার ছবি আঁকার কাজে হাত দিতে পারে নাই, সে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে কয়েকদিন অবিরত ছবি আঁকিয়াছে, অন্য কোনো কাজ করে নাই, এমনি কি কমলার দ্বিতীয় পত্রের দুই দিন হইতে উত্তর দেওয়া পর্যন্ত পড়িয়া ছিল। আজ সমস্ত অপরাহ্ণ কমলাকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য বেশ পরিবর্তন করিতেছে, এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় তাহার ঘরের সম্মুখে পদশব্দ থামিল। হোটেলের ভৃত্য বাহির হইতে বলিল, "হুজুর, একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

"ঘরে আসেতে বল।"

পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া সেলাম করিল মহবুব—দ্বিজনাথের শোফার।

মহবুবকে দেখিয়া বিনয়ের চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। "কি মহবুব, কবে এলে তুমি ?"

"আজ সকালে হুজুর।"

"তুমি একা এসেছ, না, সকলেই এসেছেন ?"

"না হুজুর, সকলেই এসেছেন। নীচে গাড়িতে সাহেব আর দিদিমণি রয়েছেন।"

"চল, আমি এক্ষণি আসছি।" বলিয়া তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন সারিয়া লইয়া বিনয় নীচে নামিয়া আসিল।

হোটেলের দিকে দ্বিজনাথ বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার আড়ালে বসিয়া ছিল কমলা। তথাপি দ্বিজনাথের উৎফুল্ল দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া বিনয়ের দৃষ্টি প্রথমেই নিমেষের জন্য পড়িল কমলার দৃষ্টির উপর। কমলা চক্ষু নত করিল, বিনয় তাড়াতাড়ি গাড়ির পাশে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দ্বিজনাথের পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "আপনারা এত শিগগির চ'লে এলেন যে ? আরো মাসখানেক থাকবার কথা ছিল তো!"

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমি হঠাৎ চ'লে এলে, তারপর আমাদের আর কেমন ভাল লাগল না, তাই চ'লে এলাম। তা ছাড়া, এবার হঠাৎ কোন্‌দিন কমলার মার সীলোন্ থেকে রওনা হবার তার এসে পড়বে—তার আগে চ'লে আসাই ভাল।"

বিনয় বলিল, "তা ভালই করেছেন। চলুন, আমার ঘরে গিয়ে একটু বসবেন চলুন।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা না হয় চল একটু বসছি, কিন্তু আমরা কেন এসেছি জান ?—তোমাকে নিয়ে যেতে। এখন থেকে তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে।"

বারম্বার দ্বিজনাথের বহুবচনের ব্যবহারে কমলা বিব্রত হইয়া উঠিল।

বিনয় চলিয়া আসিলে জশিডি তাহারও ভাল লাগিত না—এ হয়তো সত্য কথা, এবং বিনয়কে তাহাদের বাড়ি লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহারও ইচ্ছা আছে—সে কথাও হয়তো মিথ্যা নয়; কিন্তু তাই বলিয়া সে কথাগুলা এভাবে বিনয়ের কানে উঠে কেন?

বিনয় কিন্তু তখন ঠিক সে কথাই ভাবিতেছিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল, 'চলুন, ওপরে গিয়ে সব কথা হবে।"

"চল।" বলিয়া দ্বিজনাথ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কমল, এস।"

কমলা বলিল, "আমি গাড়িতেই থাকি না বাবা!"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "গাড়িতে থাকবে কি? তা হ'লে তো বাড়িতেও থাকতে পারতে। এস, নেমে এস।"

এ কথাতেও কমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, যেন সে নিজেরই চেষ্টায় এবং আগ্রহে বাড়ি হইতে আসিয়াছে; অথচ ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত, দ্বিজনাথের সহিত বিনয়ের হোটেলে আসিতে সে বিশেষভাবে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দ্বিজনাথ তাহার সে আপত্তি শুনেন নাই।

কমলার সলজ্জ দ্বিধা দেখিয়া বিনয় মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; বলিল, "ওপরে যেতে আপত্তির কি থাকতে পারে?"

কমলা আর কোনো কথা না বলিয়া নামিয়া পড়িল।

বিনয়ের ঘরে প্রবেশ করিলে বিনয় দুইখানি চেয়ার দ্বিজনাথ ও কমলার জন্য আগাইয়া দিল, তাহার পর নিজে একখানি টানিয়া লইয়া বসিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার ঘরখানি তো বেশ সুন্দর বিনয়!"

হাসিমুখে বিনয় বলিল, "ঘরখানি নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু ঘরের অবস্থা শোচনায়।" বলিয়া কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

কমলার মুখে সম্মতির নীরব হাস্য ফুটিয়া উঠিল; সে ভাল করিয়া ঘরখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এক কোণে ইজেলের উপর একটি অর্ধসমাপ্ত পুরুষের চিত্র—বাঙালীর নয়, সম্ভবত কোনো ইংরাজের। পাশের টেবিলের উপর রঙ, তুলি প্রভৃতি এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরের আর এক কোণে কাঠের আনলা, তাহাতে বিলাতী স্যুট এবং দেশী ধুতি ঘাড়াঘাড়ি করিয়া রাখা। তাহার পর কমলার দৃষ্টি পড়িল তাহার বাঁ দিকে লিখিবার টেবিলের উপর,—একরাশ বই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, প্রয়োজনকালে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে কিন্তু প্রয়োজনান্তে আর তাহাদের কথা মনে পড়ে নাই; একটা খোলা ফাউণ্টেন্-পেন, তাহার নিকটেই একটা নীলাভ খাম, উপরে বাংলায় লেখা শ্রীমতী কমলা দেবী, তাহার নীচে ইংরাজীতে জশিডির ঠিকানা। দেখিয়া কমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল, আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া লুকাইয়া ফেলে; কিন্তু পাছে দ্বিজনাথ দেখিয়া ফেলেন সেই ভয়ে তাহা না করিয়া টেবিল হইতে একখানা বই তুলিয়া লইয়া দুই-চারবার পাতা উল্টাইয়া সেটা চিঠিটার উপর স্থাপিত করিল,—চিঠি অদৃশ্য হইল।

কাজটা করিয়াই সে অপরাধীর মতো তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিল, কেহ দেখিয়াছে কি-না! দেখিল, বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মুখে তাহার কৌতুকের নীরব হাস্য। ধরা পড়িয়া গিয়া কমলারও মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "ভুল করলে কমল, বইখানা তুলে সরিয়ে রাখ। চিঠিটা বোধ হয় পোস্ট করতে হবে, চাপা প'ড়ে গেল।"

কি বিপদ! দ্বিজনাথেরও দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই! আরক্তমুখে কমলা তাড়াতাড়ি বইখানা তুলিয়া লইয়া সরাইয়া রাখিল। পূর্বে না

পড়িলেও এবার পাছে দ্বিজনাথ চিঠির উপর তাহার নাম পড়িয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ঘটনার কৌতুকাবহতায় বিনয় অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, এবং চিঠিটা দ্বিজনাথের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী করিবার জন্য কমলা একটু নড়িয়া চড়িয়া সরিয়া বসিল। কিন্তু দ্বিজনাথের সেদিকে আর কোনো চেষ্টা অথবা আগ্রহ ছিল না; তিনি তাঁহার প্রস্তাব পুনর্বার তুলিয়া বলিলেন, "আমি আমার সরকার সতীশকে সঙ্গে এনেছি—খুব সাবধানী আর বিশ্বাসী লোক। সে তোমার সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে প্যাক ক'রে একটা লরিতে নিয়ে যাবে—তোমার কিছুই দেখতে শুনতে হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

বিনয় বলিল, "এখন কিছুদিন এখান থেকে গেলে আমার কাজ-কর্মের একটু অসুবিধা হবে। বন্ধু বান্ধব কাস্টমার সকলেই এখানে সর্বদা আসছেন।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "এখন থেকে তাঁরা সেখানে যাবেন। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে তোমার একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা অতি সহজেই হ'তে পারবে—আর এখানে আমাদের বাড়ির ঠিকানা রেখে দিলেই চলবে।"

বিনয় কিন্তু সেই দিনই যাইতে কিছুতেই রাজী হইল না; বলিল, "এখন কিছুদিন যাক—পরে গেলেই হবে।"

খানসামা একটা বড় ট্রে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম এবং খাবার লইয়া আসিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আবার এ-সব হাঙ্গামা কেন করলে? আমরা তো চা খেয়েই বেরিয়েছি। তা ছাড়া, চা আমার পক্ষে বেশি খাওয়া ভাল নয়।"

যত্নাশ্রিত কণ্ঠে পরম আগ্রহের সহিত বিনয় বলিল, "তা হ'লে একটা শরবৎ আনিয়ে দোব বাবা?—লাইমজুস্ কর্ডিয়াল কিংবা লেমন স্কোয়াশ?"

অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় দ্বিজনাথ মনে মনে একটু অভিমানপীড়িত হইয়াছিলেন, বিনয়ের এই আত্মীয়তার সম্বোধনে সে অভিমানটুকু নিমেষে অন্তর্হিত হইল, তাহার আতিথ্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে প্রবৃত্তি হইল না; বলিলেন, "বরং তা না হয় একটা আনাও।"

বিনয়ের আদেশ পাইয়া খানসামা ছুটিল।

চা খাওয়া হইয়া গেলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজ নিতান্ত বাসা তুলে না যাও, আজ আমাদের সঙ্গে চল, খাওয়া-দাওয়া ক'রে আসবে।"

এ প্রস্তাবে বিনয়ের আপত্তি ছিল না—সে উঠিয়া টেবিল হইতে কমলাকে লিখিত চিঠিখানা লইয়া পকেটে পুরিল, তাহার পর একটা ছড়ি লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে দ্বিজনাথ যাইতেছিলেন সর্বাগ্রে, তাঁহার পশ্চাতে যাইতেছিল কমলা এবং তৎপশ্চাতে বিনয়। সুযোগ বুঝিয়া বিনয় চিঠিখানা কমলার দক্ষিণ হস্তে ঢুকাইয়া দিল। আপত্তি করিলে পাছে দ্বিজনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেই ভয়ে কমলা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া বস্ত্রান্তরালে লুকাইয়া ফেলিল। চিঠিটার উপর তাহার লোভ এবং আগ্রহও অল্প ছিল না।

গাড়িতে উঠিয়া দ্বিজনাথ শোফারকে বলিলেন, "সারকুলার রোড দিয়ে বাড়ি চল।" তাহার পর শিয়ালদহ পোস্ট অফিসের নিকট গাড়ি উপস্থিত হইলে বলিলেন, "বাঁয়ে একটু রাখ।" গাড়ি থামিলে বলিলেন, "সতীশ, একটা চিঠি ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে এস।" বলিয়া বিনয়ের

দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার চিঠিটা দাও বিনয়, পোস্ট ক'রে দিয়ে আসুক।"

বিনয়ের চক্ষু স্থির হইল। চিঠি কমলার নিকট, এবং কমলা দ্বিজনাথের অপর পার্শ্বে। সেখান হইতে অলক্ষিতে চিঠি লইবার কোনো উপায় নাই। একটু ইতস্তত করিয়া একবার অকারণ পকেটে হাত পুরিয়া বিনয় বলিল, "থাক্, তাড়াতাড়ি নেই।"

"না হে, আমি ভুক্তভোগী—চিঠি পকেটে বেশিক্ষণ রাখতে নেই, তা হ'লে নজরে পড়বে একেবারে কাপড় কাচতে দেবার দিন। এইটুকু রাস্তা পার হ'য়ে দিয়ে আসবে, তাতে আর কষ্টটা কি?"

সম্মুখের সীট হইতে সতীশ নামিয়া পড়িয়া বিনয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, "দিন না, আমি ফেলে দিয়ে আসি।"

কিছুক্ষণ পূর্বে এই চিঠি লইয়া কমলার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া বিনয় মুখ ফিরাইয়া হাসিয়াছিল তাহা কমলা দেখিয়াছিল, এখন সেই চিঠি লইয়াই বিনয়ের অধিকতর বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল। সে পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রহিল।

বিনয় বলিল, "আপনি উঠে পড়ুন সতীশবাবু, চিঠিটা একটু ইয়ে আছে—"

চিঠিখানার উপর কমলার বই চাপা দেওয়া স্মরণ করিয়া সহসা দ্বিজনাথের খেয়াল হইল যে, চিঠিখানায় হয়তো কোনো রহস্য জড়িত আছে; বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্—বাড়ি চল।" গাড়ি চলিল।

বালিগঞ্জে দ্বিজনাথের বৃহৎ অট্টালিকা—চতুর্দিকে কম্পাউণ্ড—কেয়ারী-করা ফুলের গাছ—পিছন দিকে পুষ্করিণী।

দ্বিতলে উঠিয়া দ্বিজনাথ বিনয়কে তাহার বাসের জন্য যে ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন দেখাইলেন। একটা শয়নকক্ষ, একটা বসিবার ঘর, একটা ড্রেসিং-রুম,—তা ছাড়া স্বতন্ত্র বাথ-রুম। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্রের কোথাও কোনো অভাব নাই।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "দিন দুই হ'ল সতীশকে লিখেছিলাম, সে সব ক'রে রেখেছে। এর মধ্যে একটি জিনিসও ব্যবহার করা নয়—সব নতুন।"

জিনিস বড় কম নয়—খাট পালং, চেয়ার টেবিল, আলমারি ড্রেসিং টেবিল হইতে আরম্ভ করিয়া পর্দা ধুতি বিছানাপত্র তোয়ালে রুমাল পর্যন্ত সমস্ত।

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "দু দিনে এই সমস্ত করেছেন?—খুব কাজের লোক তো।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, তা খুব।"

কমলাকে একান্তে পাইয়া বিনয় বলিল, "কমলা, চিঠি পোস্ট করা নিয়ে কি বিপদেই পড়া গিয়েছিল! তুমি কিন্তু খুব যা হোক! আমার বিপদ দেখে মুখ ফিরিয়ে হাসছিলে!"

সহাস্যে কমলা বলিল, "আর আমাকে যখন বাবা বই তুলতে বলেছিলেন, তখন তুমি মুখ ফিরিয়ে কি করছিলে—শুনি?"

বিনয় বলিল, "সত্যি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে এমন হাতে হাতে করতে হবে তা কে জানত? চিঠিটা পড়েছ?"

কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "পড়েছি।"

"উত্তর চাই কিন্তু।"

বিনয়ের দক্ষিণ হাতখানা নিজ হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া কমলা বলিল, "আমাদের বাড়ি থাকতে রাজী হ'লে না কেন?"

"এখনো বর হলুম না—এরই মধ্যে ঘর-জামাই করতে চাও না-কি?"

"সেই জন্যে ?"

কমলার মুখের ভাব দেখিয়া বিনয় হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, "একটুও সে জন্যে নয়। কমলাকে হাতের মধ্যে পাবার আগে মনের মধ্যে কিছুদিন পেতে চাই। মনে মনে তপস্যা ক'রে তোমাকে পেতে চাই কমলা।"

আনন্দে কমলা মুখ নত করিল।

রাত এগারটায় মোটর করিয়া বিনয় ক্যালকাটা হোটেলে ফিরিল

৩৮

দিন পনেরো পরে বেলা দশটা আন্দাজ বিনয় তাহার ঘরে ব'সিয়া নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের নিকট কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "বিনয় আছ ?"

"আছি, আসুন।" বলিয়া তুলি রাখিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন দ্বিজনাথ, মুখে সানন্দ উত্তেজনার দীপ্তি।

"শুনেছ বিনয় ?"

বিনয় বলিল, "না।"

অসঙ্গত প্রশ্ন,—কারণ, শুনিবার পূর্বে কোনো কথা শুনা সম্ভব নহে। পকেট হইতে একখানা টেলিগ্রামের খাম বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "প'ড়ে দেখ।"

টেলিগ্রামখানা খুলিয়া বিনয় পড়িল, Arriving Howrah Wednesday Madras Mail with mejdidi. Rest break journey Cuttack—Sudhansu.

টেলিগ্রামখানা দ্বিজনাথের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বিনয় বলিল, "মা আসছেন কাল ?"

"কাল।"

"কটার সময় ম্যাড্রাস্ মেল হাওড়ায় পৌছয় ?"

"সকাল দশটা চল্লিশ মিনিট স্ট্যান্ডার্ড টাইম, ক্যাল্‌কাটা টাইম এগারটা চার।"

প্রৌঢ় বিরহীর আকৃতি ও আচরণে আসন্ন মিলনের সুস্পষ্ট হর্ষোচ্ছ্বাস

লক্ষ্য করিয়া বিনয় খুশি হইল। ম্যাড্রাস্ মেলের সময় বলিতে গিয়া চব্বিশের হিসাবের দ্বারা বিড়ম্বিত অনর্থক দুই রকমের সময় বলা যে সেই দুর্দম্য পুলকেরই প্রকাশ তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। যে প্রেম তাহার নিজের অন্তরে মহিমময় আসন অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছিল, অপরের মধ্যে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি তাহার মনে সুমিষ্ট শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিল। উৎফুল্লমুখে বিনয় বলিল, "সুসংবাদ।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সুসংবাদ তো বটে, কিন্তু তোমাকে এখনি যেতে হবে বিনয়,—সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে।"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "এখন আমার তাড়াতাড়ি গিয়ে কি হবে,—কাল মাকে রিসিভ করবার জন্যে ঠিক সময়ে স্টেশনে উপস্থিত হব।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া নিমেষের মধ্যে দ্বিজনাথের মুখ হইতে সমস্ত উৎসাহের চিহ্ন অপসৃত হইল। বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বিমলার আসবার খবর পাওয়ার পরও যে তুমি এমন ক'রে আপত্তি করবে তা আমি একবারও মনে ভাবি নি বিনয়। তোমার এ রকম অনাত্মীয় আচরণে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হচ্ছি।"

দ্বিজনাথের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিনয়ের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, যদিও বিমলাব আগমন-সংবাদের সহিত দ্বিজনাথের গৃহে তাহার যাওয়ার অতিক্রমণীয় যুক্তি কোথায়, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। শেষ পর্যন্ত পরাভূত তাহাকেই হইতে হইবে দ্বিজনাথের আচরণের সূচনা হইতে অনুমান করিয়া বিনয় আর বেশি আপত্তি করিল না। বলিল, "তা হ'লে জিনিসগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে ও-বেলা গেলেই হবে।"

দ্বিজনাথের মুখমণ্ডল হইতে অসন্তোষের মেঘ অপসৃত হইল। প্রসন্ন-মুখে বলিলেন, "গুছোনো-গাছানো তো সেখানে। এখান থেকে

জিনিসগুলো কেবল যত্ন ক'রে নিয়ে যাওয়া,—সে জন্যে সতীশকে নিয়ে এসেছি।"

কোনো দিক দিয়াই কোনো উপায় নাই বুঝিয়া বিনয় টেবিলের উপর তাহার টাইমপীসের প্রতি হতাশভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দশটা প্রায় বাজে, তা হ'লে না হয়—"

বিনয়কে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার খাবার এখানে তৈরি হচ্ছে সেই কথা বলছ তো? দেশে দরিদ্র লোকের অভাব নেই—তোমার খাবারটি আজ পথের কোনো ক্ষুধিত ভিখারীকে দেবার ব্যবস্থা ক'রে যাও—পুণ্য হবে। এখন শিগগির চল, অনেক পরামর্শ আছে।"

দ্বিজনাথের আহ্বানে সতীশ আসিয়া জিনিসপত্র বাঁধা-বাঁধির কার্যে লাগিয়া গেল। বিশেষ দরকারী কয়েকটি জিনিস নিজে তাড়াতাড়ি সুটকেস্ ও ট্রাঙ্কে ভরিয়া লইয়া চাবি দিয়া বিনয় হোটেল-ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার সমস্ত দেয় চুকাইয়া দিল।

বিনয়ের মতো একজন ভদ্র এবং নির্বিবাদ বোর্ডারকে হারাইয়া ম্যানেজারের মন প্রসন্ন ছিল না। তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "মিস্টার রায়, আপনি আপনার আত্মীয়ের বাড়ি উঠে যাচ্ছেন তাতে আমার আর বলবার কি আছে! কিন্তু যদি কখনো কলকাতায় কোনো হোটেলের আশ্রয় নেবার দরকার হয়, তা হ'লে ক্যালকাটা হোটেলকে ভুলবেন না—এই আমার অনুরোধ রইল।"

বিনয় বলিল, "সে 'কখনো' শীঘ্র হবে কি-না বা কখনো হবে কি-না তা বলতে পারি নে, কিন্তু যদি কখনো হয় তা হ'লে ক্যালকাটা হোটেলকে ভোলবার কোনো কারণ হবে না—এ আপনাকে কথা দিয়ে গেলুম।"

যাহারা তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য হোটেলে আসিবে তাহাদের

জন্য নূতন ঠিকানা ম্যানেজারকে লিখাইয়া দিয়া বিনয় প্রসন্ন-লঘু চিত্তে দ্বিজনাথের সহিত মোটরে আসিয়া বসিল। বিমলার আগমনের সংবাদের সহিত যে শুভদিনের আগমনের কথা একত্র জড়িত তাহা মনে করিয়া হিল্লোলিত আনন্দে তাহার মনখানি দুলিতেছিল।

গৃহে পৌঁছিয়া বিনয় দেখিল, বিমলার জন্য যত না হউক, তাহারই অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত বাড়িতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ব্যবহারের ঘরগুলি পরিচ্ছন্ন ভাবে ধোয়া-পোঁছা হইয়াছে, বসিবার ঘরে টেবিলের উপর ফুলদানিতে সদ্য-সঞ্চিত ফুলের গুচ্ছ, দেওয়ালের গাত্রে উচ্চে তাহার আঁকা কমলার ছবিখানা বাঁধাইয়া এমন স্থানে টাঙানো হইয়াছে যে চেয়ারে বসিলে ঠিক সামনে পড়ে, ড্রেসিং-রুমে নূতন কাপড়-চোপড়, শয়নকক্ষে নূতন শয্যা। খানসামা-ব্রাহ্মণের ব্যস্ততা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, বাবুর্চিখানা এবং রসুই-ঘর উভয় স্থানে আজ একটু আয়োজনের পালা পড়িয়াছে।

সমস্ত দিন ধরিয়া বিস্তর গল্প-গুজব কথাবার্তা হইল, কিন্তু যে পরামর্শ করিবার অজুহাতে দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার সন্ধান তন্মধ্যে বিনয় খুঁজিয়া পাইল না। পরামর্শ করিবার কথাটা যে কেবল ছলনা তাহা সেই সময়েই বিনয় বুঝিয়াছিল—তাই তাহারও সে বিষয়ে কোনো ব্যস্ততা ছিল না।

সন্ধ্যার পর মোটর করিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া দ্বিজনাথ, বিনয় ও কমলা বিনয়ের বসিবার ঘরে বসিল। ঘরের এক কোণে একটা ফুলদানিতে মালী একঝাড় কামিনী ফুল রাখিয়া গিয়াছিল—তাহার মৃদু সৌরভে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া ছিল।

দশ-পনেরো মিনিট কথাবার্তার পর কমলা বলিল, "বাবা, আমি তা হ'লে এখন উঠি। খাবার ব্যবস্থা কি করছে না-করছে একটু গিয়ে দেখি।"

দ্বিজনাথ বুঝিলেন, খাবার ব্যবস্থার কথা কোনো কথাই নহে—এ শুধু সঙ্কোচ হইতে কমলার পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা। বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি না হয় একটু পরে যেয়ো—বিনয়ের সঙ্গে ততক্ষণ একটু কথাবার্তা কর—আমি দশ পনেরো মিনিটে ঘুরে আসছি।" বলিয়া নিজ কক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিজনাথ চলিয়া গেলে সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "পুরুষের ভাগ্য বড় প্রবল জিনিস কমলা। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হ'তে আরম্ভ করে তখন তাকে ব্যাঘাত দিতে কেউ পারে না।"

কৌতূহল সহকারে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"তুমি পালাবার চেষ্টা করছিলে, ফলে তোমাকে পেলাম আরো বেশি ক'রে।"

এ কথার কোনো উত্তর কমলার মুখে আসিল না, সে মৃদু হাসিয়া একবার বিনয়ের দিকে চাহিল।

বিনয় বলিল, "অথচ এ সৌভাগ্যকে আমার সব সময়ে ঠিক বিশ্বাস হয় না। একদিন হঠাৎ ছবি আঁকবার চেষ্টায় তোমাদের বাড়ি গেলাম। তোমাকে দেখে মনে হ'ল, আমার অন্তরের মানসী-মূর্তির রূপ ধারণ ক'রে তুমি এসে দাঁড়ালে। তোমারই ছবি আঁকবার আদেশ পেলাম। তারপর তোমার ছবি আঁকতে আঁকতে ধীরে ধীরে তোমাকে অধিকার করলাম। আর মাসখানেক পরে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী হবে কমলা,—এ যেন মনে হয় সত্যি নয়। ভয় হয়, কোন্ দিন ঘুম ভেঙে দেখব এতদিন যা দেখেছি সব স্বপ্ন! এ তো সৌভাগ্য নয়, এ সৌভাগ্যের বাড়া জিনিস—তাই ধারণা করতে মনে সাহস হয় না।"

বিনয়ের সুগভীর প্রণয়-নিবেদনে সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্ করিতে লাগিল। আনন্দে, আশঙ্কায়, উত্তেজনায়, কমলার চোখ ভরিয়া জল আসিল।

বিনয়ের অলক্ষিতে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সে মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "অত ভয় ক'রো না—এমন-কিছু জিনিস পাও নি।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "ভয় আমি করি নে কমলা, কারণ জীবনের পাথেয় আমি সংগ্রহ করেছি—আর বেশি কিছু না জুটলেও তাই ভাঙিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। ভয় হয় তোমার জন্যে। মনে মনে কি ঠিক করেছি জান?"

সভয়ে কমলা বলিল, "কি?"

বসিবার ঘরের আলোকে পাশের শয়নকক্ষের আসবাব-পত্র অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে হাত দেখাইয়া বিনয় বলিল, "পাশের ঘরে তোমরা আমার শোবার ব্যবস্থা করেছ,—কিন্তু যতদিন না ও-ঘরে তোমাকে গ্রহণ করবার অধিকার পাচ্ছি ততদিন ও-ঘরে আমি শোব না।"

"কেন?"

"ও-ঘরের খাট একজনের চেয়ে ঢের চওড়া, ও-ঘরের বিছানা একজনের চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি। তোমার কথা ভেবে নিয়ে ও-ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তোমার অভাবে ও-ঘর অসম্পূর্ণ। যতদিন তুমি ও-ঘরে প্রবেশ করবার অধিকার না পাচ্ছ, ততদিন আমি ও-ঘরে শুচ্ছি নে।"

সবিস্ময়ে কমলা বলিল, "তবে কোথায় শোবে?"

বসিবার ঘরে দেওয়ালের পাশে বিশ্রামের জন্য একটা সোফা ছিল, সেইটা হাত দিয়া দেখাইয়া বিনয় বলিল, "ওই সোফায় শুয়ে তোমার ছবি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ব,—তারপর ঘুম ভেঙে দেখব তোমার ছবি।"

আরক্ত মুখে কমলা বলিল, "কি খেয়াল গো তোমার!"

মৃদু হাস্যের সহিত বিনয় বলিল, "কেন, মন্দ খেয়াল কি? এতদিন

তোমাকে মনের মধ্যে পেয়েছিলাম—এবার কিছুদিন ছবির মধ্যে পাব, তারপর পাব সংসারের পদ্মাসনে কমলার রূপে।” বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, “খুব কাব্য ক’রে কথাগুলো বলছি, না?”

কমলা কিছু বলিল না - শুধু তাহার মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার অর্থ—একটু বলছ বটে।

বিনয় বলিল, “আমার আর একটা খেয়ালের কথা শুনবে কমলা?”

কমলা বলিল, “বল, শুনি।” কিন্তু বলিবার সময় হইল না—দূরে দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

আহারের পর বারান্দায় একটু বসিয়া ঘরে আসিয়া বিনয় দেখিল, বসিবার ঘরে সোফার উপর একটি পরিচ্ছন্ন চাদর পাতা, তাহার এক প্রান্তে একটি ধপধপে মাথার বালিশ। কোন্ ফাঁকে কমলা আসিয়া এইটুকু যত্নের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহার অন্তর একটি স্নিগ্ধ আনন্দের রসে ভরিয়া উঠিল। কমলার ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বিনয়ের চক্ষু যখন তন্দ্রালসে মুদিয়া আসিল, রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সুইচ টিপিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

৩৯

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিনয় দেখিল, তাহারই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, গৃহের আর সকলেই উঠিয়াছে। চোখ খুলিয়া প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল কমলার ছবির উপর। প্রত্যূষের অনুগ্র আলোকে ছবিখানি বিষণ্ণ শোভায় অপূর্ব দেখাইতেছিল। ক্ষণকাল সবিস্ময় পুলকে নিজের সৃষ্টির দিকে অপলক নেত্রে সে চাহিয়া রহিল, তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বেলা তখন সাড়ে ছয়টার বেশি হইবে না। কিন্তু দ্বিজনাথের ব্যস্ততা দেখিয়া মনে হইতেছিল, ম্যাড্রাস্ মেল হাওড়া স্টেশনে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। দুই রকম সময়ের কোনোটাই বিনয়ের ঠিক মনে ছিল না। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, এখনো যে তাহার অন্তত ঘণ্টা চারেক বিলম্ব আছে এ আন্দাজ তাহার মনে মনে ছিল। নীচে দ্বিজনাথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, গাড়িতে পেট্রোল কয় গ্যালন্ আছে এবং মোবিল অয়েল ইতিপূর্বে কবে দেওয়া হইয়াছে মহবুবের সহিত তাহারই আলোচনা চলিতেছিল।

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিতেই বিনয়ের দেখা হইল কমলার সহিত একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া সে একখানা চকচকে বাঁধানো বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল—সম্ভবত বিনয়েরই প্রত্যাশায়। বিনয়কে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলা একটু হাসিল, তাহার পর পিছন দিকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, “রাত্রে ঘুম হয়েছিল?”

বিনয় বলিল, “হয়েছিল বইকি।”

"ঘাড়ে ব্যথা হয় নি তো?"

"কেন?"

"এক পাশে শুয়ে?"

কমলার প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু বুঝিতে পারিয়া বিনয় হাসিয়া বলিল, "আমি যে বরাবর ডান পাশেই শুয়ে ছিলাম, মাথার বালিশ উল্টো দিকে ক'রে নিয়ে বাঁ পাশে শুই নি তা কে বললে?"

মাথার বালিশ অপর দিকে করিয়া শুইলে তাহার ছবির হিসাবে বিনয়ের চক্ষু কোন্ দিকে পড়ে মনে মনে তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "উঃ, কি চালাক লোক তুমি! কোনো রকমেই তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই!"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "না, ডান পাশেও না, বাঁ পাশেও না। বালিশ উল্টে যে মানুষ পাশ ফেরে তার সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।"

"সত্যি।" বলিয়া কমলা হাসিতে লাগিল।

সিঁড়িতে দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। "চললুম" বলিয়া কমলা পাশের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলার পরিত্যক্ত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিনয় দেখিল, সেখানি হুইটম্যানের একটি কাব্যগ্রন্থ।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয়কে দেখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "এই যে বিনয়, কখন উঠলে? রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো? কোনো অসুবিধা হয় নি?"

এতগুলি প্রশ্নের মধ্যে বিনয় শেষ প্রশ্নটির উত্তর দিল; বলিল, "না, হয় নি।"

"মুখ ধুয়েছ?"

"না।"

"যাও, শিগগির সেরে এস—চা এসে পড়ল ব'লে। তোমার

বাথ-রুমে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। স্টেশনে যেতে হবে মনে আছে তো?—খুব বেশি সময় নেই।"

কোনো প্রকারে হাস্য দমন করিয়া বিনয় বলিল, "তবু এখনো ঘণ্টা চারেক সময় আছে বাবা।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাতের রিস্ট ওয়াচ দেখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "ক্যালকাটা টাইম্ এগারোটা চার মিনিট—চার ঘণ্টা ঠিক নেই, তবে ঘণ্টা তিনেক আছে বটে। সে সময়টুকু এই সবেতেই খেয়ে যাবে।"

চা খাওয়া ছাড়া আর এমন কি-সব থাকিতে পারে যাহাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিবে তাহা কিছুতেই অনুমান করিতে না পারিয়া বিনয় প্রফুল্ল মনে প্রস্থান করিল।

সাড়ে নয়টার সময়ে গাড়ি-বারান্দায় মোটর আসিয়া লাগিল। দ্বিজনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "একটু সময় হাতে রেখে যাওয়া ভাল, আপিস টাইম—মোড়ে মোড়ে আটকাবে, তা ছাড়া হাওড়ার পোলে ট্র্যাফিক জ্যাম প্রায়ই থাকে।"

"চলুন।" বলিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ির নিকটে আসিয়া দ্বিজনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, কমলা কই? কমল! কমল!"

কমলা নিকটেই ছিল, সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমি স্টেশনে যাব না বাবা,—আমি মার জন্যে বাড়িতেই অপেক্ষা করব।"

উদ্বিগ্ন মুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে কি! তোমাকে স্টেশনে না দেখতে পেলে তোমার মা যে ভারি দুঃখিত হবেন।"

কমলা বলিল, "স্টেশন থেকে বাড়ি আর কতটুকু সময়ের কথা বাবা? তা ছাড়া, পদ্মঠাকুমা পর্যন্ত নেই, বাড়িতে মাকে একজন তো বরণ করা চাই!"

কমলার কথা শুনিয়া দ্বিজনাথ হাসিলেন ; বলিলেন, "ও-সব কোনো কাজের কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে—। যাক্, এর মীমাংসা করতে গেলে এখন আর চলবে না। তা হ'লে আমরা দুজনেই চলি।"

'আসল কথা'র অর্থে দ্বিজনাথ যে কি বলিতে যাইতেছিলেন তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না। বিনয় হাসিয়া বলিল, "আমি না হয় বাড়ি থাকি বাবা, মাকে এখানে রিসীভ করবার জন্যে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমিও বাড়িতে থাকবে ?"

অপ্রতিভ হইয়া বিনয় বলিল, "আমিও নয়—আমি একা।"

মাথা নাড়িয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "না, তা হয় না, তোমার যাওয়া চাই-ই।"

স্টেশনে পৌঁছিয়া দ্বিজনাথ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—সময় আর কাটিতে চায় না। তখনো ট্রেনের প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি। খানিক গল্প করিয়া, খানিক পায়চারি করিয়া, খানিকক্ষণ খবরের কাগজ পড়িয়া অতিকষ্টে কোনো প্রকারে সময়টা কাটিল,—অদূরে দেখা গেল সরীসৃপ-গতিতে ম্যাড্রাস মেল প্ল্যাটফর্মের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

বিমলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিলেন,—তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দ্বিজনাথ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "বিমলা !"

দ্বিজনাথকে দেখিতে পাইয়া বিমলার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, কিন্তু আনন্দে মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গাড়ি খানিকটা আগাইয়া গিয়া থামিল। বিনয় ও দ্বিজনাথ দ্রুতপদে যখন বিমলার কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বিমলা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িয়াছেন।

বিমলার পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "মা, আমি বিনয়।"

প্রসন্ন মুখে বিনয়ের মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বিমলা বলিলেন, "তা আমি বুঝতে পেরেছি। বেঁচে থাকে বাবা।"

স্বামীর আগ্রহে এবং যুক্তিতর্কের অনুরোধে বিনয়ের সহিত কমলার বিবাহ-প্রস্তাবে বিমলা সম্মতি দিয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এ ব্যাপার তাঁহার ঠিক মনঃপূত ছিল না। কমলার বিবাহ স্থির ছিল সন্তোষের সহিত —সন্তোষ কলিকাতার বনেদী-বংশের ছেলে, বিলাত হইতে বি.এ. এবং ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিয়াছে, কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতেছে, দেখিতে সুপুরুষ, স্বভাবে চরিত্রবান, অমায়িক; হঠাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক অজ্ঞাত-কুলশীল চিত্রকর—ভারতবর্ষের মতো দেশে তার এমনই কি উপার্জন এবং সম্ভ্রম প্রত্যাশা করা যাইতে পারে—তাহার সহিত বিবাহের স্থিরতা অবিবেচনা-প্রসূত বলিয়া বিমলার মনে হইয়াছিল। যশিডিতে তিনি উপস্থিত থাকিলে ছবি আঁকার মধ্য দিয়া এমন একটা বিপর্যয় ঘটিবার সুবিধা পাইত না, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিষয়জ্ঞানবর্জিত স্বামী এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা কন্যা পরস্পরের সহায়তায় এই অবস্থাটি ঘটাইয়াছে মনে করিয়া বিমলার মনে উভয়েরই প্রতি সবিরক্তি অভিমান ছিল। কিন্তু বিনয়ের সৌম্য সুন্দর মূর্তি দেখিয়া বিমলা প্রসন্ন হইলেন, ফুলের রূপ দেখিয়া ফলের রসের বিষয়ে আস্থা জন্মাইল।

বিমলার সম্মতির মধ্যে যে অসম্মতির অতি ক্ষীণ মালিন্য মিশ্রিত ছিল তাহা দ্বিজনাথ বিমলার চিঠিগুলি হইতে বুঝিতে পারিতেন। তাই প্রথম দর্শনে বিমলা বিনয়কে কি ভাবে গ্রহণ করেন তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে আগ্রহের অন্ত ছিল না,—বিমলার আচরণে অনেকটা সাহস পাইয়া দ্বিজনাথ নিম্নকণ্ঠে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? পছন্দ হয়েছে তো?"

বিমলা মুখে কোনো উত্তর না দিয়া ভ্রূভঙ্গের দ্বারা উপস্থিত এ প্রসঙ্গ হইতে স্বামীকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিনয় দ্বিজনাথের প্রশ্নও শুনিয়াছিল এবং বিমলার অনুত্তরও লক্ষ্য করিয়াছিল; বলিল, "পছন্দ হয়েছে বললে কোনো ক্ষতি ছিল না মা, কারণ যে জিনিসকে গ্রহণ করতেই হবে সে জিনিসকে পছন্দ ক'রে নেওয়াই ভাল।"

বিনয়ের কথায় একটা কলহাস্য উঠিল। বিমলা বলিলেন, "তা নয় বিনয়, গ্রহণ যখন করা হচ্ছে তখন আগেই পছন্দ হয়েছে—এ নিশ্চয় জেনো।

সুধাংশু দ্বিজনাথের সহিত যাইতে রাজী হইল না—একটা ট্যাক্সি লইয়া সে বাড়ি চলিয়া গেল। জিনিসপত্র সতীশের জিম্মায় দিয়া বিমলা ও বিনয়কে লইয়া দ্বিজনাথ গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মহবুব তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া নত হইয়া প্রভুপত্নীকে দীর্ঘ সেলাম করিল।

বিমলা বলিলেন, "কেমন আছ মহবুব? ভাল তো?"

মহবুব বলিল, "আপনার দোয়ায় ভাল আছি মা।"

গাড়িতে উঠিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলা, ভাল আছে তো? সে স্টেশনে এল না যে?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "অনেক পেড়াপিড়ি করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আসতে রাজী হ'ল না, বললে বাড়িতে সে তোমাকে রিসীভ করবে। আসল কথা, বিনয়ের সঙ্গে আসতে লজ্জা বোধ করলে।"

মুখে বিমলা বলিলেন, "কি ছেলেমানুষ!" কিন্তু মনে মনে খুশি হইলেন। কন্যার মনে লজ্জাশীলতার পরিচয় পাইয়া খুশি না হয় এমন

জননী বিরল। লজ্জা যে স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র ভূষণই নয়, সুমিষ্ট জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু, বিমলা তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিতেন।

বিনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলা বলিলেন, "দেখ বিনয়, তোমাকে দেখে পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যেন আগে কখনো দেখেছি। তোমার মনে পড়ে আমাকে কোথাও দেখেছ?—কোনো নিমন্ত্রণ-সভায় বা কোনো সভা-সমিতিতে?"

বিমলার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বিনয় বলিল, "ওটা নিশ্চয়ই আপনার ভুল হচ্ছে মা। আমার জন্যে আপনার স্নেহ উন্মুখ হ'য়ে ছিল ব'লে মনে হচ্ছে আমাকে আগে দেখেছেন। আমি তো ইউরোপ থেকে বেশিদিন ফিরি নি; তা ছাড়া, সভা-সমিতি বা নিমন্ত্রণ-সভায় আমার যাওয়া-আসা খুবই কম।"

বিমলা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "তা হবে, তোমার মতো হয়তো আর কাউকে দেখেছি।"

"তাই হবে।"

গাড়ি-বারাণ্ডার সম্মুখে কমলা দাঁড়াইয়া ছিল। মুখে তাহার সুমিষ্ট হাস্য, সে হাস্যের মধ্যে আনন্দ ও লজ্জার অপূর্ব সমাবেশ। বিমুগ্ধ নেত্রে বিমলা কন্যার কমনীয় মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন; মনে মনে বলিলেন, এই তো আমার মেয়ে! চিত্রকর তো চিত্রকর, পুলিসের দারোগাও তার সামনে এলে বিপদে প'ড়ে যায়। বিনয় বেচারীর আর দোস কি?

গাড়ি হইতে নামিয়া পদতলনতা কমলার মাথায় হাত দিয়া বিমলা বলিলেন, "কি রে কমলি, ভাল আছিস তো?"

সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, "আছি। তুমি ভাল আছ মা?"

ততক্ষণে বিনয় অপর দিকের দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া প্রস্থান করিয়াছিল। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বিনয়কে নিকটে দেখিতে না পাইয়া বিমলা বলিলেন, "কেমন আছি চেহারা দেখেই তো বুঝতে পাচ্ছিস। একটি জালা হ'য়ে এসেছি।" তাহার পর স্বামীর প্রতি একবার চকিত-মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "তুমি হয়তো এখনি কত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার ক'রে বসবে।"

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়া দ্বিজনাথ সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৈজ্ঞানিক তথ্য বল তো?"

বিমলা হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো! আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিই, আর তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে মার!"

কিন্তু পর-মুহূর্তেই কথাটা দ্বিজনাথের মনে পড়িয়া গেল। বিমলা সীলোন্ যাইবার পূর্বে সেই প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কৌতুক-পরিহাস হইয়াছিল তাহারই কথা। দ্বিজনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দেখ, যা বলেছিলাম সত্যি কি-না!"

স্মিতমুখে বিমলা বলিলেন, "আচ্ছা থাক্, সে কথা পরে হবে অখন।"

কথাটা কি জানিবার জন্য কৌতূহল হইলেও তাহার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত কোনো রহস্য জড়িত আছে মনে করিয়া কমলা সে বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

দ্বিজনাথের ইচ্ছা ছিল পত্নী ও কন্যার উপস্থিতিতে বিনয়ের সহিত একত্রে আহার করেন। কিন্তু তাহা হইল না, বেলা একটা হইতে বিনয়ের একজন ইংরাজ মহিলার ছবি আঁকিবার কথা স্থির ছিল। সে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় দ্বিজনাথ বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে নিশ্চয় ফিরো বিনয়।"

বিনয় বলিল, "সন্ধ্যার সময়ে ডক্টর সেনের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে রাত্রি আটটা হবে।"

সমস্ত দিনটা কাটিল সীলোনের গল্পে এবং বিনয়ের কথায়। দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমি সীলোন্ থেকে মুক্ত এনেছ বিমল, এখানে তোমার জন্যে আমি কিন্তু একটি হীরে ঠিক ক'রে রেখেছি। সত্যিই বলছি তোমাকে, বিনয় একটি বেদাগ কমল হীরে। ক্রমশই বুঝতে পারবে তাকে।"

বিমলা বলিল, "আমি তো অস্বীকার করছি নে। সত্যি, ছেলেটি ভারি চমৎকার—মুখখানি তো মায়া-মাখানো। কিন্তু দেখ, আশ্চর্য! আমার কেবলই মনে হচ্ছে, বিনয়কে আগে কোথাও দেখেছি—ও-মুখ আমার খুব জানা।"

দ্বিজনাথ হাসিয়া বলিলেন, "অসম্ভব কি? আমাদের দৃষ্টি তো এ জীবনের বাইরে সহজে যায় না, তোমার হয়তো অন্য কোন জীবনেরই কথা মনে পড়ছে।"

বিমলা বলিলেন, "অত দূরদৃষ্টি আমার নেই,—এই জীবনেই আমি বিনয়কে দেখেছি।"

কমলার ছবি দেখিতে দেখিতে বিমলার বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রহিল না। বলিলেন, "কমলের চেয়ে কমলের ছবি দেখতেই বেশি আগ্রহ হচ্ছে যে গো!"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে দ্বিজনাথ বলিলেন, "এ কি শুধু কমলার দেহের ছবি?—এ হচ্ছে কমলার স্পিরিটের ছবি। এর মধ্যে তুমিও আছ, আমিও আছি, বিনয়ও আছে।"

বিনয়ের প্রতি দ্বিজনাথের অসীম প্রীতি দেখিয়া বিমলা কিছু বলিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

বিনয়ের ফিরিতে রাত্রি আটটারও বেশি হইয়া গেল। সেদিন আর বেশি কথাবার্তা হইবার সময় হইল না,—সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া সকলে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে খাবার-ঘরে কমলা, বিমলা এবং দ্বিজনাথ বসিয়া গল্প করিতেছেন—বিনয়ের অপেক্ষায়। খানসামারা বিবিধ প্রকার দেশী ও বিদেশী খাবার রাখিয়া গিয়াছে—বিনয় আসিলে চা দিয়া যাইবে।

মিনিট দশেক পরে বিনয় আসিয়া তাহার বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার সদ্যধৌত মার্জিত মুখে আভিজাত্য এবং শালীনতার সুমিষ্ট হাস্য। একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজ তো তোমার ছবি আঁকা-টাঁকা নেই বিনয়?"

বিনয় হাসিমুখে বলিল, "না।"

"তা হ'লে আজকে একেবারে প্রোগ্রাম বেঁধে সমস্ত দিনের ব্যবস্থা করা। চা খাওয়ার পর সোজা একেবারে বোটানিকাল গার্ডন্। কি বল বিমল?" বলিয়া বিমলার দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিমলার কঠিন দৃষ্টি বিনয়ের উপর নিবদ্ধ, নিশ্বাস নিরুদ্ধ, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, চক্ষু চকিত

ভীত-কণ্ঠে দ্বিজনাথ বলিলেন, "কি হ'ল তোমার?—অমন ক'রে কি দেখছ?"

"ব'সো।" বলিয়া ত্বরিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বিমলা বলিলেন, "তোমার বাঁ হাতটা একবার খোল তো বিনয়!"

"কেন বলুন দেখি?" বলিয়া বিনয় তাহার বাম হস্তের আস্তিন তুলিয়া ধরিল। ঐকান্তিক ঔৎসুক্যে সকলে চাহিয়া দেখিল, বিনয়ের বাম বাহুতে একটা সুদীর্ঘ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন।

দ্বিজনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া আর্ত বিকৃত কণ্ঠে বিমলা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার নিজের ছেলেকে চিনতে পার নি!" তারপর "ওরে খোকা! খোকা আমার!" বলিয়া বিনয়কে জড়াইয়া ধরিলেন।

"সে কি!" বলিয়া দ্বিজনাথ দ্রুতপদে বিনয় ও বিমলার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বিমলার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু মুদিত, দেহ অবসন্ন; পড়িয়া যাইতেছিলেন,—বিনয় কোনো রকমে ধরিয়া ফেলিল।

ভয়ার্ত-কণ্ঠে দ্বিজনাথ "বিমল, বিমল!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। চাকরদের ছুটাছুটি পড়িয়া গেল,—কেহ জল আনে, কেহ বরফ আনিতে দৌড়ায়, কেহ ডাক্তারকে ফোন করিতে যায়।

টেবিলের একদিকে খানিকটা জায়গা খালি ছিল, দ্বিজনাথের সাহায্যে বিনয় বিমলার মূর্ছিত দেহ ধীরে ধীরে সেখানে স্থাপিত করিল।

এই অচিন্তিত আকস্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে একবার মুহূর্তের জন্য বিনয় এবং কমলার দৃষ্টি পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। সে দৃষ্টির মধ্যে কি ব্যক্ত হইল—অপরিমেয় বিহ্বলতা, না মর্মন্তুদ সন্ত্রাস, না সাধারণ মানুষের অনুপলব্ধ নূতন কোনো অনুভূতি, তাহা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

পাঁচ-ছয় মিনিট পরে বিমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিলেন, তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন। বিনয় পাশেই ছিল, সে বাধা দিয়া বলিল, "এখন তাড়াতাড়ি উঠবেন না, একটু শুয়ে থাকুন।"

এখন আর বিনয় পূর্বের মতো বিমলাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিল না। প্রস্তাবিতা পত্নীর মাতার কৃত্রিম মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া যে এখন জননীর দাবি উপস্থিত করিয়াছে, যে দাবি সত্য হইলে জীবনের সদ্য-গঠিত মধুরতম দিকটা একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে মুখে বাধিল।

বিমলা ধীরে ধীরে বিনয়ের বাঁ হাতখানা টানিয়া লইয়া অস্ত্রচিহ্নের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন, তাহার পর তাঁহার দুই চক্ষু হইতে নিঃশব্দে টপ টপ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিমূঢ়ভাবে দ্বিজনাথ মনে মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, বিমলাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাঁদছ কেন বিমল? বিনয় যদি আমাদের সেই হারানো ছেলেই হয় তা হ'লে তো খুব আনন্দেরই কথা।"

আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বিমলা বলিলেন, "'যদি' বলছ তুমি? এখনো তোমার সন্দেহ আছে? এখনো খোকাকে চিনতে পারছ না?"

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা পারছি; কিন্তু—"

দ্বিজনাথকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অধীরভাবে বিমলা বলিলেন, "তুমি বাপ তোমার 'কিন্তু' থাকতে পারে—আমার কিন্তু নেই।"

এবার বিনয় কথা কহিল। দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে সে বলিল, "দেখুন,

আমার কিন্তু এ বিষয়ে রীতিমত 'কিন্তু' আছে। আমার বাবা ছিলেন প্রিয়কান্ত রায়; তিনি যখন মারা যান তখন আমার বয়স সাত বৎসর। মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর। তিনি আমার সম্মুখেই মারা যান—সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, পাঁচ বছর বয়সের অনেক কথাই আমার মনে পড়ে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আপনাদের ভুল হচ্ছে।"

অবসন্ন দেহে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কমলা বসিয়া ছিল, বিনয়ের কথা শুনিয়া সোজা হইয়া ফিরিয়া বসিল। অকস্মাৎ যে অচিন্তিত বিপর্যয় জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎকে ওলট-পালট করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইবার প্রত্যাশায় তাহার দেহের মধ্যে রক্ত-চলাচল আরম্ভ হইল। জননীর অনুমান মিথ্যা হউক—এই প্রার্থনায় তাহার সমস্ত চিত্ত যে অপরিজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত দেবতার এ পর্যন্ত বোধ করি কোনদিন শরণ ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার পদতলে বারম্বার অবনমিত হইতে লাগিল।

বিনয়ের দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "এখন কথা হচ্ছে এই যে, প্রিয়কান্ত রায় তোমার পালক পিতা ছিলেন কি-না! তোমাকে দেখে বিমলার চিনতে পারার সঙ্গে তোমার বাঁ হাতে অস্ত্রের দাগ বেরুনো এমন একটা প্রবল যোগ যে, একে সহজে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। প্রিয়কান্ত রায় তোমার পালক পিতা ছিলেন—এ অনুমান সত্য হ'লে সব ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। সে প্রায় বাইশ-তেইশ বছরের কথা হ'ল, জানকী চৌধুরী নামে একজন বড় জমিদারের মানহানির মকদ্দমায় আমি ঢাকায় গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে বিমলা আর আমাদের একটি বছর দুয়েকের ছেলে ছিল। ফেরবার সময়ে ঝড়ে স্টীমার ডুবি হয়। আমি আর বিমলা কোনো রকমে রক্ষা পাই, কিন্তু বিমলার

বাহুবন্ধন থেকে ছিন্ন হ'যে আমাদের সে ছেলেটি যে কোথায় যায় তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। বহু অর্থব্যয় ক'রে সাত দিন পদ্মার তীরে তীরে খোঁজ-তল্লাশ করাই—কিন্তু কোনো ফল হয় নি। বছরখানেক বয়সের সময়ে সে ছেলেটির বাঁ হাতে একটা খুব বড় ফোড়া হ'য়ে অস্ত্র হয়। তোমার সঙ্গে আমাদের সে ছেলেটির মোটামুটি বয়সের মিল, তোমার বাঁ হাতে অস্ত্রের দাগ, কোনো আত্মীয়ের জিম্মা না ক'রে দিয়ে প্রিয়কান্ত রায়ের তোমাকে মিশনে দেওয়া—এ সমস্তই বিমলার অনুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে ইঙ্গিত করছে।"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া বিনয়ের মুখমণ্ডল চিন্তাবৃত হইল। ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বলিল, "বাঁ হাতে অস্ত্রের দাগ মেলা খুবই আশ্চর্য ঘটনা বটে। তা ছাড়া এর মধ্যে আর একটা বিশেষ কথা আছে। আমার মিশন ছাড়বার সময়ে মিশনের রেক্টর আমাকে বলেছিলেন যে, আমার সম্পর্কে যদি কোনো দিন বড়-রকম সমস্যা উপস্থিত হয়, তা হ'লে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে এ সমস্যার সমাধান হ'লেও হ'তে পারে;—এ তো একটা কম গুরুতর সমস্যা নয়!"

ব্যগ্র স্বরে দ্বিজনাথ বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়। চল, এখনি তোমার মিশনে যাওয়া যাক। মহ্‌বুব!"

অবিলম্বে মহ্‌বুব আসিয়া দাঁড়াইল।

"জল্‌দি গাড়ি তৈয়ার করো।"

"যো হুকুম"।—বলিয়া মহবুব ক্ষিপ্রবেগে প্রস্থান করিল।

চা, টোস্ট, মাখম, কেক, সন্দেশ, রসগোল্লা সমস্তই নিজ নিজ স্থানে পড়িয়া রহিল, কাহারো সে সকলের কথা মনেও পড়িল না, দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন, কমলা নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে—মুখে তাহার বর্ষার সুগভীর তমসা। স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "কমল!"

"কি মা?"

"শরীরটা এখনো একটু দুর্বল ব'লে মনে হচ্ছে—আমাকে ধ'রে নিয়ে চল্। ঘরে গিয়ে শোব।"

"আর একটু এখানে থাক না মা।"

"না, তা ব'লে তত দুর্বল নয়, যেতে পারব।" বলিয়া বিমলা উঠিয়া বসিলেন।

কমলা তাড়াতাড়ি আসিয়া জননীকে ধরিয়া তুলিল, তাহার পর ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া শয্যার উপর বসাইয়া দিল।

"আস্তে আস্তে শুয়ে পড় মা।"

বিমলা বলিলেন, "না, এখন একটু ব'সেই থাকি। তুই আমার পাশে ব'স্ কমল।"

মাতার পার্শ্বে কমলা উপবেশন করিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমলা বলিলেন, "যে যাই বলুক, বিনয় যে আমার সেই হারানো ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ কত আনন্দের দিন কমল, আমরা অত দুঃখের ছেলে ফিরে পেলাম—তুই তোর দাদা পেলি। কেমন, ঠিক নয়? খুব আনন্দের দিন নয়?" বিমলা কমলার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কমলা কহিল, "আনন্দের দিন বইকি।"

বিমলা বলিলেন, "তা ছাড়া, বিনয়কে আমরা তো হারালাম না—আরো বেশি ক'রেই পেলাম। ভাই যে কত আদরের জিনিস তা এইবার

তুই বুঝবি কমল। এ তো আর সম্পর্ক পাতানো ভাই নয়, একেবারে মায়ের পেটের ভাই। দু দিনেই দেখবি কত মায়া প'ড়ে যাবে।"

জননীর এই সকল কথার উৎস কোথায় এবং গতি কোন্ দিকে তাহা নির্ণয় করিতে কমলার এক মুহূর্ত বিলম্ব হইল না; মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর মা। তোমার গলার আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে, এখনো তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও নি।"

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়; কথা বলিতে বিমলার তখনো হাঁপ ধরিতেছিল এবং উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় একটা দুরপনেয় অবসন্নতা শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুখে বলিলেন, "না, এখন আর কোনো কষ্ট বোধ করছি নে।" কিন্তু ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। কমলা সরিয়া বসিয়া বিমলার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ক্লান্ত দেহে নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না—বিমলা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তখন কমলা বসিয়া বসিয়া কত রকম কি চিন্তা করিতে লাগিল। সে চিন্তার আকার প্রকার কিছুই নির্ণয় করা যায় না—তাহার না আছে আদি, না আছে অন্ত, সে চিন্তার মধ্যে লাভ-ক্ষতির কোনো হদিস নাই—কুজ্ঝটিকার মতো সে না বায়ু না বাষ্প। ভাবিতে ভাবিতে কমলারও চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল—সে তাহার জননীর পাশে ক্লান্ত অবশ দেহ এলাইয়া দিল।

ঘুম ভাঙিল দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বরে। বেলা তখন প্রায় এগারটা। কমলা ও বিমলা নিদ্রোত্থিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক বিমল। বিনয় আমাদের সেই হারানো ছেলে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।"

উৎফুল্ল মুখে বিমলা বিনয়ের দিকে চাহিলেন। "তোমার মনে কোনো সন্দেহ আছে বিনয় ?"

বিনয় বলিল, "না মা, আমারো কোনো সন্দেহ নেই।"

বিমলা উঠিয়া গিয়া বিনয়ের শিরচুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন—বিনয় নত হইয়া বিমলার পদধূলি গ্রহণ করিল।

দ্বিজনাথকে সম্বোধন করিয়া বিমলা কহিলেন, "প্রমাণের জন্মে আমার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না—তবু তোমরা কি প্রমাণ নিয়ে এলে শুনি ?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বিনয়কে মিশনে দেবার সময় প্রিয়কান্ত রায় একটি সীল-করা চিঠি তখনকার রেক্টরের হাতে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি কখনো বিনয়ের বিষয়ে কোনো গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়—প্রয়োজন হ'লে তখন যেন চিঠিখানি বিমলকে খুলে প'ড়ে দেখতে দেওয়া হয়—অন্যথা নয়। আজকের ঘটনা শুনে রেক্টর বললেন, 'চিঠিতে যে ঐ সংক্রান্ত কোনো খবর আছে তার সন্দেহ নেই।' খুলে দেখলেন, ঠিক তাই। একজন জেলের ঘরে দেখতে পেয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে নিঃসন্তান প্রিয়কান্ত বিনয়কে কিনে নেন। তার মাস ছয়েক আগে হরিপুরের চরের বাঁকে একটা বড় তক্তার ওপর কাপড়চোপড় জড়িয়ে ভাসতে দেখে জেলে তাকে উদ্ধার ক'রে বাড়ি নিয়ে যায়। চিঠিতে যে তারিখ দেওয়া আছে তা হিসেব ক'রে দেখলে বিনয়কে জেলের পাওয়ার সময়ের সঙ্গে ষ্টীমার ডুবির সময় ঠিক মিলে যায়। সুতরাং বিনয় যে আমাদের হারানো ছেলে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে।"

প্রমাণ-কাহিনীর ভারে সমস্ত ঘরটা যেন পীড়িত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা সরিল না,—অবশেষে দ্বিজনাথ জোর করিয়া মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "আজকের শুভদিনটা আমোদ-প্রমোদ ক'রে কাটাতে হবে—সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দ। খাওয়া-দাওয়ার

পরই কোথাও বেরিয়ে পড়া যাবে। শিগগির খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে নাও।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না; কিন্তু কোথাও যাওয়াও হইল না। আনন্দের দিন নিরানন্দের কূলে কূলে অতিবাহিত হইল। সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর মধ্যে যে উদাস নিঃসত্ত্ব অনুভূতি আছে তাহাই সকলের মনকে অধিকার করিয়া রহিল। গল্প জমিল না, কথোপকথন ছোট হইয়া হইয়া শেষ হইয়া যাইতে লাগিল, কথাবার্তার মধ্যে নীরবতার পরিমাণ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে সকলে এক-একখানা বই অথবা খবরের কাগজ লইয়া পরস্পরের নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইল। এই অলস উদাস দিনযাপনের জন্য কেহ কাহারো নিকট কৈফিয়ত চাহিল না; সকলেই বুঝিল, যে বাঁশির নল ফাটিয়াছে, তাহা হইতে সুর বাহির করা কাহারো সাধ্য নহে।

সন্ধ্যা হইতেই আহারের তাড়া পড়িল—এবং আহার শেষ হইতেই প্রত্যেকে নিজ নিজ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তিমিরাহত আলোকের অন্তরালে নিজের মুখ লুকাইয়া লইয়া সে বলিল, "না দাদা, ফাঁকি দিলে চলবে না, আমি আমার ইচ্ছেমতো আশীর্বাদ সেদিন তোমার কাছ থেকে চেয়ে নোব। আমাকে সেদিন তোমার এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আসছে অগ্রাণ মাসে তুমি শোভাকে বিয়ে করবে। তুমি জান না দাদা, শোভা তোমাকে কত ভালবাসে! তার সে ভালবাসা ব্যর্থ হবার নয়—তাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। আমার এ অনুরোধ তুমি রাজী হও—লক্ষ্মীটি।"

বিনয় বলিল, "পুরুষমানুষ হ'য়ে আমি কি ক'রে লক্ষ্মীটি হব—তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মীটি হ'য়ে সন্তোষকে বিয়ে করতে রাজী হও ভাই। তুমিও জান না কমল, কি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে সন্তোষ তোমাকে ভালবাসে।" সহসা-সঞ্জাত উৎসাহে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বিনয় বলিল, "তুমি যদি কথা দাও কমলা, আমি দার্জিলিঙে টেলিগ্রাম ক'রে সন্তোষকে ভাই-ফোঁটার দিন আসতে নিমন্ত্রণ করি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে কমলা বলিল, "ও-সব ছেলেমানুষি ক'রো না দাদা। আমি স্থির করেছি, বিয়ে করব না।"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া পুনরায় পূর্বাবস্থায় শুইয়া পড়িয়া বিনয় বলিল, "তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে স্থির করেছ বিয়ে করবে না—আর পুরুষমানুষ হ'য়ে আমিই কি বিয়ে করব ব'লে স্থির করেছি? আমি বিয়ে করব না বললে কেউ কিছু ভাববেও না, বলবেও না। তুমি সে কথা বললে সমাজ লগুড় নিয়ে তাড়া ক'রে আসবে। তখন সন্তোষ তো সন্তোষ, যে-কোনো অসন্তোষকে বিয়ে করতে পথ পাবে না।"

কম্পিতকণ্ঠে কমলা বলিল, "সমাজকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি নে।"

বিনয় বলিল, "তুমি হয়তো কর না—কিন্তু বাবা করতে পারেন, মা করতে পারেন, আমি করতে পারি।"

সবিস্ময়ে কমলা, "তুমি কর দাদা ?"

"করি নে ?—যে ঘরে বাস করি সেই ঘরে কখনো দেশলাই জ্বেলে আগুন লাগাতে পারি ? শোন কমলা, মনের অগোচর কথা নেই। সূর্য অস্ত যায়, কিন্তু আকাশে তার লাল রঙটুকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকে—এ আমিও জানি, তুমিও জান। এ ক'দিন আমরা যা-ই ভাবি যা-ই বুঝি না কেন, ভাই-ফোঁটার দিন আমরা আমাদের মনের আকাশকে যেন একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলি। তুমি আমার ছোট বোন আর আমি তোমার দাদা—সেদিন থেকে এ চেতনা যেন এক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের মন থেকে লোপ না পায়।"

কমলা কোনো উত্তর দিল না, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

"আমার চিঠিগুলো কি এখনো তোমার কাছে আছে কমলা?—না, নষ্ট ক'রে ফেলেছ ?"

"আমার কাছে আছে।"

"সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো—কিংবা পুড়িয়ে ফেলো।"

"ফিরিয়েই দেব।"

"আর তোমার চিঠিগুলো ?—সেগুলোর কি করা যায় ?"

"সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।"

একটু ভাবিয়া বিনয় বলিল, "না। সেগুলোও পুড়িয়ে ফেলব।"

"তাই ফেলো।"

কেহ আর কোনো কথা বলিল না, শুধু সন্ধ্যার তিমিরান্তরালে এক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে খসিয়া পড়িল, এবং একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাস বায়ুমণ্ডলে মুক্তিলাভ করিল। সে বার্তা জগতের কেহ জানিল না; এমন কি বিনয়-কমলাও পরস্পরে সম্পূর্ণ ভাবে নয়।

ভাই-ফোঁটার দিন প্রত্যূষ হইতেই গৃহে উৎসবের কলরোল উঠিয়াছে। বেলা আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে কয়েকজন আত্মীয়-আত্মীয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ শাঁক বাজাইতেছে, কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ মালা গাঁথিতেছে। পুরোহিত আসিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা শেষ করিয়া মাঙ্গলিক স্তব পাঠ করিতেছেন।

শুভ সময় উপস্থিত হইলে বিনয় আসিয়া মূল্যবান প্রশস্ত গালিচার আসনে বসিল। স্নান করিয়া সে কমলার দেওয়া রেশমের বস্ত্র, রেশমী পাঞ্জাবি, রেশমের উত্তরীয় পরিয়াছে; কণ্ঠে ফুলের মালা, মুখে মৃদু মৃদু হাস্য।

একটা ছোট সোনার বাটিতে শ্বেত চন্দন, সম্মুখে দুইখানি নবনির্মিত রৌপ্যপাত্রে নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্ন, রূপার গেলাসে জল, শ্বেত পাথরের গেলাসে শরবৎ। ডান দিকে বিচিত্র কাজ করা কাঠের ট্রেতে নানাপ্রকার প্রসাধন-দ্রব্য পরিধেয় বস্ত্রাদি। বাম দিকে ধূপাধারে পাঁচটি ধূপ এবং একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দুই পাশে দুইটি তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ে শাঁক লইয়া প্রস্তুত আছে, ফোঁটা দেওয়া আরম্ভ হইলেই বাজাইবে।

নববস্ত্র পরিধান করিয়া কমলা আসিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলে পুরোহিত আসিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন। তাহার পর কমলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিতে চন্দন লইয়া বিনয়ের ললাট স্পর্শ করিল।

ঘন ঘন শাঁক বাজিতে লাগিল। পিছন দিক হইতে বিমলা বলিলেন, "আমি যা বলি শুনে শুনে ব'লে যা কমল। বল্—

যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই ভাইকে ফোঁটা,
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দোরে পড়ল কাঁটা।
যম যেমন অক্ষয় অমর,
ভাই তেমনি হোক অক্ষয় অমর।"

তৃতীয়বার মন্ত্র পড়িবার সময়ে হঠাৎ এক ফোঁটা চোখের জল কমলার চক্ষু হইতে টপ করিয়া মাটির উপর পড়িল। প্রণাম করিবার সুযোগে কমলা তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু কোনো প্রকারে মুছিয়া লইল।

এ ব্যাপার আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও বিনয় করিল। মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পরই স্মিতমুখে পকেট হইতে একটা মখমলের বাক্স বাহির করিয়া কমলার হাতে দিয়া বলিল, "দাদার আশীর্বাদী।"

"এ আবার কি দাদা?" বলিয়া কমলা বাক্স খুলিলে সকলে দেখিল, হীরামুক্তাখচিত একটি মূল্যবান কণ্ঠী।

কমলা বলিল, "এই বুঝি তোমার শুভকামনা?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "মনে করছিস বুঝি চিৎকার ক'রে বলি নি ব'লেই সেটা পাস নি?"

কণ্ঠীটা লইয়া কমলার গলায় পরাইয়া দিয়া বিমলা বলিলেন, "দাদাকে প্রণাম কর্।"

তাহার পর দ্বিজনাথ ও বিমলা পুত্রকন্যাকে আশীর্বাদ করিলেন।

সমস্ত দিন ধরিয়া হাস্য-কৌতুক আমোদ-প্রমোদ চলিল। সন্ধ্যার পর শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহার করিল। অভ্যাগতেরা প্রস্থান করিবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আহারাদি সারিয়া সকলে যখন নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় লইল, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয় একটা চেয়ারের পিঠ ধরিয়া মিনিট পাঁচেক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর বারান্দায় আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটা ঈজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল। সম্মুখে দ্বিতীয়ার অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারকামালা জ্বলজ্বল করিতেছে—তাহার দিকে চাহিয়া চিন্তা এবং চিন্তাহীনতার অবস্থায় বিনয় এক ঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল। চারিদিক নিঃশব্দ সুষুপ্ত, কোথাও জনমানবের কণ্ঠস্বর শুনা যায় না—একবার চারিদিক বারান্দায় বারান্দায় ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়া বিনয় ত্বরিতবেগে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি একটা সুট পরিয়া লইয়া একটা চামড়ার ব্যাগে ভাই-ফোঁটায় কমলার দেওয়া কয়েকটা জিনিস এবং অপর কয়েকটা দ্রব্য ভরিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা চিঠি পর্যন্ত লিখিয়া গেল না।

সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেটের কাছে আসিয়া দেখিল, চাবি বন্ধ। গেট বেশি উচ্চ নহে, লোহার খাঁজে খাঁজে পা দিয়া গেট টপকাইয়া রাজপথে লাফাইয়া পড়িল। খানিকটা দ্রুতপদে চলিয়া আসার পর একটা ট্যাক্সি মিলিল। ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল, "হাওড়া, থ্রুট রোড।"

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ছুটিল।

* * *

ইহার প্রায় মাস দুই পরে একদিন অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে একটা ইউরোপগামী জাহাজে বিনয় আরোহণ করিল, সঙ্গে তাহার শিল্পী-বন্ধু মসিয়ে ছনি। তাহারই সহায়তায় অতি কষ্টে সে নিজের পারিবারিক

পরিচয় না দিয়াও পাসপোর্ট সংগ্রহ করিয়াছে। ফ্রান্সে জীবন-যাপন করিবার একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া উনি বিনয়কে আশ্বাস দিয়াছে।

জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের তীরের দিকে চাহিয়া বিনয় মনে মনে বলিতেছিল—'বিদায় হে ভারতবর্ষ, তোমার আশ্রয় থেকে, এ জন্মের মতো বিদায়। পরজন্ম যদি থাকে, তা হ'লে তোমার কোলেই যেন আবার জন্মাই ; কিন্তু সে জীবনে বিধি-লিপি যেন একটু অন্য রকম হয়। ডুবি যদি তো একেবারেই যেন ডুবি, এ রকম ক'রে যেন ডুবি নে।'

সমাপ্ত